—তিন টাকা আট আনা—

[এই গ্রন্থের রচনাকাল ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪৩ সাল, অর্থাৎ ইংরাজী ১১ই অক্টোবর, ১৯৩৬ হইতে ১৬ই নভেম্বর ১৯৪১ পর্য্যন্ত]

ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা হইতে পি-মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস, ১৮৭-সি অপার সারকুলার রোড হইতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

জীবনের যাত্রাপথে যারা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহিত্য-রচনায় দিয়েছে প্রেরণা, অভিষিক্ত করেছে আনন্দরস-ধারায়—অথচ দাবী করেনি কিছুই—তাদেরই কথা আজ স্মরণ করলাম।

—এই লেখকের—

অনুবর্তন

অপরাজিত | অভিযাত্রিক

অসাধারণ

আদর্শ হিন্দু হোটেল | আরণ্যক

ইছামতী

উপলখণ্ড | উর্মিমুখর

কিন্নরদল

কেদার রাজা | ক্ষণভঙ্গুর

চাঁদের পাহাড়

জন্ম ও মৃত্যু | তৃণাঙ্কুর

দুইবাড়ী

দৃষ্টি-প্রদীপ | দেবযান

নবাগত

পথের পাঁচালী | বনে-পাহাড়ে

বিপিনের সংসার

বেণীগির ফুলবাড়ী | বিধু মাষ্টার

বিচিত্র জগৎ

মেঘমল্লার | মৌরীফুল

মরণের ডঙ্কা বাজে

স্মৃতির রেখা | যাত্রাবদল

হীরামানিক জ্বলে

প্রকাশকের নিবেদন

প্রতিদিনকার ঘটনার ছোট ছোট তুচ্ছ ছবি আমরা দেখি আর ভুলে যাই। কিন্তু শিল্পী যিনি, তাঁর অন্তরে সেই সব অকিঞ্চিৎকর তথ্যই সাহিত্যে রসায়িত হয়ে উঠে। যাঁর তা হয়, অনেক সময় তিনি সেই সব অনুভূতিও লিপিবদ্ধ না করে পারেন না। বিভূতিভূষণ সেই শ্রেণীর শিল্পী। বাংলা দেশে আর কোন্ সাহিত্যিক ডায়েরী রাখেন জানি না— কিন্তু বিভূতিবাবু রাখেন। তাঁর এ ডায়েরী জমেছে বহুকাল ধরে, বহু খণ্ড দিনলিপি লোকচক্ষুর অগোচরে লুকিয়ে আছে। কিছু দিন আগে আমাদেরই অনুরোধে তিনি একখণ্ড ঐ ডায়েরী প্রকাশিত করেন, কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই। কিন্তু যে অসামান্য সাফল্য পেয়েছিল বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে—তাতেই উৎসাহিত হয়ে তিনি আরও দু-খানি বই প্রকাশের অনুমতি দেন। এই সব বইগুলিই জনপ্রিয় হয়—তার কারণ এই সমস্ত রচনানিঃসন্দেহে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে ডায়েরীর অংশটি আমরা প্রকাশ করলাম তার অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে, এর কতকাংশকে অনায়াসে ভ্রমণকাহিনী বলা যায়। তবে সেটাই সব নয়, এর মধ্যে তাঁর অন্তরের যে বিশেষ দিকটির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেটি শুধু বিস্ময়কর নয়—বৈচিত্র্যময়ও বটে। এতে কেবল আনন্দের খোরাকই রইল না, চিন্তাশীল পাঠকদের চিন্তারও খোরাক রইল। এই সুযোগে আর একটি কথা বলি—হঠাৎ বিভূতিবাবুর একটি কবিতা হাতে আসে। সেটাও পাঠকদের উপহার দেবার লোভ সামলাতে পারলুম না।

আজ এই ডায়েরীটা প্রথম আরম্ভ করলুম, জানিনা কতদিনে শেষ হবে, কিন্তু এইজন্যে আরম্ভ করলুম যে সবদিক থেকে আজকার দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরনীয় দিন। দুঃখের বিষয় এই যে এ রকম দিন বেশী আসে না জীবনে। আমি এই ডায়েরীটা লিখবো এমন ভেবে যে আমার মনের সকল গোপনীয় কথাই এতে থাকবে, কিছু চেপে রাখবো না। কাজেই কথাগুলো সব লিখতে হবেই।

অনেককাল আগে, আজ প্রায় আঠারো বছর আগে এই দিনটিতে পূজোর ছুটি উপলক্ষ্যে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ী গিয়েছিলুম, তখন নতুন বিয়ে হয়েচে, তার আগে কতকাল দেখা হয়নি। গিয়েছিলুম ষষ্ঠী আগের দিন কিন্তু দেখা হয়নি, বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল বলে। আজই রাত্রে প্রথম দেখা হয়। সেই পূজোর সময়েই তার বাপের বাড়ী থেকে নিতে এল তাকে, আমরা পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু মাসখানেক পরে বাপের বাড়ীতে সে মারা গেল।

সেই জন্যেই আজকার দিনটি * আমার এত মনে আছে, থাকবেও চিরকাল।

আর একটা ব্যাপার যেজন্যে আজকার দিনটি স্মরণীয়, সে হচ্ছে আজ বহুকাল পরে আমাদের দেশে বন্যার জলে নৌকো করে বেড়িয়ে এসেচি। আমার জ্ঞানে এমন বন্যা কখনো দেখিনি। কুঠীর মাঠে সাঁতার জল, সেখানকার বন-ঝোপের মাথাগুলো মাত্র জেগে আছে, যেখানে আর-বছর

---

* ২৫শে আশ্বিন

ব্যায়াম করতুম বিকেলে, যেখানে বসে কেলেকোঁড়ার ফুলের সুবাস উপভোগ করতুম, সে সব জায়গা দিয়ে বড় বড় নৌকো চলেছে। আমি এমন কথনো দেখিনি, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না হয়তো! ওবেলা আজ আমি, ন-দি, রামপদ, পিসিমা, জগো সবাই মিলে গাবতলার কাছে নৌকোতে উঠে কুঠীর মাঠ দিয়ে, বেলেডাঙা নতিডাঙা হয়ে আবার বাঁশতলার ঘাটে ফিরে এলুম। ওরা চলে গেল ঘাটে নেমে বাড়ীতে। আমি চালকীর জোলের মধ্যে ঢুকে জোলের ঘাটে নৌকো থেকে নামলুম।

গাবতলা! যেখান থেকে নৌকোয় উঠবার কল্পনা স্বপ্নেও কথনো করতে পারা যেতো না!

তারপর বৈকালে খুকুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম আজ চার মাস পরে। সে কি আনন্দ যাবার সময়ে! কত গল্প এই চার মাসে জমা হয়ে রয়েচে, ওকে সে সব গল্প করতে হবে। প্রথমে খুড়ীমা এলেন, তারপরেই খুকু এল। ওকে বই কাপড় দিলুম, সুপুরিগুলো পেয়ে খুব খুশি। শ্রাবণ মাস থেকে সুপুরিগুলো ওর জন্যে রেখে দিয়েচি বাক্সের মধ্যে, দিল্লীর বেশ ভাল মশলা মাখানো সুগন্ধি সুপুরি কুচোনো। অনেক গল্প-গুজব হোল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। ওরা বারাকপুর যাবে পূজোর পরেই।

আমাদের বাসায় ঢুকবার যো নেই। ভেলা করে গিয়ে খোকা বাসার চাবী খুলে মশারী বার করে নিয়ে এল। কারণ পূজোতে বাইরে বেড়াতে গেলেই মশারী লাগবে।

তারাভরা অন্ধকারে আকাশের নীচে দিয়ে রাত্রের non-stop ট্রেনটা ছুটে এল। আমি বসে বসে আজ সারাদিনের কথাই ভাবছিলুম। সকালে সেই কাসু মোড়লের তামাক খাওয়ানো ডেকে, দারিঘাটার পুলের

নীচে বন্যার জলের স্রোত, হরিপদদার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি গ্রামে ঢুকেই, জল বেড়াতে যাওয়া, চালকী, খুকুর সঙ্গে দেখা—এই সব।

এখন রাত ১২টা। বসে ডায়েরীটা লিখচি। শিলং বেড়াতে যাবো বলে গোছ-গাছ করতে বড় ব্যস্ত আছি। ক'মাস ধরে কি ছুটোছুটিটাই করে বেড়াচ্ছি কলকাতায়। এখানে মিটিং, ওখানে engagement, প্রখানে পার্টি, হয়তো আসলে দেখ্‌চি যে টাকাকড়ি নিতান্ত মন্দ আসচে না, কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্য ও গভীরতা ওখানে কৈ? উত্তেজনা থাকে বটে কিন্তু সত্যিকার আনন্দ নেই। এই যে শেষ শরতের অপূর্ব রূপ এবার—এমন রূপ দেখতেই পেলুম না, গাছপালার নবীন সরসতা উপভোগ করতেই পেলুম না, কলকাতায় এই হৈ-চৈ গণ্ডগোলপূর্ণ জীবনের জন্যে। তাই কাল সারাদিন এখানে ওখানে শত কাজ ও ব্যস্ততার পরে ফিরে এসে রাত্রে শুয়ে ভাবছিলুম এ হৈ-চৈ-এর সার্থকতা কি? আমার মনের একটা ব্যাপার আছে বরাবর লক্ষ্য করে দেখে এসেচি—সেটা মাটী ও গাছপালার সাহচর্য্যে বড় ভাল থাকে। সেখানে মন অন্য এক রকমই থাকে, সহরে শত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে তা হয় না। আনন্দ পাইনে, আমোদ পাই। শান্ত অনুভূতি নেই, উত্তেজনার প্রাচুর্য্য আছে। অনেকে বলে—এইতো জীবন! পুতুপুতু মিন্‌মিনে জীবন আবার জীবন নাকি? এই রকমই তো চাই!

অভিজ্ঞতার দিক থেকে এ সহরের জীবনে অনেক কিছু পাবার ও নেবার আছে বটে স্বীকার করি, কিন্তু মনন ও ধ্যানের অবকাশ নেই। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ না রাখলে হয়তো অপরের চলতে পারে কিন্তু আমার তো একেবারেই চলে না।

কি করচি এসব করে? কার কি উপকার করচি? কারোরই

না। আমার আগে কত লোকে এ রকম হৈ চৈ করে বেড়িয়ে গিয়েচে, কত মিটিংএর সভাপতিত্ব করেচে, কত সাহিত্য সম্মেলনের পাণ্ডা হয়েচে, কত ব্যাঙ্কে কত চেক্ কেটেচে—কোথায় তারা আজ? কে চেনে আজ তাদের!

গভীর অনুভূতির আনন্দ জীবনে সার্থকতা আনে—অন্ততঃ আমার। অপরের কথা জানিনে, কিন্তু আমি ওর চেয়ে বেশী আনন্দ কিছুতেই পাইনে। এত কোলাহলের মধ্যে থেকে বড় কোলাহল-প্রিয় হয়ে উঠেচি বটে, কিন্তু এ আমি সত্যিই ভাল বাসিনে। আমার মন ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠচে একটুখানি নীল আকাশের জন্যে। শরতের বনভূমির মটর লতার ফুল ও বনসিমের ঝোপের জন্যে, কার্ত্তিকের প্রথমে গাছপালার, বন[illegible] ফুলের সে অপূর্ব্ব সুগন্ধের জন্যে।

[illegible]

কাল যখন আসাম মেলে বেরুতে যাবো, তখন কলকাতায় এল ভয়ানক বৃষ্টি। একটা বুড়ো রিক্সাওয়ালাকে বল্লুম আমায় মৃজাপুর ষ্ট্রীটে নিয়ে চল্। সে কালা ও বোকা। তাকে ধমক দিতে দিতে মেস পর্য্যন্ত নিয়ে এলুম, তারপর মালপত্র নিয়ে স্টেশনে আসতে আসতে তার রিক্সার চাকা গেল ভেঙে। তাকে দিলুম মাত্র দু আনা। সে প্রতিবাদ না করে নীরবে চলে গেল। তার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে কতটা অন্যায় করলুম, তা বুঝলুম পরে। যত ভাল দৃশ্য দেখি ততই সকলের আগে আমার মনে পড়ে রিক্সাওয়ালার সেই করুণ মুখটা।

আসাম মেলে আসবার সময় দেখলুম আড়ংঘাটা ছাড়িয়ে রেলের দু'ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত বন্যার জলে ডুবে আছে। ঠিক আমাদের দেশের মত বন্যা এসেচে এখানেও, সর্ব্বত্রই এবার বন্যা, এ পথে ১৯২২ সালের

বড় ভাল লাগলো এই বেড়ানোটা আজকার। জীবনে এ একটা স্মরনীয় দিন। যেন অন্য জগতে এসে গিয়েচি। শিলংএর শোভা তো অদ্ভুত বটেই—তা ছাড়া সুপ্রভার মত মমতাময়ী মেয়ের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি ক'জন পায় ?

হোটেলে এসেই কালকের সেই গরীব রিক্সাওয়ালার কথা মনে এসে দুঃখে চোখে জল এল। যদি আবার তার দেখা পাই। আমার নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত করবো। বাস্তবিকই অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কী ভালই লেগেছে আজ সন্ধ্যায় বনফুল-ফোটা পাইন বনের পথে সুপ্রভার সঙ্গে বেড়ানোটা। আর কি সুন্দর দৃশ্য চারিধারে, এমন ঢেউখেলানো ঘন সবুজ শৈল শীর্ষ অন্য কোনো জায়গায় দেখিনি। ছোট নাগপুরের পাহাড়ের চেয়ে শিলং-এর পাহাড়রাজি অনেক বেশী সুন্দর। অনেকদিন আগে একবার ডায়েরীতে লিখেছিলুম যে ছোটনাগপুরের পাহাড় আর বাংলা দেশের বনানী এই দুটোর একত্র সমাবেশ হয়েচে, এমন কোনো জায়গা যদি থাকে, তবে তার সৌন্দর্য্যের তুলনা হবে না। আমার একটি স্বপ্ন ছিল ঐ দুইয়ের একত্র সমাবেশ আছে এমন একটা জায়গা দেখব। কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে পেছনের মেঘস্তূপগুলোকে পাহাড় কল্পনা করে কতবার নিজের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু এখানকার বনানী দেখে বুঝলুম স্বপ্ন-লোকের সন্ধান পেয়েচি। লতা, ঝোপ, জঙ্গল, নিবিড় undergrowth, পরগাছা, চঞ্চল, উচ্ছল ঝরণাধারা, শিলাখণ্ড, বিরাট বনস্পতির দল, বড় বড় নদীখাত—সব রয়েচে এখানে, অনেক বেশী রয়েচে—আর কী বাঁশবন, পাহাড়ের সর্ব্বত্র শুধুই বাঁশ—আর নতুন কোঁড় বেরুচ্চে সোনার সড়কীর মতো হেমন্তের প্রথমে—কি শোভা সে নবোদ্গত তরুণ বেণুদণ্ডের, কী

তার ছায়া, কি তার শন্‌শন্‌ মর্ম্মর ধ্বনি, বাংলার গাছগুলোর মত সেই স্নিগ্ধ হৈমন্তী সুঘ্রানটি পথে পথে। অবিশ্যি তিনহাজার ফুটের ওপরে আর ও প্রকৃতির ট্রপিক্যাল অরণ্য নেই, শুধুই পাইন, আর পাইন।

সকালে উঠেচি, এমন খুব কিছু শীত নয়। বাংলাদেশের পৌষ মাসের শীত এর চেয়েও বেশী হয়। সুপ্রভাদের ওখানে যাবো বলে বেরিয়েচি, দেখি সুপ্রভা ও আরও দুটি মেয়ে আসচে, পথে দেখা হোল। একটি মেয়ে আসামী, নাম উষা ভট্টাচার্য, ফিলজফিতে এম, এ পাশ করেচে—সে প্রথমে বললে—আসামী ভাষা ছাড়া সে জানে না। তার খানিকটা পরে বেশ বাংলা বলতে লাগলো। পাইন্‌ মাউন্ট স্কুলের পথে আমরা উঠলুম একটা পাহাড়ের মাথায়—সেখানে একটা চমৎকার পাইনবন, ঘন, নির্জ্জন। তারপর নেমে Kench strasse দিয়ে সরীতলা বেড়াতে গেলুম। নির্জ্জন পাইনবনে আমরা বসে রইলুম বহুক্ষণ। বিকেলে ওরা মোটর নিয়ে এল, সবাই মিলে Elephant falls বেড়াতে গেলুম। নির্জ্জন পাইনবনের মধ্যে দিয়ে পথ—gorgeটার ওপর একটা কাঠের পুল আছে। আমরা তার পাশের পাথরে কাটা সিঁড়ি ধরে ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে একেবারে নীচে দাঁড়ালুম। কত বিচিত্র ফার্ণ ও বন্যপুষ্প পাহাড়ের গায়ে দুধারে। খুব বৃষ্টি এল, আমি একটা পাথরের ছাদের তলায় দাঁড়ালুম। সুপ্রভারা কাঠের পুলটায় দাঁড়িয়েছিল, নেমে দেখতে এল আমি উঠ্‌চিনা কেন। সবাই বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে মোটরে উঠলুম, তখন আবার বেশ রৌদ্র। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশের নীল ফুটে বেরিয়েচে! সনৎ কুটীরে এসে চা খেয়ে আমি বেরুলুম লেক্‌ দেখতে। তারপর চেরাপুঞ্জি যাবার জন্যে মোটর স্টেশনে গেলুম। আসবার পথে

ইউনিভার্সিটি থেকে যে ছাত্রদের দল এসেচে, তাদের ওখানে গিয়ে গল্প করলুম।

আপার শিলং-এর যে পথে আজ এলিফ্যান্ট্ ফল্স্-এ গেলুম—সেটি বড় সুন্দর জায়গা। মাঝে মাঝে খুব নীচে পাইনবনে আচ্ছন্ন অধিত্যকা—দূরে দূরে লাবান ও শিলং পাহাড়-চূড়ায় ঘন কালো মেঘের কুণ্ডলী—এই রোদ, এই মেঘ, আবার এই রোদ। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের মত ছোটখাটো ব্যাপার তো নয় এ, খাসি ও জয়ন্তী শৈলমালার কূলকিনারা পাওয়া যায় না একটা ছোট জায়গা থেকে। এর কতদিকে যে কত কি দেখবার জিনিষ আছে, তা তিনদিনের মধ্যে শেষ করা অসম্ভব। তবে জায়গাটা বড় মেঘলা, বৃষ্টি লেগেই আছে, রোদের মুখ কুচিৎ দেখা যায়। এত ভিজে জায়গা আমার পছন্দ হয় না। শুক্‌নো খট্‌খটে, নীরস জায়গা আমি বেশী পছন্দ করি, শিলং একটা ভিজে স্যাঁতসেতে ব্যাপার। ... ঘেরে পাইনবনও আমার ভাল লাগে না। এইজন্যে গৌহাটী থেকে শিলং-এর পথে আড়াই হাজার ফুট নীচেকার নিবিড় বনানীর সৌন্দর্য্য যেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এখানকার rolling down-এর মরকত শ্যামরূপ তত ভাল লাগে না। আর সব জায়গাতেই মাটি আর কাদা, কোথাও বসা যায় না, ভিজে—একখানা বসবার পাথর নেই কোথাও। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মত যেখানে সেখানে শিলাখণ্ড ছড়ানো নেই, অনাদৃত প্রস্তরময় শৈলগাত্র কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এত ঝর্ণা, এত বন্য-পুষ্প, সেখানে কোথায়? শিলং সহর অতি সুন্দর, ছবির মত সাদা সাদা বাড়ীগুলো পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সাজানো। Kench strasse-এ ধনী ও সৌখীন বাঙ্গালীদের বাস—বেশ চমৎকার সাজানো বাগান সেদিকে। প্রায় সকলের বাড়ীতেই ফুলবাগান। গোলাপ,

ডালিয়া, কস্‌মস্‌, ফর্গেট্‌-মি-নট্‌ এসময়ে প্রচুর। বন্যজঙ্গলের মধ্যে এক ধরণের compositae প্রায় পাইনবনের নীচে সর্ব্বত্র। আর এক রকমের lichen আমি তার নাম দিয়েছি bird's feather lichen—গাছের ডাল থেকে টুপ্‌ টুপ্‌ করে ঝড়ে পড়চে। এলিফ্যান্ট ফল্‌স্‌ এ যাবার পথে সুপ্রভা একরকম বনের ফল তুলে খাচ্ছিল, আমাকেও খেতে দিলে—রাঙা ছোট ছোট যেন কুঁচফলের মত—খেতে টক্‌। ও ফল আবার খাসী মেয়েরা বাজারে বিক্রী করচে। ও বাজে ফল যে কে পয়সা দিয়ে কিনে খায়? খাসিয়া মেয়েরা দেখতে বেশ, এক একটা এত সুন্দর, ও এমন চমৎকার তাদের মুখশ্রী! ও বেলা সনৎ কুটীর যাওয়ার পথে একটি মেয়ে দেখেছিলুম, সে একেবারে পরীর মত সুন্দরী।

এত ব্যাপার সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে শিলং সহর আমার ভাল লাগে নি। সে প্রাণ মাচানো সৌন্দর্য্য, বিরাট রুক্ষ রূপ নেই এখানকার প্রকৃতির—যা দেখেছি নাগপুরের রামটেক পাহাড়ে, Highland drive-এ বা নীল-ঝর্ণার ছোট্ট পাহাড়ে বা সিদ্ধেশ্বর ডুংরীতে। এ বড় বেশী সাজানো—বেশী পুতু পুতু, সাজগোজ পরানো আহ্লাদী পুতুল। দেখতে চমৎকার কিন্তু মনে কোনো বড় ভাব জাগায় না।

একথা কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের lower elevation-এর পক্ষে খাটে না—সেখানে যা দেখে এসেচি, তার তুলনা নেই—আমি এখন বলচি শুধু শিলং সহর ও আপার শিলংএর কথা। আমি যা ভালবাসি, প্রকৃতির সে বর্ব্বর বন্যরূপ এখানে নেই—ঐ যে বল্লুম, বেশ সাজানো গোজানো আহ্লাদী পুতুলটি। পাইনবন অবিশ্যি খুব চমৎকার বটে কিন্তু রোমান্টিক্‌ বৈচিত্র্য নেই ট্রপিক্যাল বনের মত। কিন্তু lower elevation-এ এক জায়গা থেকে সার জোসেফ হুকার দু'হাজার নানা শ্রেণীর গাছপালা সংগ্রহ

করেছিলেন। শিলংকে রেলওয়ে বিজ্ঞাপনীতে, প্রাচ্যদেশের স্কটল্যাণ্ড' বলে কেন জানি নে—এই যদি স্কটল্যাণ্ড্ হয়, তবে স্কটল্যাণ্ডের ওপরে আমার শ্রদ্ধা কমে গেল।

অথচ যে কেউ শিলং আসবে, সবাই বলবে—উঃ, কি চমৎকার জায়গা মশাই শিলং! একজন যা বলে, সবাই তার ধুয়ো ধরে। এগুলোর চোখ নেই নাকি? এই ভিজে স্যাঁৎসেতে একঘেয়ে পাইনবন তাদের ভাল লাগে? কি ভিজে, কি ভিজে, 'rain, rain, go to spain' নীচে নেমে চল মন, শিলং মাথায় থাকুন, বাংলার সমতল জমিতে নেমে রোদের মুখ দেখে বাঁচি।

একটা পাহাড়ের মাথায় প্রস্তরখণ্ডে বসে লিখ্‌চি। চারিধারে সোনালী কী ফুল ফুটে আছে। দূরে সমুদ্রের মতো সিলেটের সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর পথ! শিলংটা যেমন বাজে, চেরাপুঞ্জি একেবারে স্বর্গ। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির পথের তুলনা দেবো আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, কারণ আমি এ ধরণের ল্যাণ্ডস্কেপ্ কখনো দেখিনি। যারা বিলেত বা আয়র্লণ্ডের ঢেউখেলানো সবুজ ঘাসের মাঠ দেখেছেন তাঁরা হয়তো বলবেন এর দৃশ্য Surrey downsএর মত বা আয়র্লণ্ডের পল্লী অঞ্চলের মত। গৌহাটী থেকে শিলং রোডে যা দেখে এসেচি, তা থেকে এর দৃশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। বড় বড় চুণাপাথরের শিলাখণ্ড সর্ব্বত্র ছড়ানো—উঁচু নীচু শৈলমালা সর্ব্বত্র। যেদিকে চোখ যায়—কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প মাঠের মধ্যে। শিলাস্তূপের ধারে ধারে, দূরে দুচারটে সঙ্গীহারা গাছ হয়তো ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শিলং-এর সেই লাল ফুলটা, Compositae, বন্যমল্লিকা জাতীয় এক রকম ফুল। করবীফুলের মত কি ফুল—আরও কত কি

ধরণের ফুল। চেরাপুঞ্জির থেকে মুশমাই-এর পথে যে জঙ্গল আছে তা দেখায় ঠিক যেন লিচুগাছের বাগানের মত—অথচ তাদের ডালে ডালে পরগাছা, ও অর্কিডে ভরা—তলায় নিবিড় undergrowth—অদ্ভুত ধরণের বন। এক এক জায়গায় চূণা পাথরের শৈলসানু ও নদীখাতের বিশাল ঢাল সম্পূর্ণরূপে বন্যপুষ্পে ভরা—কত ধরণের যে ফুল, তাই গুণে সংখ্যা করা যায় না। পাইনবন এদিকে একেবারেই নেই। চেরা বাজারে গাড়ীতে বসে লিখ্‌চি—সামনে নদীর বিরাট gorgeটা মেঘ ও কুয়াসায় ভরে গিয়েচে, তার ধারে নিবিড় বন। গাড়ী ছাড়্‌লো—এত জোরেও গাড়ী চালায় খাসি ড্রাইভারগুলো! উঁচু নীচু শুক্‌নো খটখটে রাস্তা দিয়ে তীরবেগে গাড়ী ছুটচে, একদিকে উজ্জ্বল পর্ব্বতচূড়া, বনফুলে ভরা শৈলসানু, অন্যদিকে নদীর বিরাট খাত, কুয়াসা ও মেঘ আট্‌কে রয়েচে। তাতে আবার রামধনুর সৃষ্টি করেচে। এক এক জায়গায় ঘন বন, যেন লিচু বাগানের মত দেখতে। অথচ মধ্যে ঘন অন্ধকার, শাখাপত্রে নিবিড়, ডালে ডালে অর্কিড, নীচে undergrowth ওয়ালা বন, এ অঞ্চলের কী একটা গাছও চিনিনে! আসামের বন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, না ফার্ণ, না Compositae, প্রাইমুলা, না মল্লিকা, করবীর মত ফুলগুলো—কিছুই কি বাংলাদেশের মত নয়? উনবিংশ মাইল থেকে বড় নদীখাতটা সুরু হোল, প্রায় ৮।১০ মাইল মোটর রোডের সমান্তরাল চলেচে, তবে কুয়াসায় আবৃত বলে ভাল দেখা গেল না। অপর পারের সানুদেশে নিবিড় Temperate forest, ফার্ণ আর শেওলা, থুজা আর প্রাইমুলা অজস্র। যার অভাবে শিলং ভাল লাগছিল না—তা পেলুম আজ চেরার পথে। এত বেশী পরিমাণে পেলুম, যে আর আমার কোন অভিযোগ নেই শিলংএর বিরুদ্ধে। এ এক স্বপ্নলোক আবিষ্কার করেচি চেরার পথে, যে স্বপ্নলোক পাথরে,

বনে, ফুলে, মেঘে, ধূ ধূ নির্জ্জনতায়, বিরাটত্বে, অভিনবত্বে বিচিত্র। যেখানে আজ মুশমাই গ্রামে চেরা মালভূমির প্রান্তে শিলখণ্ডে বসে লিখছিলুম, সে সৌন্দর্য্যের তুলনা আছে? ওই তো আমার চিরকালের স্বপ্নের সার্থকতা।

শিলং ফিরে দেখি সুপ্রভা নেই মোটর ষ্টেশনে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম, তারপর লাবান চলে গেলুম। একটা কথা লিখতে ভুলেচি। বড় বাজারের কাছে যখন বাস থেমেচে ছুটি সাহেবের ছেলে এসে মোটরে উঠলো, কি চমৎকার চেহারা ছুটির। বড়টির সঙ্গে আলাপ হোল বেশ লাজুক, কোন ইংরেজ বালকদের মত উগ্র নয়। বল্লে তার মা খাসি মেয়ে। মোটর স্টেশনে সুপ্রভাদের জন্যে অপেক্ষা করে লাবানে গেলুম। ওরা মোটর যোগাড় করতে পারেনি বলে আসতে পারনি। সেখানে চা খেয়ে বীনা ও সুপ্রভার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। বীনা একটা ফুলের তোড়া দিলে চমৎকার শাদা গোলাপ ফুলের তোড়াটি। কাল যাওয়ার কথাবার্ত্তা হোল, সাড়ে আটটার সময় গাড়ী আসবে আমার হোটেলে। একখানা ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েচে, তিনজনে যাবো আমরা। ও বল্লে কমলা লেবু অনেক করে সঙ্গে, গাড়ীতে বড় মাথা ঘোরে।

বৃষ্টি নামলো সামান্য। আমি হোটেলে ফিরলুম। রাত সাড়ে সাতটা।

কাল সকালে শিলংয়ের ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গেলুম, চারি ধারে পাইনবনের সারি, দূরে লাবান হিলের চূড়া, লেকের ধারে শিশির-সিক্ত নানা গাছপালা—বেশ ভাল লাগলো শিলং সহরটাকে। কিন্তু সময় নেই, তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। সাড়ে আটটাতে সুপ্রভাদের গাড়ী

আসবে, কাজেই রেণুর চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়েই হোটেলে এসে স্নানাহার করে নিয়ে তৈরী হয়ে বসে রইলুম। খানিক পরে সুপ্রভার ভাই শান্তি এসে বললে—এ কি! আপনি রয়েচেন যে! আমি তো অবাক্, রয়েচেন মানে কি? গাড়ী কোথায়? শান্তি বল্লে—গাড়ীতো আপনার এখানে এসেছিল, আপনাকে না পেয়ে চলে গেল। শুনলুম হোটেলের ম্যানেজার ভুল করে বলে দিয়েচে যে আমি ট্যাক্সি আসার দেরী দেখে বাসে সিলেট্ রওনা হয়েচি। কাজেই ওরা চলে গিয়েচে।

কি বিশ্রী ব্যাপার! রাগে, দুঃখে তো আমার চোখে জল এল। আমি হাঁ করে বসে আছি সকাল থেকে সেজেগুজে গাড়ীর জন্তে—আর হোটেলের ম্যানেজারটা না জেনেশুনে বলে দিলে আমি সিলেট্ চলে গিয়েচি?...

তখনি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে প্রথম টোল্ গেটে রওনা হলুম—মাত্র ৩২ মিনিট সময় হাতে আছে, এই ৩২ মিনিটের মধ্যে ১৪ মাইল গিয়ে নঙ্মাল্কি গেটে ওদের গাড়ী ধরিয়ে দিতে হবে। গাড়ী ছুটলো তীরবেগে—Upper Shillongএর রাস্তা দিয়ে। মোড়ের মাথায় আমি থামতে দিইনে। ড্রাইভার বলে গাড়ী উল্টে যাবে বাবু। বাঁকের মুখে দশ মাইলের বেশী চালাবার উপায় নাই, তাতে খালি গাড়ী। এলিফ্যান্টা ফল্স্এর কাছে যখন এলুম, তখন ড্রাইভার বল্লে, ভরসা করছি বাবু, ধরিয়ে দিতে পারবো।

চালাও চালাও, আরও জোর দাও—ত্রিশ কেন, চল্লিশ করো না? আর কতটা? শুধুই উঁচু নীচু, বাঁকা আর বাঁকা, খাদের মত রাস্তা চলেচে পাহাড়ের গায়ে। জোর দেয় বা কি করে? নঙ্মাল্কি গেটে

দূর থেকে দেখা গেল দুখানা বাস আর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েচে। আমরা পৌছতে না পৌছুতেই ট্যাক্সিখানা ছেড়ে ঠিক সিলেটের পথে গিয়ে উঠ্‌লো বাঁ দিকে। আমি ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি থামালুম, দেখি তাতে এক সাহেব আর মেম। খবর নিয়ে জানলুম আর একখানা সাদা ট্যাক্সিতে দুটী বাঙালী মহিলা ও এক ভদ্রলোক কিছু আগে চলে গেলেন।

কি আর করি, নিরাশ হয়ে ফিরলুম। শিলং পোস্টাফিসের কাছে দেখি কান্তি দাঁড়িয়ে পথে, তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিলুম। সে বল্লে— একটায় সিলেটের ডাক ভ্যান ছাড়ে, তাতে লোকও নেয়। আমার মন বেজায় খারাপ, শিলং থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই, কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে মেল ভ্যানে টিকিট বুক্ করে এলুম। পথে সুভদ্রার সেই দাদা মোটরে যাচ্ছিলেন, আমায় দেখে বল্লেন—কি, আপনি যান নি? এখানে যে?

আমি সব বল্লুম। সুপ্রভার বুদ্ধির নিন্দাও করলুম। তিনি বল্লেন— তার কোনো দোষ নেই। আমিও ছিলুম তখন, আপনার হোটেলে গিয়ে দশমিনিট আমরা গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে। হোটেলের ম্যানেজার বল্লে—গাড়ী না আসাতে আপনি মোটর বাসেই সিলেট চলে গিয়েচেন। পুঁটুর মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল তাই শুনে। সে খুব দুঃখিত হয়েচে মনে হোল।

কি আর করবো, যা হবার তা হয়েচে। এতদিন থেকে ঠিক করে আসচি, যে সিলেটের পথ দিয়ে সুপ্রভার সঙ্গে যাবো, তা উভয় পক্ষের সামান্য বুদ্ধির দোষে ঘটলো না।

একটার সময় বাস ছাড়লো। নঙ্‌মাল্‌কি গেটে গিয়ে আমি টাইম-কিপারের কাছে জিজ্ঞেস্ করে জানলুম ওবেলা সুপ্রভাদের ট্যাক্সিখানা

৮-৪২ মিনিটে ওরা পার হয়ে গিয়েচে, আর আমি এসেচি ৮-৫২ মিনিটে! ঠিক দশ মিনিট আগে গিয়েচে ওরা।

সিলেটের পথ অপূর্ব্ব। বেশ বিপজ্জনকও বটে, ডাইনে বাঁয়ে বিরাট বিরাট gorge—তায় ঢালু নিবিড় বনে চাপা। ট্রি ফার্ণ আর কত ধরণের গাছ, কত কি ফুল। চেরাপুঞ্জির পথের সে gorgeটা এদের তুলনায় কিছু না। কুয়াসা করে আছে gorgeএর মধ্যে। যেন ওর মধ্যে কেউ কাঠখড়ে আগুন দিয়েচে, সাদা ধূঁয়া উঠচে। ডাইনে খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল, মধ্যে সরু পথ, বাঁয়ে গভীর খাত। খাদের দিকে জানলা দিয়ে চাইলে মাথা ঘুরে উঠে, নীচু পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ঢালুতে কত রকমের গাছপালায় নিবিড় বন। চেরাপুঞ্জির সেই সব ফুল, আরও সংখ্যায় বেশী। খাসি ড্রাইভার প্রাণের মায়া রাখে না। সেই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বেজায় আঁকা বাঁকা উঁচু নীচু সংকীর্ণ পথে তীরবেগে গাড়ী ছুটিয়েচে—যদি স্টীয়ারিং একটু বেগড়ায়, কি গাড়ী স্কিড্ করে—তবে একেবারে ২০০০ ফুট নীচে পড়ে গাড়ীসুদ্ধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।

পাইউম্ ব্লো গেটে দুদিকের গাড়ী একত্র না হোলে মোটর ছাড়ে না। এদিক থেকে শিলংএর, ওদিক থেকে সিলেটের বহু বাস্ ও প্রাইভেট্ কার্ দাঁড়িয়ে। নেমে বেড়ালুম, দূরে সিলেটের সমতলভূমি মেঘের মত দেখা যাচ্চে। আমি কেবলই ভাব্চি—কয়েক ঘণ্টা মাত্র আগে সুপ্রভা এইখান দিয়ে চলে গিয়েচে—এখন যদি সে থাকতো, দুজনে কত গল্প করতুম! সত্যি, সারা পথটাতে যখনই সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বতায় বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েচি, তখনই ওর কথা আমার মনে হয়েচে। হর্ষবিষাদে ছুটেছে আজকার গোটা অপরাহ্নটির এ বিচিত্র যাত্রাপথ। পাইউম্ব্লো ছাড়িয়েও কত gorge—নংটু বলে একটা জায়গায় কয়েক মাইল মাত্র আগে একটা

সুগভীর নদীখাত, তার মধ্যে কি নিবিড় অরণ্যানী, চেয়ে দেখলুম অত নীচে তো নজর হয় না, তবুও যতটা দেখলুম নিবিড় কালো অন্ধকার হয়ে রয়েচে ভেতরটা। শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্চে সেই ট্রি ফার্ণ শোভিত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। নংটু থেকে পথ অনেক নেমে গেল, গাছপালার শোভা আরম্ভ হোল, সত্যিকার বন যাকে বলে তা আরম্ভ হোল। সে বনের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কখনো সে ধরণের নিবিড় বন দেখিনি। সে বন অন্ধকারে নিবিড়, দুষ্প্রবেশ্য, আর্দ্র, কত কি বিচিত্র গাছপালায় ভরা। আসামের এদিকের একটা গাছও আমার পরিচিত নয়। জংলা কলা, সুপুরী, Cycades, বাঁশ, পাম্ এসবও আছে। ফুলই বা কত রকমের। বড় বড় পার্ব্বত্য ঝর্ণা শিখরদেশ থেকে নিচে সবেগে নাম্‌চে। (আর এখন লিখবো না, টেপাখোলাতে স্টীমার এল, এর পরেই গোয়ালন্দ, জিনিষপত্র গোছাতে হবে)

কলকাতায় বসে সেই পথের কথাই মনে পড়্‌ছে!

সেই অপূর্ব্ব পথের সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসে সারাক্ষণ কেবল ভেবেছি—আহা, সুপ্রভা যদি থাকতো, তবেই এটা দেখাতুম, ওটা বলতুম, আহা, সে নেই, কাকেইবা বলি? আমার পাশে যে কয়েকটি লোক বসে—সবাই লাট-দপ্তরের কেরাণী, ছুটীতে বাড়ী যাচ্ছে—তারা বসে ঢুলছে, নয়তো গল্প করছে অবিশ্রান্ত, দুজনে বমি করতে সুরু করে দিলে, কেউ চেয়েও দেখছে না সেই বিরাট gorgeগুলোর সৌন্দর্য্য তার উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের বৈচিত্র্য, কত ট্রি ফার্ণ, কত-কি বিচিত্র বনফুল, কত ঝর্ণা, মেঘ উঠছে, Gorge থেকে, গভীর খাতের নিম্নতল থেকে ওপর পাহাড় পর্য্যন্ত বহু Zone-এ বিভক্ত উদ্ভিজ্জসংস্থানের বৈজ্ঞানিক রূপ। কি বিপজ্জনক সংকীর্ণ রাস্তা পাহাড়ের

ওপর ; কি রূপ সারাপথের। নংটু থেকে ডাওকি পর্য্যন্ত সে কি নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানী, গভীর Gorge-এর তলদেশে কালো অন্ধকারের মধ্যে, কত জংলী ফল, Cycawers, ফার্ণ, আর ফুল, ফুল, ফুল—পাহাড়ের সানুদেশ আলো করে রেখেছে সেই লাল ফুলটাতে—সুপ্রভা বলেছিল যেটা সিলেটের সমতলভূমিতেও দেখা যায়—দশ বারোটা বিভিন্ন শ্রেণীর ফুল গুনেচি, বড় বড় লতা, পরগাছা, অনেক নীচে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী বয়ে চলেচে শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে, সেই ট্রি ফার্ণ-শোভিত নিবিড় বনের মধ্যে। সত্যিকার ট্রপিক্যাল প্রকৃতির অরণ্যানী এই প্রথম দেখলাম ডাওকির পথে।

ডাওকিতে যখন মোটর পৌছলো তখন অস্তদিগন্তের আভায় পর্ব্বত ও অরণ্যাণীর শীর্ণ দেশ রাঙা হয়ে উঠেচে—নিস্তব্ধ চারিদিক। মধ্যে নীচু উপত্যকায় ঘন ছায়া নেমেচে, গাছপালার সুগন্ধি বেরুচ্ছে যেমন হেমন্তের অপরাহ্নে আমাদের দেশে বেরোয়। সুন্দর জায়গাটা দু' একটা ডাকবাংলা আছে টিলার মাথায়। সম্ভবতঃ অস্বাস্থ্যকর স্থান, পাহাড়ের নিম্নসানুতে সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে। এখানে চা খেয়ে নিলুম, তারপরে আবার মোটর ছুটলো—শৈলমালা চলেচে মোটর রোডের সমান্তরাল ভাবে বাঁ দিকে, অনেকগুলো ঝর্ণা নেমে আসচে পাহাড় থেকে নিম্নে বনানীর মাথার ওপর, দুধারে ছোট খাটো জঙ্গল আর জলাভূমি, বড় বড় নল খাগড়ার বন। মোটর ছুটেচে তীরবেগে, হু হু হাওয়া বাধচে বুকে, তৃতীয়ার এক ফালি চাঁদ উঠেচে সামনের আকাশে। সন্ধ্যায় অন্ধকারেই জয়ন্তীপুর বলে একটা গ্রামের ডাকঘর থেকে ডাক তুলে নেওয়ার জন্যে গাড়ী সেখানে দাঁড়ালো। সাড়ে সাতটায় সিলেট টাউনে এল। টাউনটা আমার ভাল লাগলো না—Reed huts আর [illegible] সিনেমা—বেতের ও

বাঁশের আসবাব বিক্রী হচ্ছে দোকানে। সময় খুব অল্পই ছিল, সুরমা নদীতে খেয়া পার হয়ে স্টেশনে এসে গাড়ীতে চড়লুম। কি ভিড় গাড়ীতে, আজই সব আপিস আদালত বন্ধ হয়েচে, সব লোক ছুটেচে বাড়ী, পা রাখবার জায়গা নেই। কুলাউড়াতে আসবার পর কুলাউড়া আর শ্রীমঙ্গলের মধ্যে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গল, চা বাগানও নীচে আছে, কিন্তু অন্ধকারে কোন্‌টা চা বাগান আর কোন্‌টা জঙ্গল এ বোঝা বড়ই শক্ত। কুমিল্লাতে একদল ছেলে উঠল, তারা ময়নামতী সার্ভে স্কুলের ছাত্র, ছুটীতে বাড়ী চলেচে। ঘুম পেলে না গাড়ীতে, যদিও জায়গা যথেষ্ট ছিল। চাঁদপুরে স্টীমারে পানীয় জলের ট্যাঙ্কের ওপর বসে বেলা একটা পর্য্যন্ত কাটালুম। ডেকে পা রাখবার জায়গা নেই, সর্ব্বত্র লোকে বিছানা পেতে শুয়ে বসে আছে। পদ্মাবক্ষে কাটলো প্রায় এগারো ঘণ্টা। ভাগ্যকুলে কিছু খাবার কিনে খাই। গোয়ালন্দ থামবার আগে সে কি ভীষণ বৃষ্টি আর ঝড়! তাতেই স্টীমার দেরি করে ফেললে আসতে। চাটগাঁ মেলে চড়ে বসে ভাবলুম এ তো বাড়ী এসেচি, আমাদের রাণাঘাট দিয়ে যে-ট্রেণ চলে সে তো বাড়ীরই সামিল।

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হোল। খুব দীর্ঘ হয়তো নয়, কিন্তু দীর্ঘটা Relative term আমার আছে এই ভ্রমণই খুব দীর্ঘ বটে। তা ছাড়া সুপ্রভাকে কতদিন দেখিনি, ওর আদর যত্নে এবারকার ভ্রমণের স্মৃতি মধুর হয়ে থাকবে চিরকাল।

ওখান থেকে ফিরে নলহাটি এসেচি কাল রাত্রে। রেলকোম্পানী জায়গাটা ভালো বলে যতই বিজ্ঞাপন দিক, আসলে জায়গাটা ভালো নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে তো কিছুই না—শুধু ধানের

ক্ষেত চারিধারে, একটু ডাঙা আছে, এখানকার লোকে বলে 'পাহাড়' —আমার মনে হয় সেটা একটা কাঁকর ও রাঙা মাটির ঢিবি। বেকালের পড়ন্ত ছায়ায় দূরপ্রসারিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের শোভা দেখা গেল ডাঙাটার ওপর থেকে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত, ওর বেশী আর কিছু নেই এখানে। জগধারী বলে একটা গ্রাম আছে দু'মাইল দূরে, ব্রাহ্মণী নদীর ধারে। সেখানে গুরুপদ সিংহের বাড়ী আমাদের নিমন্ত্রণ হোল। বীরভূমের এ অঞ্চলের ঘর-বাড়ীর গড়ন আমাদের চোখে ভাল লাগে না। গৃহ-নির্ম্মাণের শ্রী-ছাঁদ নেই, সৌষ্ঠব নেই, চেরাপুঞ্জিতে খাসিয়াদের পাথরের বাড়ীগুলোতেও যে রুচিজ্ঞানের পরিচয় পেয়েচি, এই সভ্য বাংলাদেশে তার নিতান্তই অভাব চোখে পড়লো। জগধারী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাড়ী দেখলুম পটে দুর্গা পূজা হচ্চে। সেকালের একখানা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা দেবীর পট টাঙানো, পেছনে রাঙা পাড় কাপড় পরা আগাগোড়া ঘেরা টোপে ঢাকা কলা-বৌ, পূজার উপকরণ যথেষ্টই, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে করলে যেমন হয় তেমনি। আমরা নদীতে স্নান করলুম, হাঁটু পর্য্যন্ত জল, কোনো রকমে শুয়ে স্নান করা গেল। কাছেই একটা মঠ আছে, সেখানে গিয়ে গুরুপূজার বিধি আছে দেখে এবং একটা মোটা লোকের ফটোগ্রাফের গলায় ফুলের মালা কৌশলে পরিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো হচ্চে দেখে চটে গেলুম এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করলুম। নর-পূজা আমার ভাল লাগে না, আমার ধাতে ও বরদাস্ত হয় না।

মুড়াগাছায় গিয়েছিলুম একটা লাইব্রেরীর বার্ষিক উ[illegible]বে। লোহারাম মুখুয্যে ওখানকার জমিদার, তাঁদের বাড়ীতে থাকবার জায়গা দিলে। বেশ লোক ওরা, কি খাতির-যত্নটাই করলে! ওদের বাড়ীর

একটা ছেলে বিলেত ফেরৎ, হিসেব শিখতে গিয়েছিল, দেখতে বেশ সুশ্রী, বসে বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত স্পেনের গল্প করলে। সকালে উঠে গ্রামের মধ্যে বেড়িয়ে এলুম—আমাদের দেশের কত গাছপালা, খুব বড় বড় বাড়ী গ্রামের মধ্যে, বড় বড় সেকেলে পূজোর দালান, যেন দিল্লীর মতি মসজিদ ক দেওয়ান-ই আমের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পূজোর দালানের এই স্থাপত্যটা মুসলমান তথা মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণ ও বিষয়ে কোন ভুল নেই। হিন্দু স্থাপত্য যে এটা নয়, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের, কোনারকের সূর্য্য মন্দিরের গঠনরীতি দেখলে তা বোঝা যাবে। কাছেই ধর্ম্মদহ গ্রামে বাবা ছেলেবেলায় কথকতা করতে এসেছিলেন, সে কথা মনে পড়লো স্কুলের মাঠে বেড়াতে গিয়ে। বৈকালে অল্পক্ষণই মিটিংএ ছিলুম, তারপরে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে ট্রেণে উঠলুম—দুধার বন্যার জলে ভেসে গিয়েচে, এখানকারও অবস্থা আমাদের দেশের মতই। ক'দিন কেবলই ট্রেণেট্রেণে বেড়াচ্ছি, ১৩ই অক্টোবর সুরু হয়েছে আর আজ ২৮শে, এই ১৫ দিনের মধ্যে কত জায়গায় গেলুম—আর কত বার বেড়ালুম।

আজ ক'দিন এখানে এসেচি। এবার অতিরিক্ত বন্যা আসাতে কুঠীর মাঠের সে শোভা নেই। আমার তেমন ভাল লাগে না—ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো তো জলে হেজে পচে গিয়েচে যেখানে সেখানে কাদা ও পানা-শেওলার দাম ও কচুরীপানা। খুকু এখানে আছে, ও রোজ সকালে স্নানের আগে ও দুপুরে আসে। আমি সকালে বাঁশবাগানের পথ দিয়ে ঘাটে যাই, বেশী বনের মধ্যে যাই মাকড়সার জাল লক্ষ্য করবার জন্যে। আর বছরের মত অত মাকড়সার জাল এবার চোখে পড়চে না। তা হোলেও খুব বড় বড় জাল দেখলুম, শিলং-এ একরকম বড় জাল দেখেছিলুম

পোষ্টাপিসের কাছে। আমাদের এখানে মাকড়সাদের জালের টানা খুব দূরে দূরে হয়। আবার খুব ছোট টানার জালও দেখিনি যে তা নয়, যেমন কুঠীর মাঠে একটা ঝোপে সেবার দেখেছিলুম, এই গাছপালা, লতাঝোপ, মাকড়সা, পাখী এদের একটা বিভিন্ন জগৎ—সহানুভূতির সঙ্গে ওদের না দেখলে কি ওদের বোঝা যাবে না চেনা যাবে?

বিকেলে রোজ মাছ ধরতে যাই। অনেককাল পরে আবার কেঁচোর টোপ গেঁথে মাছ ধরতে বসেচি। বোধ হয় বনগাঁ স্কুলে ভর্ত্তি হবার পরে আর কখনো মাছ ধরিনি—দু'একদিন ধরতে বসলেও এত তোড়জোড় করে যে ধরিনি তা ঠিক। এবার ইছামতীতে মাছও হয়েচে বিস্তর। আমার ছোট ছিপে কেবল পুঁটী আর ট্যাংরা ছাড়া পাইনে কিন্তু ফণি চক্কত্তি ও [illegible]পদ রোজ সাত আটটা বড় বড় বান মাছ ধরে। বেলা যত পড়ে আসে, রোদ খুব রাঙা হয়ে ওঠে। ভারী সুন্দর শোভা গাঙের, বকের দল উড়ে যায় জলের ওপর দিয়ে, সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামে—আমি ফাৎনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকবো না সন্ধ্যার শোভা দেখবো? চোখ ঠিক্‌রে যায় ফাৎনার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ এত ব্যথা হয় যে মনে হয় যেন খুব বই পড়েচি। সন্ধ্যার সময়টা খুব lovely লাগে কিন্তু বসে পাঁচীদের সঙ্গে গল্প করি।

আজ সর্ব্বপ্রথম ভাল লাগলো কুঠীর মাঠ। বন্যার দরুণ এবার কুঠীর মাঠের সে সৌন্দর্য্য ছিল না, ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো সব হেজে পচে গিয়েচে সে শ্যামলতা আর কোনোদিকে চোখে পড়ে না। আজ দুপুরে খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে [illegible] আমার মনে পড়লো যে এবার এসে আইনদ্দির সঙ্গে দেখা করা হয়নি। নব্বুই বছর হয়েচে ওর বয়স,

কবে মরে যাবে, যাই একবার দেখা করে আসি। মনে ছিল আনন্দ, কি জানি, কেন জানিনে সেই আনন্দ ভরা মন নিয়ে গেলুম পড়ন্ত বেলার হলুদে রোদ-মাখানো গাছপালার নীচে দিয়ে কাঁচিকাটা পুলের দিকে। বনের দিক থেকে এক এক জায়গায় কি সুন্দর ফুলের সুবাস ভেসে আসচে, অথচ কি ফুলের যে অত সুঘ্রাণ তা দেখা যায় না। খুঁজে খুঁজে দেখি পথের ধারে একজায়গায় ঝোপে নাটা কাঁটার ফুল ফুটেচে তার গন্ধ ঠিক আতরের মত। কিন্তু যে গন্ধটা আগে পেয়েছিলুম, তা নাটা ফুলের গন্ধ নয়। সে গন্ধ অন্য ধরনের। শুধু ফুলের গন্ধ বলে নয় বন-ভূমির পাশ দিয়ে যাবার সময় লতাপাতা, ফুলফলের গন্ধ জড়িয়ে মিশিয়ে যে অপূর্ব্ব সুবাসের সৃষ্টি করে গাছপালারাই তার স্রষ্টা, নীলাকাশের, তলায় কোটী যোজন দূরের সূর্য্যের রৌদ্রের সঙ্গে পৃথিবীর মাটির রস, বায়ুমণ্ডলের অদৃশ্য বাষ্প এদের সংযোগে ওরা যে রসায়ন প্রস্তুত করে তাই আমাদের প্রাণীজগতের উপজীব্য। ভূতধাত্রী তরুলতা নির্ম্মমভাবে ছেদন করবার সময় একথা সব সময় আমাদের মনে ওঠে না। তাই আজ সকালে যখন দেখলুম তেঁতুলতলার মাঠের ধারে খানিক করে জমির জঙ্গল কেটে দিয়েচে—তখন এত কষ্ট হোল! ওখানে নাকি ওরা বেগুণ করবে। আহা, কি চমৎকার চমৎকার সাঁই বাবলা ও কেয়োঝাঁকা গাছগুলো কেটেচে (?) আজ ত্রিশ বছর ধরে ওই বনভূমি কত বনের পাখীর আহার্য্য জুগিয়েচে, আশ্রয় দিয়েচে। সৌন্দর্য্যে, ছায়ায়, ফুলের সুবাসে আমাদের তৃপ্তি দিয়েচে, তাদের ওভাবে উচ্ছেদ সাধন করে যে কোন্ প্রাণে তাও বুঝিনে। একটা গাছ কেউ কাটলে আমি তা সহ্য করতে পারিনে। কাগজের কলের জন্যে আমাদের দেশ থেকে গাড়ী গাড়ী বাঁশ চালান যাচ্চে, বাঁশবন দেশের একটা শোভা, এবার সর্ব্বত্র দেখচি বাঁশবন বাঁশের

পথে চলেচে। দাম তো ভারী পাঁচ টাকা করে একশো—আমার ঝাড়ের বাঁশ আমি বেচিনি। দুপুরে যখন রৌদ্রে মাঠের মধ্যে গামছা পেতে চুপ করে শুয়ে থাকি, দূর গ্রাম সীমান্তে বাঁশের বনে নতুন বাঁশের দল সোনার সড়কির মত উঁচু হয়ে থাকে নীল আকাশের তলায়, সিমুলের ডাল বাতাসে দোলায়, রঙীন্-ডানা প্রজাপতিরা বনের ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, একটা গাঙ্ চিল ইছামতীর পারের বড় কদম গাছটা থেকে ডাকে—মনে আসে অপার ব্যোমের উদার ইঙ্গিত, বনপুষ্পের বাণী, বনবিহঙ্গের কলতান—যে সৃষ্টিকে যে জগৎকে জানিনে, বুঝিনে, ভাল করে চিনিওনে তার রহস্যে দেহ মন সবল হয়ে ওঠে।

তারপর গেলুম আইনদ্দির বাড়ীর পাশের পথটা দিয়ে মরগাঙের বড় বড় বট গাছের ছায়ায় ছায়ায় সুন্দর পুরের দিকে। আবার সেই বন ঝোপের গন্ধ, সেই ছায়া, সেই পাখীর ডাক। এবারকার বন্যায় অনেক গাছপালা নষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও এ পথের সৌন্দর্য্য তেমনি অক্ষুন্ন আছে। মনে হোল সেই ডাওকি নদীর দোদুল্যমান সেতু ও সেই [illegible]টার কথা।

ঠিক দুপুর বেলা। অপূর্ব্ব পূজার ছুটী ফুরিয়ে গেল। নৌকো বেয়ে চলেচি বনগাঁয়ে, মেঘলোক-শূন্য নীলাকাশের কোলে সাদা সাদা বকের দল উড়চে। মনে কেমন একটা বিষাদ গ্রাম ছেড়ে যেতে, ইছামতী নদী ছেড়ে যেতে, খুকুকে ছেড়ে যেতে। তার ওপর দেখে এলুম খুকুর জ্বর হয়েচে, আজ সকাল থেকে সে শুয়েই আছে। কিচ মিচ পাখী ডাকচে চালতে পোতার বাঁকে ঝোপে ঝোপে। মন উদাস হয়ে রয়েচে আমার, কিছু ভাল লাগচে না। কেন এমন হয়? যাদের

ভালবাসি, কাছে রাখতে চাই, তাদের কেন কাছে পাইনে? কোথায় সুপ্রভা পড়ে রইল শিলং-এ, দেখবার ইচ্ছে হোলেই কি তাকে দেখবার উপায় আছে? কোথায় পড়ে রইল খুকু। এই যে ওর অসুখ দেখে এলুম, কিছুই করবার নেই আমার—করতে গেলেই যত নিন্দা, যত কানাকানি হবে এই সব পাড়াগাঁয়ে।

খুব বেড়িয়েচি এবার ছুটিতে। সেই ডাওকি নদীর gorge, চেরার পথে সেই প্রাইমুলা ও Compositaeর বন মনে পড়েচে। চালতে পোতার বাঁকে এই গাছপালার সৌন্দর্য্যে, খুকুকে ছেড়ে আসবার বিষাদে মনটা পূর্ণ হয়ে আছে। এ সময় শিলং, নংট্ থেকে ডাওকি পর্য্যন্ত সেই বিরাট ট্রপিক্যাল অরণ্যানী যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

এই মাত্র বারাকপুর থেকে মোটরে ফিরে এলুম। আজ বেলা বারোটার সময় পশুপতিবাবু, বৌঠাকরুণ, নীরদ বাবু ও তাঁর স্ত্রী, বগলা বাবু ও আমি গিয়েছিলুম মোটরে বারাকপুরে বেড়াতে। পথে টায়ার খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুন একজায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর যখন বনগাঁ এলাম, তখনই বেলা গিয়েচে। জিনিষ পত্র কিনে নিতে কিছু দেরী হয়ে গেল। ওখান থেকে বেলা পড়ে গেলে বারাকপুর গেলাম। পুঁটীদিদিদের বাড়ীর সামনে মোটর গিয়ে দাঁড়ালো। খুকু নিজের বাড়ীতে কি করছিল আমি গিয়ে তাকে বল্লুম। সে কাপড় পরে তখনি এল। পশুপতি বাবু খুড়োদের রোয়াকে বসিয়ে তার ফটো নিলেন। আমিও সেখানে পেছন দিকে দাঁড়াই। তারপর বগলা বাবু গান করলেন 'চাঁদ [illegible] ভোর গগনে।' আমি পশুপতি বাবুকে নিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এলাম। এসে দেখি শিবুর মা নীরদ বাবুর স্ত্রীকে

নিয়ে গিয়েচে। একটু পরে তিনি এসে খুকুদের বাড়ী বেড়াতে গেলেন। আমিও দেখতে গেলুম। খুকু ডাকলে আসুন না? আমি ওদের ঘরে গেলুম। তক্তপোষের ওপর উনি আর খুকু বসে আছেন। তারপর খুকু দোরের কাছে এসে বসল। বগলা বাবু গান করলেন—আমিও সেই দোরের বাইরেই বসে। গান খুব ভাল হোল। তারপর সবাই খেতে বসা গেল। ওদিকে খুকু, বেলা ও পশুপতি বাবুর স্ত্রী খেতে বসলেন। খুড়ীমা পরিবেশন করলেন। খাওয়া দাওয়ার পরে খুকু একা এঘরের অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ করলে বগলা বাবুর গানের বিষয়ে। সুপ্রভার পত্র দেখতে চাইলে, তা ওকে তো না দেখিয়ে পার পাবার যো নেই। বল্লে, আবার কবে আসবেন? বল্লুম সেই বড়দিনের সময়। বল্লে, এসে বড় খারাপ লাগছিল এ ক'দিন, আজ ভাগ্যিস আপনারা এলেন?

রাত নটার গাড়ী গেলে আমরা রওনা হলুম। খুকু রোয়াকে দাঁড়িয়ে ছিল। বল্লে—গুড্ বাই। পশুপতি বাবু বকুলতলায় দাঁড় করিয়ে ওর একটা ফটো তুলেছিলেন, আর একটা কোন্ ঝোপের কাছে দাঁড় করিয়ে।

পথে জাহ্নবীর বাসায় খোকাকে নামিয়ে দিয়ে আমরা ওপারে গেলুম তেল কিনতে। বারাসতের কাছাকাছি এসে গাড়ীর টায়ার আবার গেল। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করবার পরে একখানা লরি পেয়ে তাতে করে কলকাতা এসে পৌঁছুলাম।

এ বেড়ানো মনে থাকবে বহুদিন।

চন্দননগরে একটা সভায় আমায় সভাপতিত্ব করতে হবে বলে

গিয়েছিল, কিন্তু শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের আজ বার্ষিক উৎসব। পশুপতি বাবু বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন। দুপুরে কিন্তু বাধ্য হয়ে চলে যেতে হোল চন্দন নগরেই। সুরেন মৈত্র, সুরেন গোস্বামী, বিজয়লাল চাটুয্যে, আমি, সকলে বেলা তিনটের সময় গিয়ে নৃত্যগোপালের পুস্তকাগারে উপস্থিত হোলাম। ওরা লাইব্রেরীতে বসে কথাবার্ত্তা বলছিল :—আমি পেছন দিকের নির্জ্জন ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে শীতের অপরাহ্ণের হল্‌দে রোদ মাখানো রাধালতাফুলের ঝোপ ও বাঁশগাছের দিকে চেয়ে রইলুম। কেবলই মনে হচ্ছে সুপ্রভা আর খুকু আজ এই অপরাহ্ণে কি করচে। একএকবার আমাদের গাঁয়ের বকুলতলাটী কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম, খুকু এখন পড়ন্ত বেলায় ছায়ায় তাদের শিউলি তলায় দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা পাঁচীর সঙ্গে গল্প করতে এসেছে এ বাড়ী। সুপ্রভার আজ ছুটী, হয়তো পাইন মাউণ্ট স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েচে। ওর রুমালখানা সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলুম। বড্ড ময়লা হয়ে গেছে। ওদের দুজনের কথা ভাবছি এমন সময় সুরেন বাবু ডাক দিলেন লাইব্রেরীতে ব্রাউনিং শোনাবার জন্যে। সুপ্রভা এবার ব্রাউনিংয়ের 'Rudel to the Prince of Tripoli'র অনুবাদ করেছিল 'বিচিত্রায়'। সুরেন বাবু তার অন্যভাবে অনুবাদ করেচেন—আমার দুটীই ভাল লাগলো—তবে সুপ্রভার অনুবাদ খুব literal না হোলেও মিষ্টি বেশী। সুপ্রভা যে ছন্দটাকে অবলম্বন করেচে, তার ধ্বনি ও লয়ের অবকাশ সুরেন বাবুর অবলম্বিত ছন্দের চেয়ে বেশী। ব্রাউনিং পড়া শেষ হয়ে গেলে আমাদের ফটো নেওয়া গেল। মনে পড়লো গোপীর সঙ্গে আজ কুড়ি বছর আগে একবার এসেছিলুম চন্দননগরে। তারপর আর কখনো আসিনি। বিয়ে করবো, তাই মেয়ে দেখতে এসেছিলুম, তখন আমি কলেজে পড়ি,

১৮ বছর বয়স। অবিশ্যি সে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয় নি। মনে আছে মেয়েটি ছিল খুব ছোট, বার বছর বয়স, অত ছোট মেয়ে আমি পছন্দ করিনি। মেয়েটি বেশ ফর্সা, একহারা চেহারা, তাও আজও মনে আছে। এখন গিন্নি-বান্নি হয়ে নিশ্চয়ই কোথাও ঘর সংসার করচে—যদি বেঁচে থাকে।

চন্দননগরে সভার কাজ শেষ হবার আগেই সুরেন বাবুকে সভাপতির আসনে বসিয়ে আমি আর বিজয়লাল চলে এলুম। হাওড়া থেকে বাসে দেশবন্ধু পার্কে এলাম। সেখানে শিশির কুমার ইনষ্টিটউটের থিয়েটার হচ্চে পার্ক স্কুলের প্রাঙ্গনে। নীরদ বাবু, বৌ ঠাকরুন, পশুপতি বাবু সবাই আছেন। জাস্টিস্ দ্বারিক মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হোল।

সেদিন রাজপুরে গিয়েছিলুম সন্ধ্যার কিছু আগে। ঢাকুরিয়া, কস্‌বা প্রভৃতি স্থানে রেললাইনের ধারে ছোট ছোট গৃহস্থ বাড়ী। সন্ধ্যার চাপা আলো পড়ে কেমন একটা শ্রী হয়েচে, যেন কত পুঞ্জীভূত শান্তি ও রহস্য, গৃহস্থালীর কত স্নেহ ভালবাসা এখানে আশ্রয় নিয়ে আছে, নারীর মুখের মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে, তার হাতের সন্ধ্যা প্রদীপের আলোয় সে শান্তি ও মাধুর্য্যের নিত্য আরতি চলচে। যেখানেই একটা মেয়ে এঁদো-পড়া পুকুরের ঘাটে বসে এই সন্ধ্যাবেলা বাসন মাজচে, সেখানেই তাকে ঘিরে যেন চারিপাশে গভীর রহস্য। মেয়েরা না থাকলে জগৎটা কি মরুভূমিই হোত তাই ভাবি।

রাজপুরে পৌঁছে গল্প করলুম তেঁতুলদের বাড়ী বসে অনেকক্ষণ। ফুলি এল, তেঁতুলের মা বলছিলেন তাঁকে ব[illegible]তে হরিদ্বার নিয়ে যেতে। সেদিন কত রাত পর্য্যন্ত ভ্রমণ সম্বন্ধে পরামর্শ হোল—কোথা দিয়ে

যাওয়া যাবে, কোথায় নামা যাবে, কি কি সঙ্গে নেওয়া হবে—এই সব কথা।

কিন্তু আমি দেখলুম গৃহস্থালীতে যে খুব শান্তি আছে, যতটা দূর থেকে দেখে ভাবি, তা ঠিক নেই। এ সব বাড়ীতে তো ছেলেমেয়েদের সর্ব্বদা কান্নাকাটি লেগেই আছে—যখন ছোট ছেলে মেয়ে চীৎকার করে কাঁদতে সুরু করে, তখন প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলে। আর এ করছে ওর সঙ্গে ঝগড়া, ও করছে এর সঙ্গে ঝগড়া। তেঁতুল তো আপিস্ থেকে ফিরে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে—তার বৌকে সবাই কেন একলা ওঘরে ফেলে রেখেছে। এ রকম শুধু এদের বাড়ী নয়, সব গেরস্ত বাড়ীতেই দেখেচি এই রকম অশান্তি, চীৎকার—চিন্তা ও বিবেচনার সম্পূর্ণ অভাব।

মেয়েরা যদি ভাল হয় তবে সত্যিই সংসারে ওরা শান্তি আনতে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মেয়েরা অধিকাংশই অশিক্ষিতা, বিশেষ কিছু জানে না, বোঝে না—তুচ্ছ বিষয়ে বড় বেশী ঝোঁক, তুচ্ছ কথা নিয়ে দিনরাত আছে। মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি কম মেয়েরই আছে। যে ধরণের সদাহাস্যময়ী মেয়ে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমি হাসিখুসি বড় ভালবাসি, যে মন খুলে হাসতে পারে না, আনন্দ করতে পারে না, তাকে নিয়ে সংসারে চলা যায় কি?

অনেকদিন পরে খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁর গান শুনলুম কাল ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। ভাগলপুরে থাকতে হেমেন রায়ের মুখে আব্দুল করিমের খুব প্রশংসা শুনি। তখন থেকে ইচ্ছা ছিল এঁর গান

শুনবো। আমি জানতুম না যে এবার All Bengal music conference-এ খাঁ সাহেব আসবেন। সেদিন কাগজে নাম দেখেই স্থির করলুম গান শুনতেই হবে। সত্যিই খুব বড় দরের শিল্পী, তা তাঁর গান শুনে কাল বুঝে নিয়েচি। সত্তর বছরের বৃদ্ধের মুখে এমন চমৎকার মিষ্টি সুর আশা করি নি, যেন সারেঙ্গী বাজ্‌চে।

এবার বড়দিনের ছুটী দেশে বড় আনন্দে কাটিয়েচি। বৈকালে রোজ কুঠীর মাঠে ছোট এড়াঞ্চি ফুলের বনের মধ্যে একটা চাদর পেতে বসে বসে Jeansএর universe around পড়তুম। একদিন চাঁদ উঠেচে ছোট একটা চট্‌কা গাছের পেছনে, বোধ হয় ত্রয়োদশী, বিকেল বেলা, সে একটা অপূর্ব্ব ছবি—কতকাল মনে থাকবে ছবিটা। পরের প্রতিপদেই হালিডাঙ্গার প্রজা বাড়ী থেকে খাজনা আদায় করে ফিরচি, দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে চাঁদ উঠ্‌লো, কোনোদিকে কোনো মানুষ নেই, পশ্চিম আকাশে দপ্‌ দপ্‌ করচে শুক্রতারা। একটা খেঁজুর গাছে রসের ভাঁড় পাতা ছিল, ভাঁড়টা নামিয়ে রস খেলাম, কিন্তু গাছে আর সেটা বাঁধতে পারলাম না। তখন আমার মনে হয় নি তাহোলে ভাঁড়টার মধ্যে দুটো পয়সা রেখে এলেই হোত।

এবার কি জ্যোৎস্না পেয়েছিলুম দেশে! যেমন দিনে আকাশ সুনীল, মেঘমুক্ত—রাতে তেমনি ফুটফুটে জ্যোৎস্না—অবিশ্যি শীতও অতি ভয়ানক। খুকু ছিল দেশে, সে সর্ব্বদাই এসে গল্প করতো, বেশ লাগতো তাই।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে উঠে গেলুম, চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার। কেমন একটা মনোভাব হোল, খানিকটা বিষাদও তার মধ্যে যে না আছে এমন নয়। এই চারিপাশের বাড়ীর কত

লোককে জানতুম যখন প্রথম এ মেসে এসেছিলুম, তারা সবাই কোথায় গেল? কতকাল হোল তাদের আর দেখি নে। তাদের কথাই মনে হোল এ নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে। দুপুরে স্কুলের ছাদে একা বসে বসে যাদের কথা ভাবি, এরাও তাদের দলে আছে। সত্যি, আমার মনের এ যে কি অদ্ভুত অবস্থা, কোনো পরিচিত বা অর্দ্ধপরিচিত মানুষকে দূরে রাখতে ইচ্ছে হয় না, সকলকে কাছে টেনে রাখতে ইচ্ছে করে যে কেন!

"Space & time, I am learning are merely modes or appearance
since a corner with thee darling, seems infinite now"

Goethe.

অনেকদিন পরে দেশে গিয়েছিলুম। দুপুরের পরে গিয়ে পৌঁছই। আমার ইচ্ছে, আমি যে গিয়েচি, কেউ যেন না টের পায়। কেন না [illegible] লোকের ভিড় হয়, এপাড়ার ওপাড়ার মেয়েরা দেখা করতে আসে। আমি অত ভিড় পছন্দ করিনে। বিশেষ করে ইন্দুদের বাড়ী জানতে পারলে তো আর রক্ষেই নাই। কিন্তু শ্যামাচরণ দাদাদের টিউব-ওয়েলের কাছে গোপাল দেখি কি করচে, সে তো গিয়ে বাড়ী খবর দেবে—সেই ভয়ে চুপি চুপি চলে যাচ্ছিলুম, তবু ও ঠিক টের পেয়েচে। তখন অগত্যা ওদের বাড়ী যেতে হোল। তারপর খুকুদের বাড়ীতেও গেলুম। খুকুদের বাড়ীতে প্রথমটাতে যাইনি পাঁচীদের বাড়ীর উঠোনে আমাকে ঢুকতে দেখেই খুকু ডাকলে, আসুন, আসুন। ওদের দাওয়াতে গিয়ে বসে অ[illegible]গল্প করলুম। ও বল্লে—আপনি শনিবার না আসাতে ভয়ানক রাগ করেছিলুম। খুকুদের বাড়ী থেকে যখন ফিরি, তখন বিকেল

হয়েচে। সাজিতলার পূবে যেখানে ভাঙন ধরেচে নদীর পাড়ে, সেখানে একটা হেলে-পড়া খেজুর গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বসে নদীর দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলুম। বড় আনন্দ ছিল মনে, আরও বসতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এদিকে আবার সন্ধ্যা হয়ে আসচে দেখে উঠতে হোল। চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে আসা আমার বড় ভাল লাগে—শীতের সন্ধ্যায় ফুটন্ত ছোট এড়াঞ্চির ফুলের বন, শুক্‌নো গাছপালার গায়ে রাঙা রোদ, গরীব লোকের কুঁড়ে ঘর, ও ধারেই নদী, নদীর ধারে মাঠ—দেখতে দেখতে আমি আর উমা যে সাঁকোর ধারে বনের মধ্যে খেলা করতুম, সেখানে এসে উঠলুম।

পরদিন যখন কলকাতায় আসি, ট্রেনে সারাপথ কেবল মড্ কস্টেলোর একটা গানের লাইন মনে আসতে লাগলো বারবার—আর কি সে আনন্দ মনে! জীবনটাকে এই একমাসের মধ্যে একটা নতুন চোখে যেন দেখেচি। জীবনের কেন নতুন অর্থ হয়। একটি নতুন উপন্যাস শুরু করবো ভাবচি এই সম্পূর্ণ নতুন ধারায়।

তারপর আজ পাটনা এলুম বহুকাল পরে। ১৯২৭ সালের পরে আজ ৯।১০ বছর পাটনা আসিনি। আমি, নীরদ, ব্রজেন দা, সজনী সবাই একসঙ্গে এলুম, কাল রাত্রে একাদশীর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বর্দ্ধমানের বড় বড় মাঠের দিকে চেয়ে আমার মনে আসছিল একটি প্রবহমান জীবনধারার কথা, যা চির পুরাতন অথচ প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায়—সৃষ্টির মধ্যে, রসের মধ্যে যার সার্থকতা। কত সুপ্ত গ্রাম তো এই জ্যোৎস্নায় স্নাত হচ্চে, কিন্তু বহুদূরে এক ক্ষুদ্র পল্লীনদীর তীরবর্ত্তী এমন একটি গ্রামের ছবি বার বার মনে আসে কেন?

এ কথা আরও মনে এল যখন দুপুরে একাই পাটনাতে ওদের বাড়ীর

সামনের পার্কটাতে বসেছিলুম। ছোট্ট পার্কটা, বড় বড় ডালিয়া ফুটে আছে, আর ক্যালেণ্ডুলার সেও আধশুকনো। নীল আকাশের নীচে বসে দুপুরের রোদটি এই ভয়ানক শীতের দিনে কি মিষ্টিই লাগছিল। পাটনায় শীতও প্রচণ্ড।

আজ ন' বছর আগে পাটনা থেকে শেষ যখন চলে গিয়েছিলুম, আমার সে জীবনে এ জীবনে অনেকখানি তফাৎ হয়ে গিয়েচে। তখন ছিল অন্য ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি, এখন হয়েচে অন্য ধরণের। এখন যারা এসেচে জীবনে—তখন ওরা ছিল না। ওদের সত্যিই বড় ভাল লাগে। তাই আজ দুপুরে বসে কেবলই কাল রাতের মত ছোট্ট একটি পল্লীনদী একটি বকুলগাছের ছায়াস্নিগ্ধ গ্রাম---এর কথাই মনে পড়ে। সুপ্রভার কথা সব সময়েই মনে হচ্চে, আহা, কোথায় কতদূরে রয়েচে পড়ে, ওর বাবার আবার করেছে অসুখ---ছেলেমানুষ, তাই নিয়ে ওর মন খুব খারাপ হবারই কথা।

সমস্তদিন যদি এ পার্কটীতে বসে এমনি আপন মনে ভাবতে পারতুম, খুবই ভাল হোত। কিন্তু তা হবার নয়, আমরা পাটনা সহরে এসেচি শুনে তাবৎ প্রবাসী বাঙ্গালীরা ভাবচেন আমরা তাঁদের অতিথি, কারণ মাতৃভূমি থেকে এসেচি, একটা প্রীতির চোখে সবাই দেখবেন, ওটা বেশী কথা নয়। বৈকালে একটা চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল এখানকার পাবলিক প্রসিকিউটর মিহিরলাল রায়ের বাড়ী। সেখানে গিয়ে দেখা বৈকুণ্ঠবাবু এ্যাডভোকেটের সঙ্গে—ভাগলপুর থেকে তখন-কখন আপীলের মোকদ্দমা করতে এসে ওঁর বাসায় উঠতাম। অনেকগুলি ভদ্রলোক এসেছিলেন—সবাই যখন চায়ের টেবিলে প্রবাসী বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা বিহারীদের সহানুভূতির অভাব, এমন কি বাঙ্গালীদের প্রতি স্পষ্ট বিদ্বেষ

প্রভৃতি বর্ণনা করছিলেন আমি তখন আবার অন্যমনস্ক হয়ে জানালার বাইরে অস্তসূর্য্যের রঙে রঙীন আকাশ ও রাঙা-রোদ-মাখানো গাছপালার দিকে চেয়ে ভাবচি কত গ্রামের গাছপালার ছায়ায় এই সন্ধ্যায় কিশোরী মেয়েরা গা ধুয়ে চুল বেঁধে নিজেদের ছেলেমানুষী মনে কত কি ভাবচে, কত ভাঙা-গড়া করচে মনে মনে তার ভবিষ্যত নিয়ে, কত স্বপ্ন দেখচে— তারপর এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পাড়াগাঁয়ে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে সারাজীবন কাটালে।

সন্ধ্যার সময়ে বি, এন্ কলেজের হলে প্রকাণ্ড সভা। নীরদের অভিভাষণ বড় চিন্তাপূর্ণ হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা যখন বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েচি, তখন ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, আজ পাটনাতে তেমন শীত নেই, আমার কেবলই বাংলাদেশের কথা মনে হয়।

এতক্ষণ সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েচে ?

ওরা সবাই ?···

সুপ্রভাও ?···

সুশীল মাধব মল্লিক এখানকার বড় এ্যাডভোকেট। আমি তাঁকে এর আগে হাইকোর্টে কয়েকবার দেখেচি। তাঁরই বাড়ীতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। তাঁদেরই গাড়ীতে সবাই গিয়ে পৌঁছলুম। সেদিন বনগাঁয় যেমন এক সভা বসেছিল মন্মথ রায়ের বাড়ীতে—এদিন এখানেও সুশীল-মাধব বাবুর বৈঠকখানায় রঙীন দা, কলেজের জনৈক biologyর অধ্যাপক, নিরদ, সজনী, আমি, সবাই মিলে আরম্ভ করলুম। আনাতোল ফ্রাঁস সম্বন্ধেই তর্কটা গুরুতর। খাওয়ার সময় সুশীলবাবু নিজে বসে এত তদ্বির করতে লাগলেন—বিশেষতঃ বৃদ্ধ বোধহয় সন্ধ্যার পরে দু এক পেগ টেনে একটু খোসমেজাজে থাকেন—যে আমরা না পারি পাতের

তলায় সন্দেশ লুকিয়ে ফেলে ফাঁকি দিতে, না পারি মাছ মাংসের বাটীতে একটুকরো ফেলে রাখতে। পাটনায় এসে কেবলই খাচ্ছি, খেয়েই প্রাণ গেল।

রাত অনেক হয়েচে। জ্যোৎস্না আজও ফুটেচে। মণিদের বাড়ী এসে সকলে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে উঠে এখানকার সেশন্‌স্ জজ শিবপ্রিয় বাঁড়ুয্যের বাড়ী আমি, নীরদ আর ব্রজেন দা গেলুম বিলিতি মিউজিক্ শুনতে। নীরদ ও জিনিষটা বোঝে। আমি ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সাহেবী ধরণের বাড়ী, সবুজ ঘাসে মোড়া লন্, বড় বড় গাছ, ধূ ধূ করচে সামনে গঙ্গার চর, দূরে ঘাটে ষ্টিমার পারাপার হচ্চে। নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কি অদ্ভুত আনন্দ পেলুম পূর্ব্ব দিগন্তের দিকে চেয়ে। Schwbert-এর মোজার্টের সুর কতই বাজচে ওদিকে। গানের সঙ্গে নিজের মনের অনুভূতি জড়িয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দের রসায়ন সৃষ্টি হোল। বহুদিন আগে ইসমাইলপুরে থাকতে এমন ধরণের আনন্দ মাঝে মাঝে পেতুম, তারপর আর বহুদিন পাইনি।

ওখান থেকে আমরা গোলঘর ও নিতাইবাবুর বাড়ীর রাস্তা দিয়ে বাড়ী এলুম। আমাদের গরম জল দিয়ে গেল ওদের বাড়ীর একটি মেয়ে। দুপুরে কমলবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গেলুম। অনেক ভাল ভাল গোলাপ দেখা গেল তাঁর বাগানে। সতীদেবীর মীরাবাঈয়ের ভজন গানখানা খুব ভাল লাগলো।

বরিখে বাদরিয়া শাওন কি

শাওন কি মন ভাবন কি—

বাড়ী আবার এলুম এঞ্জিনিয়ারটীর মোটরে। আসবার পথে এরিষ্টলোকিয়া

লতা দেখাবার জন্যে ট্রেনিং কলেজে নিয়ে গেলেন। অদ্ভুত লতার ফুলটা!

বৈকালে বি, এন কলেজের হোষ্টেলের লনে চা পার্টি। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ফটো নেওয়া হলো। এখানে প্রীতি সেন বলে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হোল—তাকে বেশ ভাল লাগলো। সন্ধ্যায় মিটিং বি, এন কলেজের হলে। আমি একটা বক্তৃতা করলুম, 'রচনার ওপরে ভূমিশ্রীর প্রভাব'—'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পটি পড়লুম। বহু জন সমাগম—সভার পরে এক গাদা অটোগ্রাফ খাতা সই করতে প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠলো। একদল আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাইরে এল। আমার বইয়ের ছোট গল্পের সম্বন্ধে ওদের কি ভয়ানক উৎসাহ! আমার যে এত ভক্ত আছে তা জানতুম না!

আমি এখনই বক্তিয়ারপুর যাবো। 'রতীন দা' আমায় তুলে দেবেন বলে মোটরে উঠলেন, আর মণি। এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির মোটর। মণিদের বাড়ী এসে জিনিষপত্র নিয়ে বেরুতে যাবো—মোটর স্টার্ট নিলে না। ভদ্রলোক কত চেষ্টা করলেন—হাঁপাতে লাগলেন—আহা! তাঁর কষ্ট দেখে—আমার কি কষ্ট! সত্যিই ভেবে এখনও আমার চোখে জল আসচে। মহা অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। মাত্র আর ২০ মিনিট দেরি আছে গাড়ীর! একজন লোক ছুটলো একখানা ট্যাক্সি নিয়ে এলো। তাতেই এলুম স্টেশনে। এসে দেখি পাঞ্জাব মেল ৫৫ মিনিট লেট। ওরা কেউ আমায় ফেলে যেতে চাইলে না। আমি একবার এসে সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রে বাঁকীপুর স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। এক একবার মনে হচ্চিল যেন আমি এখনও ইসমাইলপুরেই আছি। এখান থেকে আজ বা কাল গিয়ে ইসমাইলপুরের সেই প্রান্তরে গিয়ে হাজির হবো। কিন্তু

কি পরিবর্ত্তনই হয়েচে জীবনে এই ক' বছরে। তখনকার আমি আর বর্ত্তমান আমিতে অনেক তফাৎ। জীবনে তখন সুখ ছিল, সে অন্যরকম। আর এখন, এ অন্যরকম। তখন জীবন ছিল নির্জ্জন, এখন খুকু এসেছে, সুপ্রভা এসেচে। সুপ্রভার কথা অত্যন্ত মনে হচ্ছিল, আমি সেদিন যে পত্র দিয়েচি, তা শিলচরে আজ ঠিক পেয়েচে।

এমন সময় পাঞ্জাব মেল এলো। একটি মেয়ে লক্ষ্ণৌ এক্‌জিবিশন দেখে ফিরচে, তার সঙ্গে রঙীন বাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। বল্লেন—'এই যে বিভূতি বাবু, ইনি বলচেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন বিভূতি বাবুর। আমি খুঁজছিলুম, কোথায় গিয়েছিলেন?' মেয়েটা বেশ ভাল, অমায়িক স্বভাব, সুন্দরীও বটে। জিগ্যেস্ করলুম লক্ষ্ণৌ এক্‌জিবিশন কেমন দেখলেন? তিনি বল্লেন—বেশ ভালই, আপনি দেখেন নি? বল্লুম কই আর দেখলুম।

মনে হোল আমাদের পাড়ার খুড়ীমা, ন'দি প্রভৃতি মেয়েদের কথা। ওরা পরকে ভাবে শেয়াল-কুকুর, কিন্তু নিজেরা যে কিসের মত জীবন যাপন করে তা' কি ভেবে দেখেচে? মাঝে পড়ে খুকুটা ওদের মধ্যে পড়ে মারা গেল, একঘেয়েমি ও সংকীর্ণ জীবনের তিক্ততায়।

কি ভয়ানক শীত লাগলো ট্রেণে, বক্তিয়ারপুর আসতে আসতে। অমন শীত অনেক দিন দেখিনি। রাত বারটায় এক্সপ্রেস্ বক্তিয়ারপুর পৌঁছুলো। একটা কুলি নিয়ে কালীদের বাড়ী গেলুম। অনেক রাত পর্য্যন্ত ইরাদিদি ও কালীর গল্প করলুম।

পাটনা থেকে এসেই জানলুম সুপ্রভা এসেচে কলকাতায়। সেই রাত্রেই তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলুম। গত শনিবার বোটানিক্যাল

গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলুম ওর সঙ্গে। সেদিন কয়েকটি গান করলে—আমি জানতাম না ও এত সুন্দর গান গায়। কি মিষ্টি লাগলো ওর গান ক'টী সেদিন! বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরেই গেলাম বনগাঁয় ৬-৫০-এর ট্রেণে। স্টেশনে সুবোধ ও যতীন দা'র সঙ্গে দেখা। রাত ন'টাতে বনগাঁয় পৌঁছেই দেখি জগদীশ দা'র মেয়ে হাসির বিয়ে—সেদিনই। প্রফুল্ল, হরিবাবু প্রভৃতি বরযাত্রীদের খাওয়ানোর কাজে মহাব্যস্ত। আমায় বল্লেন—এত রাত্রে কোথা থেকে! খেতে বসে যাও। যোগেন বাবুদের বাড়ী খাবার জায়গা হয়েছিল। খেয়ে যখন বাইরে এলুম, তখন চাঁদ উঠেচে, অল্প অল্প জ্যোৎস্না, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ।

পরদিন দুপুরের পরে বারাকপুরে গেলুম। যাবার সময় আজকাল চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে বড় চমৎকার লাগে। খুকুদের রান্নাঘরে ওরা খেতে বসেচে। বল্লুম—খুড়ীমা অতিথি আছে, ওরা অবাক হয়ে গেল। তারপর খুব খানিকটা গল্পগুজব করে বিকেলে ফিরি। ফেরবার পথে গাজিতলা ছাড়িয়ে সেই খেজুর গাছের হেলানো গুঁড়িটায় বসে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নদীর দিকে, ওপারের মুক্ত তৃণাস্তৃত চরভূমির দিকে চেয়ে রইলুম। সন্ধ্যায় বনগাঁ ফিরে চারুবাবুর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, চা খাওয়া সেরে সাড়ে আটটার ট্রেণে কলকাতা রওনা হই।

আজ বিকেলে গোলদীঘিতে কতক্ষণ বসে ছিলুম বিকেলে। গৌরীর কথা মনে হোল অনেকদিন পরে। এই সময়েই সে মারা গিয়েছিল। সেই শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন, সুন্দর ঠাকুরের দোকানে ধারে লুচি খাওয়া—সেইসব শোকাচ্ছন্ন গভীর দুঃখ ও দুর্দ্দশার দিনগুলো এতকাল পরে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

এরাও তো চলে যাবে। সুপ্রভা পরশু বলচে গঙ্গার ধারে বসে বোটানিক্যাল গার্ডেনে—আপনি শীগগির কিন্তু একবার শিলং যাবেন। আমি বেশীদিন বাঁচবো না, সত্যি আমার আয়ু কম, জ্যোতিষী বলেচে। কবে মরে যাবো, আপনি টেরও পাবেন না।

খুকুও তো বিয়ে হোলে চলে যাবে বারাকপুর ছেড়ে। তখন আবার যে নির্জ্জন, সে নির্জ্জন।

আজ বিকেলে রেডিও আপিস্ থেকে ফিরবার পথে লালদীঘিতে একটু বসেছিলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে। যশোর জেলার দূর এক গ্রামে—তাতে সেই মেয়েটী এখন তাদের বাড়ীর সামনের বকুলতলাটিতে আপনমনে হয়তো বসে আছে। সুপ্রভা হয়তো পুরীতে সমুদ্রের ধারে বসে কি ভাবচে। কি জানি কেন বসলেই ওদের দুজনের কথা মনে হয়। তাই মনে হোল এই সময় একবার জাঙ্গিপাড়া যাবো। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে সেই একঘেয়ে দুর্দ্দিনে জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। গৌরী তখন মারা গিয়েছে, আমার প্রথম যৌবনের সঙ্গিনী। তার কথাই তখন আমার সমস্ত মনপ্রাণ ভরে রেখেচে সেই সময় গিয়েছিলুম জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকুরী করতে, ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। সে কত সালের কথা হয়ে গেল! তারপর ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগলপুরে চাকরী নিয়ে যাবার আগে একবার জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। সেও হয়ে গেল ১২।১৩ বছর আগেকার কথা। আর কখনো যাই নি। অথচ এই ১২।১৩ বছরে জীবনে সবদিক দিয়ে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই হয়েচে! এখন জীবনে কত লোক এসেচে, যাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমার কাছে তখন ছিল অজ্ঞাত। আসলে দেখলুম অর্থ,

সম্পদ কিছু নয়। মানুষই মানুষের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে। জীবনে যদি প্রেম এসে থাকে, তবে তুমি পার্থিব বিত্তে দীন হলেও মহাধনী— ফোর্ড বা রক্‌ফেলার তোমাকে হিংসা করতে পারেন। আর যদি প্রেম না আসে, যদি কারো স্মিত-হাস্যে-ভরা চোখ দুটী তোমার অবসর মুহূর্ত্তে মনের সামনে ভেসে না ওঠে, যদি মনে না হয় দূরে কোনো পল্লীনদীর তটের ক্ষুদ্র গ্রামে, কি কোনো শৈলশিখরের পাইন বার্চ্চ গাছের বনের ছায়ায় কোনো স্নেহময়ী নারী নিশ্চিন্ত নিরালা অবসরে তোমার কথা ভাবে তবে ফোর্ড বা রক্‌ফেলার হয়েও তুমি হতভাগ্য।

হয়তো একথা Platitude ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু যে Platitude জীবনে অনুভব করে, তখন সে আর Platitude থাকে না, তার জীবনের অভিজ্ঞতায় তা হয়ে দাঁড়ায় পরম সত্য।

জাঙ্গিপাড়া স্কুলে প্রথম চাকুরীতে ঢুকি ১৯১৯ সালে। হঠাৎ জাঙ্গিপাড়া যাওয়া ঘটল এতকাল পরে। ১৯২৪ সালে একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম আর কখনো যাইনি। স্কুলের দিকে গিয়ে বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। চিনতেও পারলেন। চন্দনপুরের গাঁয়ের পাড়ে সেই তাল-তলায় তখন কত বসে থাকতুম—পুরোণো জায়গাটা দেখতে গেলুম। শ্রীরামপুরের দিদির সঙ্গে—এই সব জায়গার স্মৃতি বড় বেশী জড়ানো—ওখানে গিয়েই সে কথা মনে পড়লো।

তারাকেশ্বরের পথেও খানিকটা গেলাম। সে পথটা তেমন ফাঁকা নেই, বড় বড় গাছ হয়ে পড়েচে। বাজারে আমার কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হোল—যেমন, গজেন, ফকির মোদক প্রভৃতি! গজেন ঐই স্কুলেই এখন মাষ্টারী করচে।

উৎকর্ণ

বিষ্ণুপুর গেলুম বৃন্দাবনবাবুদের বাড়ী। ওদের সেই পুরোণো রান্না-ঘরটা ঠিক আছে, তার দাওয়ায় বসে খেলাম অনেক পরে। রাত্রে অনেক গল্প হোল পুকুরের ঘাটে বসে। বিজয়বাবুকে বল্লাম রাজকুমার ভড় জীবনে বড় বন্ধু ছিল, তার জন্যেই এখান থেকে যাওয়া, সে না থাকলে হয়তো এতদিন পরে এখনও জাঙ্গিপাড়ার সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে বসে থাকতাম।

পরদিন সকালে উঠে ওদের পুকুর পাড়ে সেই উঁচু জায়গাটি দেখে এলাম—একটা বড় তেঁতুল গাছ আছে সেখানে। বহুদিন আগে চট্টগ্রাম জেটিতে বসে এই জায়গাটার কথা ভাবতাম। হঠাৎ যে আজ এখানে আসবো—জাঙ্গিপাড়ায়—এত জায়গা থাকতে, তা কি কেউ কখনো ভেবেছিল? থানার পাশ দিয়ে পথটায় হেঁটে যাবার পুরোনো দিনের সব কথা, সব মনের ভাব মনে আসছিল। যে ছোট্ট ঘরটাতে ডাকঘর ছিল, চিঠিপত্রের আশায় বসে থাকতাম—সে ঘরটা এখনও সেই রকমই আছে। আমার ছোট্ট ঘরটাতেও গিয়ে দেখলাম তবে ঘরটা বন্ধ। পদ্মপুকুরের ঘাটের দিকে বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে রইলুম।

দুপুরে আমার ছাত্র গজেনের বাড়ীতে গেলুম। ওর ভাগ্নী পরিবেশন করলে—তার আবার স্বামী এসেচে, কোরী ঘোমটা দিয়ে লজ্জাতেই জড়সড়। ওদের মাটীর ঘরটা কেমন চমৎকার সাজানো—মাটীর মাছ, খেলনা, পুতুল, পুঁতির মালা ইত্যাদি কুলুঙ্গিতে বসানো। দুটী তরুণী লাজুক মেয়ে আনাগোনা করচে ঘরে ও বাইরে—খাঁটী পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থালী।

একজায়গায় অনেক গাঁদাফুল ফুটে আছে। একজনের বাগান এটা। সে তার মনের সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রকাশ করেচে ফুলের গাছ পুঁতে। এও

এক ধরণের কাব্য রচনা। মনের সৌন্দর্য্য যাতেই যে ভাবেই প্রকাশ করা যায় তাই তো শিল্প—সেই হিসেবে উদ্যান রচনা একটা বড় শিল্প।

ভগবান বোধহয় নিজেকে প্রকাশ করেছেন বিশ্ব-রচনার মধ্যে দিয়ে। Analogyটা হয়তো ঠিক হোল না, কিন্তু ভাবতে বেশ লাগে।

আর একটা কথা ভাবছিলুম, যাকে ভালবাসা যায় বেশী, তাকে দুঃখ দিলে ভালবাসা বর্দ্ধিত হয়, আদর দিলে তত হয় না। এ পরীক্ষিত সত্য। এতে যে সন্দেহ করে, সে ভালবাসার ব্যাপার কিছু জানে না। যাকে ভালবাসো, তাকে খুব আদর দিও না, ভালবাসা কমে যাবে। মাঝে মাঝে তার প্রতি নিঠুর হয়ো, ভালবাসার সঙ্গে করুণা ও অনুকম্পা মিশে ভালবাসার ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।

ভগবান যাকে বেশী ভালবাসেন, তাকেই কি বেশী কষ্ট দেন—তবে কি এই বুঝতে হবে?

— —

আজ বিকেলে বিশ্রী ঝড়বৃষ্টি একঘেয়ে বাদলা। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে মিউজিয়মে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছি। একদল ঢুকেচে একদল ঢুকতে পারেনি, তাই নিয়ে ওখানকারসেক্রেটারীর সঙ্গে ভীষণ গোলমাল—ছেলেরা হাতাহাতি করতে যায়। আমি তাদের থামিয়ে দিই। সাহেব আমার নাম লিখে নিলে—অর্থাৎ আমার নামে কি যেন রিপোর্ট করবে। করগে যা রিপোর্ট, তোর রিপোর্টকে আমি ভয় করিনে। ওয়াছেল মোল্লার দোকানে জামা-কাপড় কিনতে গিয়ে আটকে গেলুম বৃষ্টিতে। তারপর পরেশ খুড়োর সঙ্গে দেখা করে ফিরি।

ক'দিনই বড্ড ছুটোছুটি হচ্চে, কাল পুরী যাবো। ঝড়বৃষ্টি পড়ে

গেছে, তা কি করবো, উপায় নেই। এখন না গেলে ছুটি কৈ আর? কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে বিকেলবেলা। নগেন বাগচীদের পুকুর ঘাটে সন্ধ্যায় সকলে দাঁড়িয়ে কতকটা মনে হোল। অনেকদিন আগে এদের এই বাড়ীতেই ছিলাম। এই পুকুরঘাটে মা নাইতেন। সেই রকমই সব আছে বাড়ীটার। কিন্তু এই ১৩।১৪ বছরে আমার জীবনে কি পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে তাই ভাবি। সম্পূর্ণ একটা ওলট-পালট হয়ে গিয়েচে, মনের দিক দিয়ে সবের দিক দিয়ে। তখনকার আমি আর এই আমি কি এক? মোটেই না—সম্পূর্ণ পৃথক দুই মানুষ।

• •

পুরী যাওয়া হয়নি। ঝড়বৃষ্টি দেখে যাওয়া বন্ধ করিনি। টিকিট কিনে এনেছিলুম, সুপ্রভার পত্র পেলুম, সে ওয়ালটিয়ার গিয়েচে, তাতেই যাওয়া বন্ধ করলুম। দেশে চলে গেলুম সাড়ে ছ'টার গাড়ীতে। বেজায় ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যা নেমে যদি গাড়ী না পাওয়া যেতো, বড় কষ্ট পেতাম। তার পরের দিন সকালে বীরেশ্বর বাবুর সঙ্গে গল্প করি। দুপুরে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুম সরস্বতী পূজো করবো বলে আমার ঘরে। খুকুরা ওখানেই আছে। খুকু একটু পরেই বার হয়ে এল। অনেক গল্পগুজব করলে। এবার চড়কতলার ছেলেরা বারোয়ারীতে সরস্বতী পূজো করচে। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ী চুরি হয়ে গিয়েচে বলে রাত্রে আজকাল সেখানেই শুই। আমার ঘরে তার পরদিন সরস্বতী পূজো করলুম। বাল্যকালে দেশে সরস্বতী পূজো করেচি, আর কখনো থাকিও নি দেশে। এতকাল পরে এই। খুকুরা এসে অঞ্জলি দিলে—পাঁচী ও খুকুকে বল্লুম, তোরা প্রসাদ ভাল করে দে সবাইকে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে একাই গেলুম বেড়াতে। গাছে গাছে কুল

খেয়ে বেড়াই ছেলেবেলার মত। চারাগাছে কুল ফলেচে, কিন্তু ছেলেবেলার মত কুলগুলো তেমন মিষ্টি না। শিমুল গাছে প্রথম ফুল ফুটে রাঙা হয়ে আছে। সন্ধ্যায় রাঙা আকাশের তলায় চারিধারে গাছের মাথাগুলো নানা বিচিত্রভঙ্গি ও ছত্রবিন্যাসের সৌন্দর্য্য ভারী চমৎকার দেখাচ্চে। হঠাৎ পাটনায় মিহির বাবুর বাড়ীর চা-পার্টির কথা মনে হোল, সেই যে আমি পর্দ্দার ফাঁকের দিকে রাঙা রোদ লাগানো গাছের দিকে চেয়ে দেশের কথা ভাবছিলুম সেদিন। সে তো এই কুঠীর মাঠের কথাই। খুকুর কথাও। তারপরে বাড়ী ফিরে আসতেই খুকু ছুটে এল—সে ভাল কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল চড়কতলায়। খুড়ীমা বাড়ী নেই—কলে গা ধুতে গিয়েচেন—হঠাৎ টিউবওয়েলে।

রাত্রে ইন্দুর বাড়ী বসে ওর মুখে নানারকম গল্প শুনি। ও যশোর জেলায় এক পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারী করতে গিয়েছিল। গ্রামের নাম কোলা বেলপুকুর। সেখানে কেমনভাবে তাকে একটা গৃহস্থ বাড়ীতে আদর-অভ্যর্থনা করেছিল, আর এক গ্রামে এক গৃহস্থবাড়ী কেমন অনাদর করেছিল এ সব গল্প করে গেল। ওর গল্পে অনেক অজানা পাড়াগেঁয়ের ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। এমন গল্প বলার ক্ষমতা সকলের থাকে না।

পরদিন কালো এল—ওদের বাড়ীতে দুপুরে নিমন্ত্রণ। খুকু বসে মাছ কুটচে রান্নাঘরের সামনে উঠোনে, বেলা দশটা, আমি রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ওর দাদা আর মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করলুম। নদীতে কালো আর আমি সাঁতার দিয়ে আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে চলে গেলুম রায়পাড়ার ঘাটে। বৈকালে খুকু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে প্রায় সন্ধ্যার কিছু আগে পর্য্যন্ত। তারপর আমি একটু কুঠীর মাঠে পথে

বেড়িয়ে এসে স্টেশনে রওনা হলুম জিনিষপত্র নিয়ে। আসবার পথে বুড়ীকে দেখতে গেলাম। বুড়ীর হাত ভেঙে গিয়েচে, ময়লা কাঁথা পেতে শুয়ে আছে। আমায় দেখে কি খুসিই হোল! বুড়ী সত্যিই আমায় খুব ভালবাসে। একসময় ওর অবস্থা ভাল ছিল, ওর স্বামী ছিল জমীর দেওয়ালি। মুসলমানপাড়ার মধ্যে জমীরের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। ছেলেবেলায় জমীর দেওয়ালিকে আমি দেখেচি। বুড়ী তারই বৌ। এখন আর কেউ নেই ওর, অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েচে। ভিক্ষে করে চালাতে হয় প্রায় এমন অবস্থা। বুড়ীকে কিছু দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বার হলুম, কারণ ট্রেনের বেশী দেরী নেই। অশথ তলায় তখনও জ্যোৎস্না ফোটেনি, শেষ বিকেলের ছায়া। হরিবোলার দোকানে এসে ইন্দু ও ফণিকাকাকে পাওয়া গেল। ওরা বসে গল্প করচে। আমার মনে কি অদ্ভুত আনন্দ! সত্যি এমন সব আনন্দের দিন জীবনে ক'বার আসে? এই জ্যোৎস্না, এই শুক্রতারা, আধখানা চাঁদ, সেক্‌রাদের বাড়ীর কাছে নেবুফুলের গন্ধ পাওয়া গেল—এরই মধ্যে কত কি ভাবনা! এ আনন্দ অনেকদিন ভোগ করলুম বটে। আজ চার বছর এই প্রথম বসন্তের দিনে এখানে ফুল-ফোটা দেখি। আজ চার বছর নানা সন্ধ্যায় নানা ছুটীর দিনে নানা বিকেলে খুকু আমায় আনন্দ দিয়েচে—কত ভাবে, কত কথায়। ওই কথা ভাবতে ভাবতে জ্যোৎস্নার মধ্যে ষ্টেশনে এলুম। গোপালনগর স্কুলে ছাত্রেরা থিয়েটার করচে আজ। আমাদের গাঁ থেকে মেয়েরা দেখতে আসবে। ট্রেণে যখন বনগাঁ আসচি, তখনও আমার অদ্ভুত আনন্দ। গাছের সারির ওপর দিয়ে পারঘাটার জলের ওপারে আমাদের গাঁয়ের দিকে চেয়ে ভাবচি, সবাই এখন কি করচে? খুকু এখন কি করচে? হয়তো

রান্নাঘরে বসে আছে এতক্ষণ, কারণ আজ কাকার তিথি উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন হয়েছিল বাড়ীতে ওবেলা, এবেলা বাসি পায়েস, ভাত-তরকারী নিশ্চয়ই আছে, তাই সে বসে আছে। ইন্দু এতক্ষণ বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর পেতে একা বসে আছে। ওরা বেশ আছে।

ভাবতে ভাবতে বনগাঁয় ট্রেণ এসে দাঁড়ালো। প্ল্যাটফর্ম্মে আমার কাকার ছেলে লালমোহন লুচি-সন্দেশ বিক্রী করচে। ও এখানে আছে অনেকদিন, লেখাপড়া শেখেনি, গরীবের ছেলে, ওই কাজই করে।

একটু পরে কলকাতার ট্রেণ এল—আমি সারাপথ কেবল ভাবছিলুম এই ক'দিনের কথা, আজ সারাদিনের কথা। খুকু কতবার এল, সেকথা কেবলই শুক্রতারার দিকে চেয়ে ভাবি, ওখানেও কি এমন বনশ্যাম পল্লী আছে, তার ধারে ছোট্ট গ্রাম্য নদী বয়ে যাচ্ছে, কত মাধবী রাত্রে, কত বর্ষণমুখর আষাঢ় প্রভাতে, কত বসন্তের দিনে গাছে গাছে প্রথম মুকুল আবির্ভূত হবার সময়ে, ওদের দেশেও চোখে চোখে লোকে কত কথা বলে, কত স্নিগ্ধ মধুর ভাব ও বাণীর বিনিময়। শুকতারা নাকি শুধুই বরফের দেশ, সাত হাজার ফুট উঁচু হয়ে গ্লেসিয়ার বরফের স্তর জমে আছে গ্রহের ওপরে।

ভাবতে ভাবতে ট্রেণ এসে দাঁড়ালো দমদমা গোরাবাজারে। অপূর্ব্ব সরস্বতীপূজার ছুটী শেষ হোল। অনেকদিন মনে থাকবে এ দিনগুলোর কথা।

সেদিন চন্দননগরে গিয়েছিলুম সাহিত্য-সম্মেলনে। এখান থেকে মোটরে সজনীদের সঙ্গে গেলুম। উত্তরপাড়া, বালি, কোন্নগর প্রভৃতি

সহরের মধ্যে দিয়ে—গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে পথ। অনেকদিন এপথে যাওয়া হয়নি, সেই অনেকদিন আগে একবার শ্রীরামপুরে গিয়েছিলুম মোটরবাসে এপথে। সভামণ্ডপে অনেকের সঙ্গে দেখা হোল, নীহার রায় বিলাত থেকে ফিরেচে, সুনীতি বাবু বল্লেন, সেদিন কনভোকেশনের দিন আপনি কোথায় গেলেন? আপনাকে খুঁজলুম, আর দেখা পেলাম না। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটটার কাছে কনভোকেশনের দিন সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর আমি তাঁকে হারিয়ে ফেললুম। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসভার উদ্বোধন কোরেই চলে গেলেন। আমি গেলুম আহার করতে। তারপর রবীন্দ্রনাথের বোটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেখি অমল হোম, নীহার রায় সেখানে বসে। বানান সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হোল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতি বাবুর। স্যার যদুনাথ সরকার এলেন বিকেলের দিকে। রবীন্দ্রনাথের বোটটা বড় চমৎকার। মেঘ করেচে আকাশে। ওপারের মেঘে-ভরা আকাশটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। অনেকদূরের একটা গ্রাম এই সান্ধ্য আকাশের তলায় কেমন দেখাচ্ছে? ওখান থেকে আমরা মতিলাল রায়ের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে গেলুম। ফাদার দোঁতেন আমাদের সঙ্গে মিশন এসে সজনীদের গাড়ীতে। ফাদার দোঁতেন জনৈক পাদ্রী, কেবল বাংলা জানে। সন্ধ্যার পরে আমরা আবার বালি, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়ার মধ্যে দিয়ে কলিকাতায় ফিরি।

আজ মাঘীপূর্ণিমা। টালিগঞ্জের খাল পার হয়ে সেই যে সুশীলেশ্বরী আশ্রমে আর বছর গিয়েছিলুম, এবারও সেখানে গেলুম। গাছে গাছে আমের বউল হয়েচে, ঘেঁটুফুল ফুটেচে জামতলায়, বাতাবীলেবু ফুলের গন্ধ পথে, কোকিল ডাকচে। আর বছরের সেই ইন্দুদিদি আছেন, তিনি ঘরের মধ্যে বসিয়ে বাড়ীর ছেলের মত যত্ন করে খিচুড়ী প্রসাদ খাওয়ালেন।

বহু মেয়ের ভিড়। কলিকাতার উপকণ্ঠে এই নিভৃত পাড়াগাঁয়ে, দেবালয়টি আমার বেশ লাগলো।

বসন্তের প্রথম দিনগুলিতে আকাশ, খররৌদ্র, নতুন ফোটা ফুলের দল মনে কি একটা অপূর্ব্ব আনন্দ দেবার আশা দেয়, বিশেষ করে এই নীল আকাশ! সেদিন দুপুরে খয়রামারির মাঠে একা বসে বসে বসন্ত-দুপুরের নীল আকাশে আর খররৌদ্র ভোগ করছিলুম। মাঠের মধ্যে ফুল-ফোটা শিমুলগাছগুলো সমস্ত পটভূমিকে এমন একটা শ্রী দান করে, তা আর কোনো গাছ পারে না. খানিকটা পারে শীতকালের ছোট এড়াঞ্চির ফুল। আমার মনে হয় ওরা গ্রাম্য প্রকৃতির ঘরোয়া ভাবটা কাটিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর বৃহত্তর ভূমিশ্রীর প্রকৃতির সাথে ওকে এক করিয়ে দেয়—মনে এনে দেয় আফ্রিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের কথা, দক্ষিণ আমেরিকার আধ-মরু আধ-জঙ্গলে ভরা জায়গার কথা—নানা বিরাট, জনহীন, বহুবিস্তীর্ণ—প্রাকৃতিক রাজ্যের ছবি। ওতেই এত ভাল লাগে দিগন্ত রেখার রাঙা রাঙা ফুলফোটা শিমুল গাছ, অথবা অর্দ্ধ-শুষ্ক খড়ের মাঠে ছোট-খাটো ঝোপের মধ্যে থেকে একা উঠেচে একটা বড় শিমুল গাছ—তাকে দেখেরটা ভারী অদ্ভুত। মাঠে যদি অমন দেখি, তবে সেখানে বসে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। মানুষের মন বড় অদ্ভুত জিনিস। লোকে মুখে যে কথাই বলুক, বা চিঠিতে যে কথাই যাকে লিখুক, তার মন সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। মুখের কথায় আর মনের কথায় এই জন্যেই মিল প্রায় হয় না।

হরিনাভি স্কুলের ছেলেরা ওদের re-union-এ এসেছিল বলতে,

উৎকর্ণ

ওদিকে ফণিবাবুর বাড়ীও নিমন্ত্রণ ছিল, দুই কারণে এদিন রাজপুর স্টেশনে নেমে হরিনাভি গেলাম। বসন্তে গ্রাম্য-শোভা দেখাই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য। তাই খররৌদ্র-দুপুরে বেগুনদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পাড়ার মধ্যে দিয়ে যে পথটা গিয়ে হরিনাভি স্কুলের কাছে মিশলো, ওই পথটা দিয়ে গেলুম নেমে। খুব আম্র মুকুলের সৌরভ, লেবু ফুলের গন্ধ, ঘেঁটুবনের শোভা, কোকিলের ডাক, মাথার ওপর দুপুরের রোদ ঠিক্‌রে পড়া নীল আকাশ। আপন মনে যাচ্চি, যাচ্চি, কত কালের পুরোনো পথ, কতবার এ পথ দিয়ে এসেচি গিয়েচি, যখন হরিনাভি স্কুলে মাস্টারি করতুম। ফণিবাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ সেরে স্কুলে এলুম। প্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী আমাদের বাল্যকালে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, তাঁকে দেখলুম অনেককাল পরে। স্কুলের ওদিকের আকাশটা আমার তখন-তখন বড় প্রিয় ছিল আর পাঁচিলের ওদিকের গাছপালা, সভা ছেড়ে আমি তাই দেখতে উঠে গেলাম। তারপর ভোম্বলের সঙ্গে বেরিয়ে বৈকালের ছায়ায় একটা ছায়া-ভরা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা মাঠের ধারে এসে বসলুম। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে, দুজনে বসে পুরোনো দিনের গল্প কতই করি। ওখান থেকে উঠে আরও কিছুদূর এসে একটা পুরোনো ভাঙা দোলমঞ্চের কার্ণিসের ওপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থাকি। দোল মঞ্চটার চারিধারে ভাঙা মন্দির, পাড়ার মধ্যে বলে চারিদিকেই আম বাগান, তার তলায় খুব ঘেঁটু ফুল ফুটেচে, একধারে একটা কামিনী ফুলের ঝাড়। নানা ফুলের সম্মিলিত সৌরভে সন্ধ্যার বাতাস ভরপুর। হুতুম-পেঁচা ডাকচে প্রাচীন গাছের কোটরে। দু' একটা নক্ষত্র উঠেচে আমবনের ওপরে আকাশে। অন্ধকার হয়ে গেল। একটা পুকুরের ধারে এসেও খানিকটা বসি।

উৎকর্ণ

কাল সন্ধ্যাবেলা নীরদ বাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম দুপুরে, প্রমোদবাবু অনেক দিন পরে কলকাতায় এসেচে। অনেক গুল্প-গুজব করলুম। এক-দিন হিজলী যাওয়ার কথাও হোল। ওখান থেকে পশুপতি বাবুকে ফোন্ করে জানলুম দিলীপ রায় কলকাতায় এসেচে এবং আজ থিয়েটার রোডে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী সন্ধ্যায় গান হবে। হেমেনদা' এলেন তাঁর মেয়েদের নিয়ে। ওদেরই মোটরে ওদের সঙ্গে প্রতাপ মজুমদারের বাড়ী গেলুম। দিলীপের সঙ্গেও দেখা গেটের কাছেই। ওর সঙ্গে কখনো চাক্ষুষ আলাপ হয়নি, যদিও চিঠি পত্রে আজ আট ন' বছরের আলাপ। নাম শুনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো, কি চমৎকার উদার স্বভাব দিলীপের! বড় ভাল লাগে ওকে! বহু বিশিষ্ট নরনারী এসেচেন দিলীপের গান শুনতে। আজ আট ন' বছর পরে দিলীপ কলকাতায় এল। ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার, জীবনময় রায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ, উমা মৈত্র, 'পরিচয়' কাগজের—দল অনেককেই দেখলুম। কেবল মণি বোস্‌কে পাওয়া গেল না। আব্বাস তায়েবজির মেয়ের কৃষ্ণ-বিষয়ক গানটী আমার সকলের চেয়ে ভাল লাগলো। আসল গানটা হিন্দীতে ছিল, দিলীপ বাংলাতে অনুবাদ করেচে। কি চমৎকার গাইচে দিলীপ আজকাল! বাংলা গানের অমন ঢং কোথাও আর কখনও শুনিনি।

কাল দিনটা খুব ছুটোছুটি গিয়েচে। চারুবাবু হাইকোর্টের জজ হয়েচেন বলে তাঁকে আমাদের স্কুল থেকে অভিনন্দন দেওয়া হোল। কালই আবার দিন বুঝে ইউনিভার্সিটীতে Examiners' meeting—স্কুলে ফণি বাবু এসেছিলেন, আমাদের স্কুল ছেড়ে গিয়ে পর্য্যন্ত আসেন নি।

উৎকর্ণ

তাঁর সঙ্গে গল্প করে চলে এলুম ইউনিভার্সিটীতে। সেখানে মণি বোস, প্রমথ বিশী, জসীম উদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, মনোজ বসু, বারীন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বাবু সকলের সঙ্গে দেখা। সুনীতি বাবু প্রধান পরীক্ষক এবারও। ওখানকার কাজ শেষ করে সুধীর বাবুদের বইয়ের দোকানে সবাই মিলে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিলাম। তারপর আবার এলুম স্কুলে। চারুবাবুর অভিনন্দন সভা তখন জোর চলচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমরা ছিলুম। তারপর এক মাস্টার মশাই আর আমি এসে সেণ্ট জেম্‌স্‌ স্কোয়ারে একখানা বেঞ্চের ওপর বসে অনেক পুরনো কথার আলোচনা করলুম। রসিদ কি করে আমাদের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল, ক্লারিজ সাহেবকে আমরা কেমন সাবধান করে দিয়েছিলুম এই সব কথা।

ইষ্টারের ছুটীতে বারাকপুরে কাটাইনি অনেক দিন। এবার গিয়েছিলুম। আমার যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঘেঁটুফুল দেখা। প্রথম দেখলুম বনগাঁয়ের খয়রামারির মাঠে—কি অজস্র ঘেঁটুবন সেখানে। এর আগের সপ্তাহেও যে তিনদিন ছুটী ছিল, তাতেও বনগাঁ গিয়ে রোজ বিকেলে রাজনগর ও চাঁপাবেড়ের মাঠে যেতুম বেড়াতে। ফিরবার পথে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় একটি ঘেঁটুবনের কাছে বসে থাকতুম। পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ কর্ত্ত, তেতো তেতো ঘেঁটুফুলের গন্ধ। পাখী ডাকতো, কোকিল ও পাপিয়া। বৌ-কথা-ক'র এমনও আনদানী হয়নি। বারাকপুরে ঘেঁটুবন কোথাও তেমন নেই, কেবল আছে সলতেখাগী জামতলার, বরোজপোতায় ডোবার গায়ে আর সাজিতলার পথে। সকলের চেয়ে বেশী পেলুম আসবার সময়ে পালকী মুসলমান পাড়ার ওই পথটায়।

উৎকর্ণ

ক'দিন চমৎকার কেটেচে। অবিশ্যি ম্যাট্রিকের কাগজ দেখতে ব্যস্ত থাকার দরুন বড় কোথাও বেরুতে পারতুম না। একদিন গোপাল-নগর হাটে গিয়েছিলুম, সঙ্গে ছিল, জগো, গুটকে ও জীবু। ও পথেও কিছু কিছু ঘেঁটুবন আছে বড় আম বাগানের কাছে। বৈকালে প্রায়ই কুঠীর মাঠে বেড়াতে যেতুম বেলা পড়ে গেলে। চাঁদ উঠবার সময়ে নদীর ধারে মাঠে একা একা কত রাত পর্য্যন্ত বসে থাকতুম। জ্যোৎস্নায় নদীজলে নামতুম, স্নান করে আলো-ছায়ার জালবোনা পথে মেয়েদের পিঠে দেওয়ার ষাঁড়া গাছের তলাটী দিয়ে বাড়ী ফিরতুম। দুপুরে ও বিকেলে কত কি গন্ধ দুধারের মাঠে। রোদপোড়া মাটির গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, শিমুলের গন্ধ, শুক্‌নো পাতালতার গন্ধ, টাটকা-কাটা কাঠের গন্ধ—খয়রামারির মাঠে বনমল্লিকার ঘন সুগন্ধ—প্রভৃতির নানা সুবাসে মন ভরে ওঠে।

কাল মনোরানদের গাড়ীতে বারাকপুর থেকে বনগাঁ ফিরলুম। রাত্রের ট্রেণে কলকাতা।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন গিয়েছিলুম বারাকপুরে। একদিন চাঁপাবেড়ের মাঠে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসেছিলুম, তারপরে এসে ফুটবল খেলার মাঠটাতে বসলুম। দুপুরবেলা বারাকপুর গিয়ে পৌছই। ঝম্ ঝম্ করচে রোদ। খুকুরা ঘুমুচ্ছিল। ওদের ওঠালুম, তারপর অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। ফণিবাবু ও যতীনবাবু গাড়ী করে গেল আমাদের গাঁয়ে দেখতে। তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে এলুম কুঠীর মাঠ।

এবার শিমুলের গন্ধ বড় ভাল লেগেচে। ঘেঁটুফুল এখনও আছে—

তবে খুব কমে গিয়েচে। কোনো কোনো বনে কিন্তু নতুন ফুটেচে তাও দেখতে পেলুম।

কাল রাত্রে হেমেন রায়ের বাড়ী দিলীপ রায়ের গান শোনার নিমন্ত্রণ ছিল তাই আমরা অনেকে গিয়েছিলুম। গণপতিবাবু ও নীরদবাবুরাও ছিলেন। হেমেনদা' অনুযোগ করলেন মঙ্গলবারে পেনিটির বাগান-বাড়ীতে আমরা তাঁকে কেন নিয়ে গেলুম না। দিলীপ আসতে বড় দেরী করল। এল যখন প্রায় রাত ন'টা। বড় সুন্দর লাগলো আব্বাস তায়েবজীর মেয়ের সেই হিন্দীগানের অনুবাদটা—দিলীপের মুখে সেদিন যেটা থিয়েটার রোডে শুনেছিলুম। কাল ওর মেজাজ আরও ভাল ছিল, কি চমৎকারই গাইলে!

কলকাতায় কিন্তু সব সময়ই থাকা আমার বড় খারাপ লাগচে। চারদিকে দেওয়াল তুলে এখানে মনে প্রসারতা ও আনন্দ বন্ধ করে দেয়। সব সময়েই কোনো না কোন ঘরের মধ্যে আছি, হয় স্কুল, নয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, নয় মেস, নয় কোনো বন্ধুর বাড়ী, নয়তো সিনেমা। এত ঘরের মধ্যে থাকতে পারিনে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় এতে। সামনে গ্রীষ্মের ছুটী আসচে—এই যা একটা আনন্দের কথা।

কাল কাগজের বোঝা সুনীতি বাবুর বাড়ী গিয়ে নামিয়ে চলে গেলুম দক্ষিণা বাবুর বাড়ী। হেঁটেই গেলুম। মনে ভারী স্ফূর্ত্তি—কাগজগুলো থাকতে সত্যিই এই দেড় মাস কি কষ্টই না গেছে—আর এই রদ্দুরে। ফিরবার সময়ে আলিপুর হয়ে বাসায় ফিরি।

এইমাত্র পানিতর থেকে ফিরে এলুম। প্রসাদের বৌ-ভাত গেল কাল। আজ সকালে আমি কিরণবাবুদের সঙ্গে রওনা হয়েছিলুম। কিছুদূর নৌকো আসতে না আসতেই এল খুব মেঘ, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড়। আমরা নেমে ইটিণ্ডার স্কুল ঘরে আশ্রয় নিলুম। কিরণ বাবুর মেয়েদের ধরে নামালুম একে একে। তারপর বৃষ্টি থামলে ওখান থেকে বার হয়ে এসে নৌকোয় বসিরহাট পৌঁছেই ট্রেনখানা পাওয়া গেল। পানিতরের খালের ঘাট থেকে নৌকো চড়ে অনেকদিন আসিনি।

ক'দিন বেশ আনন্দে কাটিয়েছি। বুধবার দিন গিয়েছিলুম সকালের ট্রেনে। নৌকো এসেছিল ঘাটে। বাড়ী পৌঁছে দেখি আন্না দিদি ইত্যাদি এসেচে। সেই সন্ধ্যাবেলা পিসিমা ও সুশীল পিসেমশায় এলেন, আমি তখন নদীর ধারে বসে আছি, সঙ্গে পানিতরের কয়েকটি ছেলে। প্রথম প্রথম যখন পানিতর আসতুম, তখন এসব ছেলে জন্মায়নি। রাত্রে দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী চাতালে বসে পিসিমা, হেনা, দিদি ওদের সঙ্গে গল্প ও আড্ডা। প্রসাদ বসে বসে গ্রামোফোন বাজাতে লাগলো। অনেক রাত্রে ছাদের ওপর শুই—কারণ কোথাও শোবার জায়গা নেই।

কি বিশ্রী বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে কাল থেকে! কাল সুপ্রভার ওখানে গিয়ে শুনি সে তখন নেই। হাতে কোন কাজ ছিল না। এসে কাউন্সিল হাউসের সিঁড়িতে বসে রইলুম। কিছু ভাল লাগে না—অন্যমনস্ক মন। তখনই স্থির করলুম শিলং থেকে কাল সকালেই চলে যাবো। অথচ কালই তো মোটে এসেচি—আর তার ওপর এই বিশ্রী আকাশ। গরম নেই তাই কি? এর চেয়ে গরম ঢের ভালো ছিল যদি রদ্দুর উঠতো। যখন যার যা, তাই লাগে ভালো। সুপ্রভাকে চিঠি দেবো বলে পোস্টাপিসে

গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পোস্টমাস্টার আসেই না। একটা লোক দরজির কাজ করচে, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি বসে। এমন সময় দেখি আমার পুরোনো ক্লাসফ্রেণ্ড্ মনোরঞ্জন যাচ্ছে—তার সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় ফার্ম্মেসিতে সাক্ষাৎ হয়েছিল—আমার সঙ্গে দেখা হয়ে ও খুব খুশিই হোল। কিন্তু আমার মন এই মেঘলায় যেন কিছুতে ঠিক হয় না? পোস্টাপিস্ থেকে ফিরে শিলং ডেয়ারিতে দুধ খেতে গেলুম। বেশ ভাল দুধ দেয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটা। জেলরোড আর পুলিশ বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে মেঘাচ্ছন্ন লুম্ শিলং-এর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলুম আমাদের গ্রামে এতক্ষণ রোদে তেতে উঠেচে চারিদিক। মাঠে সোঁদালি ফুল ফুটেচে, ইছামতী নদীতে এই গরমে নেয়ে খুব তৃপ্তি হবে। তীব্র গরম দূর ক'রে হঠাৎ বেলা তিনটের সময় কালবৈশাখীর মেঘ উঠবে, ঝড় সুরু হবে, গরম পড়ে যাবে, সবাই আম কুড়ুতে দৌড়ুবে।

এই এখন বসে লিখ্‌চি, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি সুরু হয়েচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আমার ঘরের দরজা দিয়ে দূরে পাহাড়ের চূড়া, মেঘে ঢাকা কয়েকটা পাইন গাছ সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে, হোটেলের চাকর ৩নং, ৪নং ঘরের বাবুদের জন্যে গরম জলের বন্দোবস্ত করচে, জোড়হাটে বাড়ী এক আসামী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে গল্প করচেন। কি বিশ্রী বৃষ্টি! এখানে বসে রৌদ্রালোকিত বাংলাদেশ, তার মাঠ, কুঠীর মাঠে বিকেলের ছায়ায় সোঁদালি ফুলের মেলা, সারাদিনের গরমের পরে জ্যোৎস্নারাত্রে ইছামতীর স্নিগ্ধ জলে একা নির্জ্জন ঘাটে নাইতে নামা খুকুর আস্তে আস্তে আসা ওদের বাড়ীর বেড়ার পাশ দিয়ে—এসব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। বৃষ্টি জোরেই নাম্‌লো—শীত বেশ। আমাদের দেশের অগ্রহায়ণ মাসের মত শীত। কল্‌কাতাও এর চেয়ে ঢের ভালো, সেখানে দুপুর রোদে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী যাওয়া

চলতি একমাস মর্ণিং স্কুলের সময়। বৌঠাকরুণদের বাড়ীতে চা পান, কমল সরকারের গান—সেও যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। কাল সন্ধ্যায় একবার ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেই ট্রি ফার্ণ দুটো দেখলুম। খাসিয়া মেয়েরা বেড়াতে এসেচে। ওখানে দাঁড়িয়ে কাল কেবলই মনে হয়েছে সুপ্রভা এখানে নেই। একবার মনে হোল সেদিন যে পানিতরে বেশ ক'দিন কাটিয়ে এসেছিলুম, সেকথা। সেই চাঁদা কাঁটার বন, সন্ধ্যার একটা তারা উঠলো। তাই নিয়ে ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে সেই নক্ষত্র-জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা।

বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে এক-ঘেয়ে। থামবার নাম নেই। এ যেন শ্রাবণ মাস। গরম আর সূর্য্যের আলোর জন্যে মন হাঁপাচ্ছে। লাইটমক্রাতে সুনীলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলেও হোত—কিন্তু সুপ্রভা না থাকাতে আমার কোনো কাজে উৎসাহ নেই। কে বেরোয়, এই বৃষ্টির মধ্যে? ভেবেছিলুম একবার শিলং পিক্-এ উঠবো—তাও গেলাম না। মজা এই যে এখানে এতগুলো লোক এসেচে হোটেলে—সবাই কেবল বসে বসে খাচ্চে আর শরীর সারাচ্চে—কোনো কিছু দেখবার উৎসাহ নেই ওদের। খাসিয়া ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বড় সাহেবি ভাবাপন্ন হয়েচে। ওরা সাহেবদের ধরণে হাত নেড়ে আনন্দ জানায়—কাল সনৎ কুটিরের সামনে এক খাসিয়া ছোক্‌রা তার বন্ধুকে বল্লে—Cheerio! কেন বাবু, তোদের মাতৃভাষায় কোনো কথা নেই? গির্জ্জা থেকে কাল রবিবার সন্ধ্যার সময় অনেকগুলো খাসিয়া মেয়েপুরুষ ফিরছিল। নিজের ধর্ম্মও এরা ছেড়েচে।

এই শীত আর বৃষ্টির মধ্যে নাইবার উৎসাহ হচ্চে না। জোড়াহাটের ভদ্রলোকটি তেল মাখচেন। আমায় বল্লেন, নাইবেন না? বল্লুম—

মাথাটা ধোবো মাত্র। আজ এখনই চলে যাবো—বড্ড ঠাণ্ডা লাগবে সারাদিন।

Rain, Rain, go to Spain—কি একঘেয়ে পাইন বন আর বৃষ্টি, সূর্য্যের আলো নইলে সুন্দর বিকেলের ছায়া নামে না, পাখী ডাকে না, ফুলের সৌন্দর্য্য থাকে না—একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দূরের পাইনবনাবৃত পাহাড়ের চূড়াটা বৃষ্টিতে অপূর্ব্ব হয়ে উঠেচে।

এখানে এসেচি অনেকদিন, শিলং থেকে ফিরেই। কিন্তু এতদিন লিখতে পারিনি। এসেই প্রথমে একদিন পায়ে হেঁটে গিয়েছিলুম বাগান-গাঁয়ে পিশিমার বাড়ী। কাঁচিকাটার খেয়া পার হয়ে সেদিন গেলুম—গাড়াপোতার বাজারে, গিয়ে একটা দোকানে খানিকটা বসে রইলুম, কারণ সে সময়টা বড় বৃষ্টি এল। তারপর চলে গেলুম পাটশিমলে। সন্ধ্যার আগে বাগান গাঁ। ফিরবার দিন খুব বেলা থাকতেই মোল্লাহাটির খেয়া ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম। জামদা'র বাঁওড় পার হলুম দড়টানার খেয়ায়। পার হয়েই এপারটা বেশ ছায়াভরা চমৎকার জায়গা—খানিকক্ষণ বসে তারপরে রওনা হই। সন্ধ্যার আগে এসেই বাড়ী পৌঁছে গেলুম। একটা বটগাছের তলায় অনেকক্ষণ বসেছিলুম মোল্লাহাটির ওপারে—সেটা বড় ভাল লেগেছিল।

দিন বেশ কাটচে। গোপালনগরের বারোয়ারী দেখচি প্রতি বৎসরের মত—কাল রাত্রেও হয়ে গেল। কাল অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেচি। একদিন খিনুদের ওখানেও গিয়েছিলুম।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এবার যেন বেশীদিন এখানে ভাল লাগচে না। মন উড়ু উড়ু করচে, কেন তা কি জানি। জীবন এখানে অনেকটা একঘেয়ে,

সেইজন্যেই কি? কিন্তু নির্ম্মলতা ও প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যে এর তুলনা নেই বলেই তো এখানে আসা। এবার সেটাও যেন ভাল লাগচে না অন্য অন্য বছরের মত—তার একটা প্রধান কারণ আমি বুঝতে পেরেচি কলকাতায় যে কর্ম্মবহুল জীবন কাটিয়ে এসেচি এবার, তার তুলনায় এখানকার অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় জীবনযাত্রা মনকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। আমি মাঠের মধ্যে থাকতে ভালবাসি। তবে মোটে সেদিন কলকাতা থেকে এসেচি বলে এই রকম লাগচে—দীর্ঘদিন কাটালে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এসব। কথা বলবার লোকের অভাবই সকলের চেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে এখানে। শ্যামাচরণ দা'র ছেলেটি সেদিন মারা গেল, আমরা সবাই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম তাকে বাঁচাবার। সেজন্যেও মনে একটা কষ্ট আছে।

বিকেলের দিকে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলুম। আজ খুব বৃষ্টি হয়েছিল দুপুরে। তাই পথে একটু বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়েছিল—এত ফুল এত গাছপালাও কুঠীর মাঠে! সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য। এখান থেকে আরম্ভ করে বাগানটা পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গাটাই একটা প্রকাণ্ড বড় পার্ক। কত বিচিত্র লতাবৃক্ষগুল্মের সমাবেশ, কত বিচিত্র বন্যফুলের সমারোহ—কত কি পাখীর ডাক, বাঁশগাছের সারি, প্রাচীন বট অশ্বথ—সবই সুন্দর। মনটা ভার ছিল, একটা ছোটো বাবলাগাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। আমার চারিপাশে সোঁদালি ফুল ঝুলচে, একদিকের গাছ-পালার ফাঁকে কি সুন্দর ময়ূরকণ্ঠি রংয়ের নীল আকাশ, বসে কত কী ভাবলুম। এই যে বিরাট বিশ্ব-চরাচর, এতে কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত নীহারিকারাজি, কত Globuler cluster, কত নাক্ষত্রিক বিশ্ব

এদের মধ্যে কত আমাদের মত প্রাণী রয়েচে। Jeansএর দল যাই বলুন, আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে শুধু আমাদের এই পৃথিবীতেই বুদ্ধিমান প্রাণী আছে আর কোথাও নেই। তা যদি থাকে, ধরেই নওয়া যাক্, তবে তাদের মধ্যে অনেকে কষ্ট পাচ্ছে—আজ আমি তাদের দলের একজন। দুঃখে তাদের সঙ্গে আমি এক হয়ে গিয়েছি।

সকালেবেলা কি বিশ্রী বর্ষা নেমেছে। আমার ঘরের বাইরে বড় বড় পাতাওয়ালা গোঁড়ালেবুর গাছটাতে থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটেচে। মনটা ভাল না, বসে বসে লিখছিলুম বাইরে বসে, হঠাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আসাতে ঘরের মধ্যে এসে বসেচি। ঝিলবিলের দিকে জলের তোড় ছুটচে কলকল শব্দে। ন'দিদি ও বড় খুড়ীমা ওদের ভূতোতলায় আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে জলে ভিজে। খুকুকে বড় একটা দেখা যাচ্ছে না আমতলায়।

• • • •

বিকেলে মেঘ-থম্‌কানো আকাশের তলা দিয়ে বেড়াতে গেলুম সুন্দরপুরে প্রমথ ঘোষের বাড়ী। সারা পথটা আকাশে মেঘের কি শোভা! কত পাহাড়পর্বত, আকাশের কি চোখ্ জুড়ানো অদ্ভুত নীল রং! নীচে বর্ষা-সতেজ শ্যামল গাছপালা, নতুন আউশ ধানের কচি জাওলা বেরিয়েচে মাঠে মাঠে মরাগাঙের ধারে, বাঁওড়ের ওপারে। আষাঢ় মাসে এদিকে প্রকৃতি যে রূপ পরিগ্রহ করে, তার তুলনা কোথাও বুঝি নেই। শিলংএর পাইন বন এর তুলনায় নিতান্ত একঘেয়ে। জ্যোৎস্না বেশ যখন ফুটেচে, তখন নদীর জলে এসে নামলুম। জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্ করছে জলে, চাঁদ হাজার টুক্‌রো হয়ে জলের মধ্যে খেলা করচে—এখনও নদীপারে বনে

কোথায় 'বৌ-কথা-ক' ডাকচে, নদীর ধারের সোঁদালি গাছগুলো এখনও ফুলের ঝাড় ঝরে পড়ে নি। কত গাছ, কত লতা, কত ফুল, কত পাখীর খেলা, আকাশে রঙের মেলা, কি ঘন সবুজ চারিধার। নক্ষত্র চোখে পড়ে না আকাশে, হাল্কা মেঘের পরদার আড়ালে দ্বাদশীর চাঁদখানি মাত্র দেখা যাচ্চে।

এতদিন পরে এবার বারাকপুর বড় ভাল লাগচে। মানুষ এখানে তেমন নেই বটে কিন্তু প্রকৃতি এখানে অপূর্ব্ব লীলাময়ী। প্রকৃতিকে নিয়ে থাকতে পারো তো এমন জায়গা আর নেই। কলকাতার কাজ আর মানুষ—এখানকার প্রকৃতি, এই দুইয়ের সম্মিলন যদি সম্ভব হোত! রোজ কাজকর্ম্ম সেরে কল্‌কাতা থেকে দ্রুতগামী মোটরে বেলা ৫টার সময় যদি বেলেডাঙার পুলের মুখে ফিরে আসা সম্ভব হোত এই আষাঢ় মাসের দীর্ঘ দিনের শেষে, জীবনটা সত্যি উপভোগ করতে পারতুম। নিজের একখানা এরোপ্লেন থাকলে চমৎকার হোত। সমস্তদিনের হৈ চৈ ও কর্ম্মক্লান্তির পরে শান্ত অপরাহ্নে বর্ষণক্লান্ত আকাশের তলে কাঁচিকাটার পুলের কাছে মরাগাঙের এপারে সবুজ ঘাসভরা মাঠে উড়ি ধানের ক্ষেতের ধারে বসে থাকতে পারতুম—তবে Contrastএর তীক্ষ্ণতায় প্রকৃতিকে ভাল করে বুঝবার সুযোগ হোত—একে উপভোগও করতে পারা যেতো আরও গভীর ভাবে।

আজ বৈকালের দিকে খুব ঝম্‌ঝম্ বর্ষা। আমার একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হোল। সন্ধ্যার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে যেন মনে হোল এই আকাশ, রঙীন্ মেঘরাজি, সবুজ বাঁশবন—এদের সবটা জড়িয়ে যে বিরাট বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি, তা হৃদয়হীন নয়। তা ভালবাসে, দয়া

করে। দুঃখে সহানুভূতি দেখায়। আজ কোনো একটা বিষয়ে সেটা আমার অভিজ্ঞতা ঘটেচে। সে অভিজ্ঞতা সত্যিই অপূর্ব্ব।

আষাঢ় মাসের এ দিনগুলো আমার বড় পরিচিত। বাল্যকাল থেকে চিনে এসেচি এদের। মেঘান্ধকার আকাশ, আর্দ্র বাতাস, বাঁশবনে পিপুললতা ও অনন্তমূলের নূতন চারা বার হয়েচে, ওলের চারা বার হয়েচে, যখনই এমন হয়, তখনই আমার গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে যায়, ছেলে বেলা থেকে দেখে আসচি। *কিন্তু একটা তফাৎ ঘটেচে, আগে এই নবোদ্গত পিপুলচারার সঙ্গে একটা দুঃখ ও বিরহের অনুভূতি জড়ানো থাকতো—এখন আর সেটা হয় না।* এখন মনে হয় কলকাতা গেলেই ভাল হয়, অনেকদিন তো দেশে কাটলো।

কতবার এই নব বর্ষা এই আষাঢ় মাস আসবে যাবে। যেমন আমার জীবনে এরা কত বার এসেচে গিয়েচে। কতবার কাঁটাল পাকবে, বাঁশবনে অনন্তমূলের চারা বেরুবে, ফলবিরল আমবাগানে হাজরী জেলে ও হাজু কামারনী আম কুড়িয়ে বেড়াবে ভোরে। এসব সুপরিচিত দৃশ্য আরও কতবার দেখবো। আমাদের গ্রামটুকু নিয়ে যে জগৎ, এ দৃশ্য তারই। অন্য কোথাকার লোকের কাছে এসব হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত তাও জানি, তারা কখনও পিপুলতাই দেখেনি হয়তো।

তারপর আমি চলে যাবো, হাজারী জেলেনী চলে যাবে, আমার সমসাময়িক সকল লোকই চলে যাবে, তখনও এমনি আষাঢ়ের নতুন মেঘ জমবে মাধবপুরের ঘরের ওপার, আর্দ্র বাঁশবনে এমনি ধারা পিপুল চারা বেরুবে, বৌ-কথা-ক পাখীর ডাক বিরল হয়ে আসবে বকুলগাছটাতে, গাঙের জলে ঢল নামবে—শুধু আমার এই আবাল্য সুপরিচিত জগৎ তখন আর আমার চৈতন্যের মধ্যে থাকবে না।

সবদিনে মানুষের মনে সমান আনন্দ থাকে না জানি, কিন্তু আজকার দিনের যত আনন্দ আমি কতকাল যে জীবনে পাইনি! প্রথম তো সকালে উঠেই দেখলুম আকাশ ভারী পরিষ্কার—নিজের ঘরের দাওয়ায় খানিকটা বসে মুসলমান মাস্টারটির সঙ্গে গল্প করে বাঁওড়ের ধারের বটতলার পথে একটু বেড়াতে গেলুম। এমন নীল আকাশ অনেকদিন দেখিনি। জেলেপাড়া ছাড়িয়েই ঐ সরু পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাঁশঝাড় থেকে একটা সরু কঞ্চি বেছে নিলাম হাতে নেবার জন্যে। বাঁশের কঞ্চির জন্যে এ আগ্রহটা আমার চিরকাল সমান রইল সেই বাল্যকাল থেকে। যেতে যেতে আমাদের মাথার ওপরকার নীল আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হোল আষাঢ় মাসের দিনে আকাশ এত নীল, এত নির্মেঘ, এ সত্যিই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। রোদের কি রং! বাঁওড়ের ওপারের আকাশ নিবিড় বট অশ্বথের আড়ালে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এই বাঁওড়ের ধারের বটতলার পথটা দিয়ে আজ আঠারো-উনিশ বছর কি তারও বেশী এমনি সকালে হাঁটিনি। বটগাছের একটা ডালে কাল খানিকক্ষণ বসেছিলুম, আজও সে ডালটায় বসবো বলে গেলাম, কিন্তু আজ একটু বেলা হয়ে গিয়েচে বলে রোদ এসে পড়েচে সেখানে। একটা বাঁশের মাচা করেচে বটতলায় বাঁওড়ের ধারের দিকে! সেখানে বসে কি আনন্দ! আমায় এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে থাকতে দেখে কিন্তু কেউ কিছু ভাবে না—সবাই খুব ভালবাসে দেখলুম। আমি অনেককে চিনি নে, ওরা আমায় চেনে। একজন কাল বলচে—দাদাবাবু আমাদের দেখ বসে আছেন বটের শেকড়ে। দাদাবাবুর অজ্ঞার নেই গা। আজ একজন পথচলতি লোক, তার বাড়ী

আরামডাঙায় পরে জানতে পারলুম, আমায় বসে থাকতে দেখে পাশে এসে বসলো। বল্লে—বাবু, একটা ব্যারামে বড় কষ্ট পাচ্চি। প্যাটের মধ্যে ভাত খেয়ে উঠলি এমন শূলোয় যে আপনাকে কি বলবো! কি করি বলুন দিকি বাবু?

সে এমন বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে প্রশ্ন করলে যেন আমি স্বয়ং ডাক্তার গুডিভ্‌ চক্রবর্ত্তী।

কি করি আমার কোন ওষুধই জানা নেই—তাকে পরামর্শ দিলুম রাণাঘাটে গিয়ে আর্চ্চার সাহেবকে দেখাতে। মিশনারী হাঁসপাতালে পয়সা-কড়ি লাগবে না। মনে এমন দুঃখ হোল, একটু হোমিওপ্যাথি জানলেও এইসব গরীব লোকের উপকার করা যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা ছাড়া আমি ওর রোগ সারানোর জন্যে আর কি করতে পারি!

ওখান থেকে উঠে মাঠের মধ্যে গেলাম। একজায়গায় একটা কি চমৎকার লতাবিতান, ওপরে ডালপালার ছাওয়া, মোটা লতার গুঁড়ি কাঠের মত শক্ত হয়ে তার খুঁটী তৈরী করেচে। ওর মধ্যে বসে একটু পাখীর ডাক শুনলুম, তারপর মাটির মধ্যে এসে বাবলাগাছের মাথার ওপরকার আকাশের অপূর্ব্ব নীল রং দেখে সেখানটায় গামছা পেতে ঘাসের ওপর কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। সে যে কি আনন্দ, তা হয়তো আমি নিজেই কিছুকাল পরে অবিশ্বাস করবো, কারণ ওসব অনুভূতি মানুষের চিরকাল একভাবে বজায় তো থাকে না, পরে শুধু স্মৃতিটা থাকে মাত্র। মাথার ওপরকার ঐ ময়ূরকণ্ঠি রংয়ের আকাশ, ঘাসের নীচে এই বিচরণশীল পোকা-মাকড়, ছোট ছোট ঘাসের ফুল, ঐ উড়ন্ত চিল, বটের ডালে লুকানো ঐ বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক, কত বিচিত্র বনলতা, বনফুল—ঐ সূর্য্য থেকে পাচ্চে এদের জীবন, রং ও আলো। কিন্তু এই সবের পিছনে,

সূর্য্যেরও পিছনে, এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে যে বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা—তার কথা কেবলই এমনি দুপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে। ভেবে কিছু ঠিক করতে হবে তার কোনো মানে নেই, এই ভাবটাতেই আনন্দ। তখন যেন মনে হয় এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক তারে গাথা—অদৃশ্য যে লতায় এই সব ফুল নিয়ে মালা গাঁথা হয়েচে, আমি তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাদেরই একজন—বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপিত হয় মনে মনে।

মনকে এভাবে তৈরী করে নেওয়ার সার্থকতা আছে, কারণ মনই সব, মন যে ভাবে পৃথিবীকে দেখায়, জীবনকে দেখায়—মানুষে সেভাবেই দেখে। মন দুঃখ দেয়, সুখ দেয়—মনকে তৈরী করে যে না নিতে পেরেচে, তার দুঃখ অসীম।

ঐ লতাবিতানের মধ্যে আজ সকালে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলুম ভারী নিভৃত, ছায়াঘন স্থানটী। প্রকৃতি অনেক যত্নে একে যেন নিজের হাতে গড়েচে। কাঠবিড়ালী খেলা করচে, কত কি পাখী ডাকচে, পত্রান্তরাল থেকে একটু একটু রোদ এসে পড়েচে, ঠাণ্ডা মাটিতে বড় চমৎকার ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, কেয়োঝাঁকা, যাঁড়া, ডুমুর, কুঁচকাঁটার লতার সমাবেশে এই ঝোপটা তৈরী—দুপুরের রোদে এই নিস্তব্ধ ঝোপের ছায়ানিবিড় আশ্রয়ে বসে বইপড়া কি লেখা বড় ভাল লাগে।

এবেলা থেকে বর্ষা নেমেচে। ইছামতীর ওপরকার আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। আজ কলকাতায় রওনা হব ভেবেছিলুম—কিন্তু এরকম বাদলা দেখে পিছিয়ে গেলাম।

উৎকর্ণ

আজ সারাদিন মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ—কাল চলে যাবো, গ্রীষ্মের ছুটি তো ফুরিয়ে গেল। যা দেখচি, সবই বড় ভাল লাগচে। খুকু বার বার আসচে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে, নানা ছুতোয় নানা ফাঁকে। সারা দিন আজ ভয়ানক বর্ষা—বৃষ্টির বিরাম নেই একদণ্ড। দুপুরের সময় যে বৃষ্টি নামলো, তা ধরলো বিকেল চারটের পরে। খানা-ডোবা ভরে গিয়েচে। আমন ধানের মাঠে রোয়ার জল হয়েচে। বিল-বিলে তো জলে টইটুম্বুর। মেঘমেদুর বিকেলে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে জলের উপর পা ফেলে ছপ্ ছপ্ শব্দ করতে করতে গেলুম আইনদ্দির বাড়ী—ওর সঙ্গে আমার জীবনের আনন্দময় দিনগুলোর যোগ আছে—যখনই খুব আনন্দ পেয়েচি, তখনই ওর বাড়ীতে গিয়ে বসেচি এই ক' বছরের মধ্যে। আজও গেলাম। ওর বাড়ীর দাওয়ায় বসে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের ঘন সবুজ আউশের ক্ষেত ও প্রাচীন বটের সারির দিকে চোখ রেখে ওর সঙ্গে কত গল্প করলুম। বয়স হয়েচে ৯৮ বছর, কিন্তু আইনদ্দি কখনো শুধু-হাতে বসে থাকে না। আমি যখনই গিয়েচি, তখনই দেখেচি ও কোনো না কোনো একটা কাজ নিয়ে আছে—এখন সে একটা তল্‌তা বাঁশের পাশ চাঁচছিল—বল্লে—মাছ ধরার ঘুনি বুনবো।

ওর উঠোনের দক্ষিণ ধারে একটা বাবলার গাছ, তার ঝিরে ঝিরে সরু পাতাভরা ডালগুলোর দিকে চেয়ে মনে যে কি আনন্দ পেলাম—তার যেন তুলনা নেই। ওখান থেকে পার হয়ে কাঁটিকাটা পুলের ওপর এসে দাঁড়ালুম—বর্ষাক্লান্ত বৈকালে দিগন্তে মেঘের যে শোভা হয়, ইছামতীর ওপারে, মাধবপুরের চরের মাথায়, বাঁওড়ের শেষ সীমানার দিকে এদের দেখে তুষার মণ্ডিত হিমালয়শৃঙ্গের কথা মনে পড়ে।

উৎকর্ণ

ঘোষেদের দোকানে এসে বসেচি। একটা লোক মাথায় একটা পুটুলি নিয়ে ঢুকে বল্লে—মুসুরি নেবা?

ওরা বল্লে—নেবো।

এর বদলে কিন্তু চাল দিতি হবে।

ওরা তাতেই রাজি হোল।

তারপর সে বসে বসে গল্প করতে লাগলো। চৈত্র মাসে আউশ ধানের বীজ ছড়িয়েছিল বলে তার ক্ষেতে ধান এখন খুব বড় বড় হয়েচে। বাড়ী তার খাব্‌রাপোতায়। খাবার ধান এখন আর ঘরে নেই, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে এখন সে নিঃস্ব, অথচ এগার জন লোক তার পরিবারে, দু'বেলা বাইশ জন খেতে। সামান্য কিছু মুসুরী ছিল তাই ভরসা। তাই বদলে চাল নিতে এসেচে।

ফিরবার পথে অস্ত-দিগন্তের মেঘস্তূপে অপূর্ব্ব রাঙা রঙ ফুটলো, দেখে দেখে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

গ্রীষ্মের ছুটীর পরে স্কুল খুলেচে প্রায় মাসখানেক হোল। কলকাতায় এসে পুরোনো হয়ে গেল। এরই মধ্যে একদিন বারাসাত গিয়েছিলুম পশুপতি বাবুদের সঙ্গে, একদিন রাজপুর গিয়েছিলুম। একদিন ডাঃ মহেন্দ্র সরকারের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা গভীর বিষয়ে আলোচনা শুনলুম তাঁর মুখে। আমার মন উদ্বিগ্ন হয়েচে [illegible] একবার ইছামতীতে স্নান করবার জন্য। এরই মধ্যে যেন মনে হচ্চে কতকাল এসেচি।

গত শুক্রবার বারাকপুর গিয়েছিলুম। পরিপূর্ণ বর্ষার শোভা অনেক

দিন দেখা হয় নি—এবার এই বারাকপুরে থাকবো বলেই গিয়েছিলুম। ইছামতীর জল ঘোলা হয়ে এসেচে। দু'দিনই বাঁওড়ের তীরে বটতলার পথে সকালবেলা বেড়াতে গেলুম—দু'দিনই ঘোলা গাঙে খুকুদের সঙ্গে স্নান করলুম। রৌদ্রে নতুন ওঠা কচি ঘাসের ওপর খানিকটা করে শুয়ে ঘাসের সাদা সাদা ছুটো ফুল লক্ষ্য করলুম। বটগাছের তলায় গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে আজই সকালে কতক্ষণ বসে রইলুম। বিশেষ করে শনিবার বিকেলে ন'দিদির কাছে নতুন বইখানার প্রথম দিকের গোটা-কতক অধ্যায় শুনিয়ে যখন ইন্দু মাছ ধরতে বসেছিল তাই দেখতে গেলুম—তখন যেন একটা নতুন দৃশ্য দেখলুম। নকুলের নৌকোতে বেলেডাঙার মাঠে নতুন জায়গায় নেমে নীল আকাশের কোলে রঙীন্ মেঘস্তূপ দেখে মনে হোল এমন দৃশ্য ফেলে কেন যে কলকাতায় পড়ে থাকি!

রানাঘাট হয়ে কলকাতা ফিরলুম বিকেলে। বেশ লেগেচে শ্রাবণ মাসে দেশে গিয়ে। অনেকদিন যাইনি এ সময়। কাল দুপুরের পরে ন'দিদিদের দালানে বসে যখন পুষ্পের কথা পড়ে শোনালুম নতুন বই থেকে খুকু খুবই খুসি। ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো, বল্লে—সব বইতে কেবল তুমি আর আমি, ওই নিয়েই গল্প—এটা নতুন ধরণের হয়েচে।

নকুলের নৌকোয় যখন যাচ্ছি, নদীর ধারে একজায়গায় প্রকাণ্ড একটা বাব্‌লাগাছ থেকে কত কি বন্যলতা ঝুলচে, ডাইনে রঙীন্ মেঘস্তূপ, আবার একটা জায়গায় আধভাঙ্গা একটা রামধনু। বেলেডাঙার মাঠে নেমে সবুজ ঘাসের একধারে বড় সুন্দর একটা ঝোপ। এদিকটা কখনোই আসিনি। কতক্ষণ মাঠের মধ্যে ঘাসের ওপর শুয়ে রইলুম। মটরলতা তো যেখানে সেখানে—নতুন পাতার সম্ভার নিয়ে দুলচে, প্রতি ঝোপের

মাথা থেকে—আমার কি জানি কেন ভারী আনন্দ হয় নতুন কচি মটরলতা দেখলে। ওর সঙ্গে যেন কিসের যোগ আছে আমার। আজ সকালে জগো আর গুটকে যখন কুঠীর মাঠের গাছটাতে পেয়ারা পাড়চে আমি একটা মটর লতার ঝোপের তলায় বসলুম—নতুন এক ধরণের চওড়া পাতা নরম ঘাসের ওপরে। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি। তার বর্ণনা দেওয়া যায় না—মনের আনন্দই তার চরম প্রকাশ।

আমি ডায়েরীতে অনেক বারই লিখি "এ আনন্দের তুলনা নেই।" হয়ত এক ঘেয়ে হয়ে যায় কথাটা, কিন্তু আনন্দটা যে একঘেয়ে হয় না। যে আনন্দ মনকে ভরিয়ে দেয়, তা সব সময়ে, সর্ব্বকালে এক। যখনই পাই, তখনই মনে হয় এ বুঝি নতুন, এমনটা আর কখনো বুঝি হয় নি। সেই যে নিত্যনূতন চির অক্ষয় আনন্দ, তার কি ভাবে বর্ণনা দেবো একমাত্র ঐ কথা ছাড়া যে 'এর আর তুলনা নেই'? জীবন যে বহু আনন্দমুহূর্ত্তের সমষ্টি, তাদের পৃথক পৃথক বর্ণনা নেই, তারা চির নবীন, শাশ্বত, অক্ষয়, অব্যয়—কাজেই তাদের তুলনা নেই। সত্যিই তো তাদের তুলনা আর কিসের সঙ্গে দিতে পারি? অন্য অন্য দিনের আনন্দের সাথে? কিন্তু তারা তো তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত—বর্ত্তমানে যা পাচ্ছি, তাই তখন বড়।

এত শীগ্‌গির যে আমায় আবার শিলং আসতে হবে, তা ভাবিনি। কিন্তু সুপ্রভা আসতে লিখলে আর আমারও একটা সুযোগ উপস্থিত হোল আসবার। কাজেই চলে এলুম।

কাল বিকেলে ট্রেণে সময়টা কি চমৎকার কেটেচে! কত নতুন অনুভূতি, কত নতুন চিন্তা। নৈহাটির কাছাকাছি যখন গাড়ীখানা এল,

তখন মনে হোল, এখান থেকে সোজা বারাকপুর কতটুকুই বা আর, এখন দুপুর বেলা, আমাদের বকুলতলায়, বিলবিলের ধারে ছায়া পড়ে গিয়েচে, খুকু এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচে, বৃহস্পতিবার আজ গোপালনগরের হাট, সব লোক হাট করতে যাচ্চে, কত গ্রামে, বাঁশবনের ছায়ায় ঢাকা কত পল্লীকুটিরে কিশোরী মেয়েরা প্রেমের রঙীন স্বপ্নজাল বুনে ঘুরে বেড়াচ্চে, খুঁটির কাছে বসে চলে যাবার সময় চেয়ে বসে থাকার; নদীর ধারে কত বন-সিমলতার আড়ালে চোরা চাউনি ও হাসির কত ঢেউ—এই সব ছবি মনে আসে। বিকেলে তারা জলে নেমেচে গা ধুতে। পার্ব্বতীপুর এসে এসে যেন সব চেনা পুরোনো হয়ে গিয়েচে। গাড়ীতে বেশ জায়গা ছিল। ট্রেনে ঘুমও হোল খুব। লালমণিরহাটে নেমে জেলি ও পাগলার খোঁজ করলুম। অত রাত্রে কোথায় পাবো ?

ভোর হোল রঙ্গিয়া জংসনে, এখানেই প্রতিবারে ভোর হয়। আর যখনই এপথে এখানে এসেচি, বৃষ্টি ছাড়া দেখিনি কখনো। ভিজে স্যাঁত-সেঁতে জলাভূমি আর ফার্ণ গাছের বন, কাদাভরা মাটির পথ-ঘাট, কলার ঝাড়, নীচু নীচু খড়ের বাড়ী।

ব্রহ্মপুত্র কূলে কূলে ভরা। কি ঠাণ্ডা জল! জলে নেমে মুখে মাথায় জল দিয়ে তৃপ্তি হোল ভারী। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে, মেঘমেদুর আকাশ, ওপারের পাহাড়ে কুয়াসার মত মেঘ জমে রয়েচে।

গৌহাটী-শিলং মোটর বাসে ত্রিপুরার মহারাণীর একদল পরিচারিকা উঠলো—তাদের কথাবার্ত্তা বিন্দুবিসর্গও বুঝি নে—মোটর যেমন পাহাড়ের পথে উঠলো—অমনি ওরা সবাই সামনের বেঞ্চিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো—সবারই নাকি গা ঘুরচে। বেশ গরম, নংপোতে এলুম তখনও এতটুকু ঠাণ্ডা নয়, এমন কি শিলংএও নয়। বরপানি নদীতে বর্ষার

পরিপূর্ণ যৌবনের জোয়ার এসেচে—শিলাখণ্ড থেকে আর এক শিলাখণ্ডে লাফিয়ে আছড়ে পড়ে কি তার উদ্দাম মাতন !

আমার পুরোণো স্নো-ভিউ হোটেলে এসেই উঠলুম। ওদের কলটার কাছে সেই গোলাপগাছটা তেমনি আছে, থোকা থোকা রাঙা গোলাপ ফুটেচে।

বড় মেঘ আর বৃষ্টি শিলং-এ। পাইন বনে মেঘ জমে আছে শাশ্বত আর টিপটিপে জল, রৌদ্র দেখলুম না কখনো শিলংএ।

লাবানে যাবার সময় গোটা পথটাতেই বৃষ্টি। আজ আসামের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার মাইকেল কিনের মৃত্যু উপলক্ষে স্কুল কলেজ আপিস সকালে ছুটী হয়ে গিয়েচে। তাই ভাবলুম সুপ্রভাদের কলেজও নিশ্চয়ই বন্ধ হওয়াতে সে সনৎ কুটিরেই ফিরে এসেচে। ওকে পেলামও তাই। হঠাৎ আমায় দেখে খুব খুশি হোল। আমিও বড় আনন্দ পেলাম অনেক-দিন পরে ওকে দেখে। ওর দিদির দুই মেয়ে রেবা ও সেবাকেও দেখলুম। কমলা সেনের সঙ্গে আলাপ হোল। অনেকক্ষণ বসে ওদের সঙ্গে গল্প করে সাড়ে ছ'টায় উঠে গবর্ণরের বাড়ীর পেছন দিয়ে সুশীলবাবুদের বাড়ী Heath Back Cottage-এ গেলুম। সুশীলবাবু তো আমায় দেখে অবাক ! আমি কোথা থেকে এলুম শিলংএ ! শঙ্কর এলো ফুটবল খেলে সন্ধ্যার সময়। সে বড় হয়ে গিয়েচে, আর যেন চেনা যায় না।

ঝুম্ শিলংএর পাইনবনে মেঘ জমেচে ! এই সন্ধ্যায় কত দূর বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র পল্লীর কথা ভাবচি।

সুপ্রভা বলছিল, কাল আপনি ক্রাউকি পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসুন। শঙ্করও বল্লে, সে কাল সকালে এখানে আসবে। দেখি কোথায় যাওয়া যায়।

সকালে শঙ্কর এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙালে। তার সঙ্গে ওয়ার্ড লেক্ ও বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়িয়ে মোৎরা গেলুম ডাউকির মোটর কখন ছাড়ে দেখতে। শুন্লুম ও পর্যান্ত রিটার্ণ টিকিট দেয় না— সুতরাং চেরাপুঞ্জি রওনা হোলাম। আবার সেই আপার-শিলংএর রাস্তা! সেই পাইনবন পথে তিন চার রকমের বন্যফুল ফুটে আছে প্রান্তরে, একটা হল্দে, একটা ভায়োলেট, একটা লাল, একটা সাদা। ঠিক যেন মর্শুমি ফুলের ক্ষেত। সর্ব্বত্র অজস্র ফুটে রয়েচে—চেরার একটু আগে পর্যান্ত। চেরাতে নেই, মুস্‌মাইতেও নেই। যাবার সময় Gorge-এ খুব মেঘ করেছিল, খানিকদূর পর্যান্ত মনে হোল যেন আকাশে এরোপ্লেনে চলেচি। চেরার কাছে অদ্ভুত আকৃতির জঙ্গল আছে—তার প্রত্যেক গাছটাতে অসংখ্য পরগাছা, শেওলা ঝুলচে, ফার্ণ হয়ে আছে—কি ঘন কালো জঙ্গলের তলাটা! আনারস কিনে খেলুম চারপয়সা দিয়ে একটা। খাসিয়া দোকানদার কেটে প্লেটে করে দিলে। বেশ মিষ্টি আনারস। একজন ডাক্তার তার ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর মুস্‌মাই পর্য্যন্ত গেলুম বাসে। চমৎকার দিন আজ, মুস্‌মাইএর পথে নীল আকাশ একটুখানি দেখা গেল। সবাই বল্লে এত ভাল দিন অনেক-দিন হয় নি। মুস্‌মাই জলপ্রপাতের এপারে একটা পাথরে কতক্ষণ বসে রইলুম—একধারে সিলেটের সমতলভূমি ঠিক যেন সমুদ্রের মত দেখাচ্চে। একসময়ে তো ওখানে সমুদ্রই ছিল, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় ছিল প্রাচীন যুগের সমুদ্রতীর। ঢেউ এসে তাল মারতো পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে। চেরা থেকে ফিরবার পথে আবার সেই ফুলের ক্ষেত—মাঠের সর্ব্বত্র, শৈলসানুর সর্ব্বত্র ওই চার রকম ফুলের বাগান। একটা খাসিয়া গ্রামে

বাংলা দেশের গোয়ালের মত একখানা অপকৃষ্ট ভাঙা খড়ের ঘরে টুপিপরা ছেলেমেয়ে, ফর্সা মেয়েরা। বেড়ার ফর্গেট-মি-নটের বাহার দেখে মনে হোল এ কোন দেশে আছি! চেরা থেকে এসে চা খেয়ে ওয়ার্ড লেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। খুকু এতক্ষণ ঘোলার গাঙে গা ধুতে নেমেচে। আমাদের দেশে নাটাকাঁটার ফুল ফুটেছে—সে এক দেশ আর এই এক দেশ! অনেককাল আগে এই গোধূলিতে একটা স্মৃতি জড়ানো আছে, পাইনবনের মধ্যে বসে সেটা মনে আনতে বেশ লাগে। সুপ্রভাদের ওখানে গিয়ে দেখি সুপ্রভার বাবা এসেচেন সিলেট থেকে! আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ভারী চমৎকার লোক এমন সরল, সদানন্দ, অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোক আমি কমই দেখেছি। অনেকদিন পরে সুপ্রভার ছোট বৌদিদির হাতের তৈরী ভ্যানিলা দেওয়া নারকোলের সন্দেশ খাওয়া গেল।

সন্ধ্যার দেরী নেই! লুম্ শিলংএর পাইন বনে মেঘ জমেচে। পশ্চিম দিগন্তে কিন্তু অল্প একটু নীল আকাশের আঁচ—মেঘে রং লেগেচে, ওয়ার্ড লেকের ওপারে পূর্বদিকের বহু দূরের আকাশে জমেচে অন্ধকার! কেবল শুনি মোটরের ভেঁপু, কত গাড়ী যে যাচ্চে সামনে দিয়ে। খাসিয়া মেয়েরা গল্প করতে করতে যাচ্চে। গির্জ্জায় প্রার্থনা হচ্চে, সম্মিলিত ইংরিজি গানের সুর কানে ভেসে আসচে। আমি কাউন্সিল হাউসের সোপানে বসে আছি। কি জানি কেন এই সন্ধ্যায় কেবল আমাদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে। এ যেন কোথায় এসেচি, কতদূরে—সুপ্রভা না থাকলে একটুও ভাল লাগতো না। আমরা যখন পৃথিবীকে ভালবাসি বলি—তখন ভেবে দেখিনে, অনেকেই ভালবাসি খুব সংকীর্ণ অত্যন্ত প্রিয়

ও পরিচিত একটা জায়গা। সেখানকার গাছপালা, নদী, মাটি লোকজন আমার কাছে বড় আদরের—তাই তাদের পেয়ে ও ভালবেসে মনে হয় এই পৃথিবীকে বড় ভালবাসি। আসলে সেই গ্রাম বা নগরটাই আমার পৃথিবী। এমন কি রোদ বা জ্যোৎস্না সেখানে যত মিষ্টি, অন্য জায়গায় ঠিক ততটা নয়।

আজ সকাল থেকে অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, বেলা ১০টায় বৃষ্টি ধরেচে। সুপ্রভাদের হোষ্টেলে গিয়ে বল্লুম—আজই চলে যাবো। সুপ্রভা যেতে বারণ করলে, তবুও বলে এলুম না আজই যাবো। কিন্তু হোটেলে এসে আর যেতে ইচ্ছে হোল না। ভাবলুম, সুপ্রভা বারণ করলে, আজ থেকেই যাই। দুপুরে সুপ্রভার বাবা, সুপ্রভা, বীণা, রেবা দেখি একেবারে আমার ঘরের মধ্যে উপস্থিত—আমায় মোটরে উঠিয়ে দিতে। রেবা চকোলেট্ ও ফল এনেচে। ওদের সবাইকে দেখে এত আনন্দ পেলুম। তারপর সকলে মিলে গেলুম সুভদ্রাদের কলেজ ও হোষ্টেল দেখতে। নতুন তৈরী বিরাট কাঠের বাড়ী, দেখবার মত জিনিস বটে। ওখান থেকে বীণাদের বাড়ী গিয়ে চা, তালের ক্ষীর, তালের বড়া, লুচি কতরকম খাবার খেলুম। সুপ্রভার মাকে দেখে বড় কষ্ট হোল। আহা, এই বয়েসে এই শোক পেয়েছেন, তাতে মেয়েমানুষ, মনকে বোঝানো ওদের পক্ষে খুবই শক্ত। সুপ্রভার বাবাকে যতই দেখচি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি তাঁর মনের স্থৈর্য্যে ও প্রসারতায়। তিনি যত সহজে শোক জয় করতে পারচেন, সুভদ্রার মা তা পারচেন না। কাজেই তাঁর মনে কষ্ট হয়।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। চাঁদ উঠেছে মেঘের ফাঁকে, দক্ষিণ বনের মাথায়। একটা সীমাহীন নক্ষত্র মিট্‌মিট্ করচে লুম্ শিলংএর ওপারের আকাশে।

গির্জ্জা থেকে দলে দলে খাসিয়া মেয়ে-পুরুষ উপাসনান্তে বাড়ী ফিরচে। অনেকগুলি খাসিয়া মেয়ের বাঙালীদের ধরণে কাপড় পরা। তাদের দেখাচ্ছে ভালো।

শিলংএ একটা জিনিস নেই। এখানে কোন সৎপ্রসঙ্গের চর্চ্চা দেখলুম না কোথাও। না সাহিত্য, না গান, না অন্য কোন শিল্প। লোকেরা সব চাকুরীবাজ নয়তো স্বাস্থ্যান্বেষী হাওয়া খোর। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক কিম্ভূত কিমাকার ধরণের জীব। রোগের কথা, পথ্যের কথা, শরীরের উন্নতি কার কতটুকু হয়েছে এ ছাড়া অন্য বিষয়ে তারা interested নয়। আর এরা প্রায়ই ত্রিকালোত্তীর্ণ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এদেরই বড় ইচ্ছে বাঁচবার। যেন তারা বেঁচে দেশে ফিরে গেলে সোনার দেউল ওঠাবে।

পরীতলা জায়গাটা পাইন বনের মধ্যে একটা ভ্যালি। ছোট্ট ভ্যালিটা যদিও, চারিদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট পাইন শ্রেণী, মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে, বেশ সুন্দর জায়গাটা। একদিন সকালে লবানে যাবার পথে একটা উঁচু পাহাড় টপ্‌কে পাইন বনের ছায়ায় ছায়ায় সোজা রাস্তাটা দিয়ে যাবার সময় দূরে লাবান হিলের মাথায় ওধারকার পাইন বনগুলো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। মর্নিং গ্লোরি ফুল থোকা থোকা ফুটেছে লোকের বাড়ীর দেয়ালে গায়ে, মাকড়সায় বিচিত্র জাল বুনেছে।

সুপ্রভাদের বাড়ী গিয়ে রেবাকে একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করে ঠকিয়ে ছিলাম। যীশুখৃষ্ট কতদিন মারা গিয়েচেন, এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারলে না। ওকে দেশলাইয়ের বাক্সের ম্যাজিকটা দেখিয়ে [illegible] দিয়ে

দিলুম। বেলা সাড়ে ন'টা। সুপ্রভার সঙ্গে পরীতলা বেড়াতে গেলুম। একটা নদীর ধারে মাঠের মধ্যে পাইন বনে ঘেরা নির্জ্জন স্থানটিতে বসে গান শোনা গেল। তারপরে ওখান থেকে চলে এসে সেই পাহাড়টার উপর দিয়ে আসছি, রেবার দাদা আসচে, বল্লে,—কাউন্সিলে গিয়েছিল অর্থাৎ শিলং লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লিতে। একটা টিকিট দিলে আমায়। আমি গিয়ে কাউন্সিল হাউসে ঢুকলাম। একজন পুলিশ দেখিয়ে দিলে ওপরের সিঁড়িটা। ওপরের গ্যালারিতে লোকে লোকারণ্য। আইন সভার অধিবেশন হচ্ছে নীচের হলটাতে। বসন্তকুমার দাস নিচেকার উঁচু চেয়ারে ডবল কলার পরে গম্ভীর মুখে বসে। তার সামনে, ওপরে, দোতলায় পেছনে উঁচু চেয়ারে আসামের গবর্ণর রিড্ বসে। একজন কংগ্রেস-সদস্য মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। রাজস্ব-সদস্য স্যার আবদুল্লা তার জবাব দিতে উঠলেন। একপক্ষ যখন বক্তৃতা করতে ওঠে, অপর দল দেখলুম হাসি, টিট্‌কিরী সব রকম চালায়—এ বিষয়ে আইন সভা সাধারণ স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবের চেয়েও অধম।

কাউন্সিল হাউস থেকে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে মোটর ষ্টেশনে এলুম। দুটোর সময় মোটর ছাড়লো—অপরাহ্ণের ছায়ায় মোটর-রাস্তার দুধারে অরণ্য-দৃশ্য অতি সুন্দর—পাহাড়ী নদীটাই কি অদ্ভুত! ফিরে আসতে আসতে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে দেখলে মায়ের সেই কড়া খানার কথা মনে হয়। সন্ধ্যায় গৌহাটিতে নামবার পথে মনি ডাক্তারের কথা ভেবে দেখলুম—। সাহেব হাতিজোয়ার সে এতক্ষণ সেই মদের দোকানটাতে বসে পান করচে। হয়তো বেচারা এবারও বাড়ী যেতে পারে নি। সাম্‌নে সূর্য্যাস্তকে লক্ষ্য করেই যেন মোটর ছুটেচে, সামনে কামাখ্যা দেবীর মন্দির পড়ুল একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায়। সূর্য্য

এতক্ষণ হয়তো গাঙ্‌ থেকে গা ধুয়ে ফিরে এল। জঙ্গলে ভরা পোড়ো ভিটেটাতে ছায়া পড়ে এসেছে। স্টীমারে এসে ওপারের ডেক থেকে পাহাড়ে ঘেরা আধ অন্ধকার বৃক্ষপত্রের দিকে চেয়ে রইলাম কতক্ষণ, কত চিন্তা যে মনে আসে এই সন্ধ্যায়! ট্রেণে উঠে তাড়াতাড়ি শোবার ব্যবস্থা করিনি—বড়পেটা ষ্টেশন পর্য্যন্ত বসে আসামের সুবিস্তীর্ণ জলাভুমি ও ছোট ছোট গ্রাম দেখতে দেখতে এলুম। কেবলই মনে হয় ওবেলা পরীতলা ভ্যালিতে বসে সেই যে গানটা সুপ্রভা গেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের—

যৌবন সরসী নীরে

মিলন শতদল

কোন চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল

আর একটা গান—'রোদন ভরা এ বসন্ত' চিত্রাঙ্গদা গীতি-নাট্যের গানটা।

কামরূপ জেলার দিগন্তব্যাপী প্রান্তর ও জলার ওপর আকাশের ছায়া পড়েচে, সন্ধ্যা হয়ে এলেও সূর্য্যাস্তের after glow এখনও আকাশে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকচে বনে বনে। সুপ্রভা ও শিলং অনেক দূরে গিয়ে পড়েচে।

মনি ডাক্তার এতক্ষণ বাসা পৌঁছে তার সেই ছোট চালাঘর খানায় ভাত চড়িয়ে দিয়েচে। আহা, গরীব বেচারা! কত গ্রাম, কত মাঠ-ঘাট-প্রান্তর এখান থেকে বাংলাদেশের সহিত কত গ্রামের কত সুখ দুঃখ আশা নিরাশা দ্বন্দ্বের মধ্যে একখানি মাত্র ক্ষুদ্র খড়ের ঘরের জন্যে আমার সহানুভূতি এত বেশী কেন?

রাণাঘাট ষ্টেশনে পরদিন দুপুরে পৌঁছে যেন মনে হোল বাড়ী এসেচি। এখান থেকে আমার সুপরিচিত সব কিছুই। মনে হোল

উৎকর্ণ

নিবারণ গোয়ালা এতক্ষণ ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতে নেমেচে—কি জানি কেন এই চিন্তাটা মনে হয়ে বড় আনন্দ পেলাম।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে দেশে যাওয়া আমার পক্ষে একটা আনন্দজনক ব্যাপার। এই জন্মাষ্টমীর সঙ্গে আমার জীবনের অনেক শুভদিন, বিশেষ করে একটী অতীব শুভদিনের স্মৃতি জড়ানো। তাই জন্মাষ্টমী এলেই মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে দেশে যাওয়ার জন্যে। এই ক'বছর তার সুবিধা ও সুযোগও ঘটচে—১৯৩৪ সাল থেকে। এবারও কাল গিয়েচে জন্মাষ্টমী, আজ নন্দোৎসব। বনগাঁয়ে গিয়েছিলুম শনিবারে। সেদিন কি ভয়ানক বর্ষা! খানাডোবা জলে ভর্ত্তি হয়ে থৈ থৈ করচে। ওদিন দুপুরে খুব জল হয়ে গিয়েচে ওখানে। গিয়েই শুনি ফণিবাবু ওভারসিয়রের মেয়েটী সেই বিকেলে নিমোনিয়ায় মারা গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় আমরা অনেকে তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সেখানে গিয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে রইলুম। পরদিন খয়রামারির মাঠে আমার সেই প্রিয় স্থানটাতে দুপুরে গিয়ে দেখি মটরলতার ঝাড় তখনও টাট্‌কা রয়েচে, ছোট এড়াঞ্চির ঝোপগুলো বর্ষার জল পেয়ে বিষম ঝাড় বেড়েচে। বিকেলে ছ'টায় গেলুম। যাবার পথটা বড় সুন্দর লাগলো সেই ছায়াভরা বিকেলে। খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। সন্তু এসেও বসলো। কালোর মেয়েকে এনে খুকু আমার কোলে দিলে। সন্তুকে, জিগ্যেস্ করলুম—সিলেগুাইন্ মানে কি? খুকু বল্লে—আহা, ওকথা আর জিগ্যেস করতে হবে না। মিনতা বাংলাদেশের রাজধানী বলতে পারলে না—বলে খুকু তো হেসেই খুন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওদের ওখানে ছিলাম, তারপর চলে এলুন। দেবেনের ডাক্তারখানার সামনে বিশ্বনাথ আর সরোজ বসে গল্প করচে অন্ধকারে।

আকাশে একটা খড়ের বাড়ী পড়ে আছে, দাওয়ায় গরু বাছুর উঠ্‌ছে! বাড়ীটাতে কেউ নেই। দিদিদের বাড়ীও গেলাম, আগেকার দিনের মত কি আর আছে? আগে ট্রেণে যেতে যেতে দানি বাবু আমাকে সাহস দিতেন তবে যেন শ্রীরামপুরের মাটিতে পা দিতে পারতুম।

আজ সারাদিন ভীষণ দুর্য্যোগ, যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। সকালে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে গিয়ে রমাপ্রসাদের সঙ্গে গল্প করলুম তারপর স্কুল গেল ছুটি হয়ে। বৃষ্টির মধ্যে গেলুম ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সেখান থেকে প্রবোধ সরকারের দোকান হয়ে গুরুদাস চাটুয্যে এণ্ড সন্‌স ও কাত্যায়িনী বুক্ স্টল ওখানে আমার একখানা উপন্যাস 'আরণ্যক'-এর আজ কণ্ট্রাক্ট হওয়ার কথা। হয়েও গেল। ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে সুধীর সরকারের বইয়ের দোকানে এলুম ট্রামে, সেখান থেকে রমাপ্রসন্নের বাসায় এসে খানিকটা গল্প করি।

কি দুর্য্যোগ আজ! রাত্রে এখন যেন ঝড় বেড়েচে। আজ সারাদিন এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েচি।

রাত্রি ১০টা। বৃষ্টি সমানে চলচে, গোঁ গোঁ করে ঝড় বইচে। আমি ভাবচি বহুদিন আগে ১৯২৭ সালে ঠিক এই রাত্রিটিতে এই সময়ে আমি আর অম্বিকা ভাগলপুর থেকে পায়ে হেঁটে দেওঘর যেতে জামদহ ডাক-বাংলোতে কাটিয়েছিলুম। এখনও মনে পড়চে নির্জ্জন শালবনের মধ্যে চানন নদীর ধারে সেই বাংলোটী—আমি এদিকে কোণের ঘরে টেবিলের ওপর বসে ডায়েরী লিখ্‌চি, আর বাংলোর ওদিকে লছ্‌মীপুর ষ্টেটের ম্যানেজার নদীয়াচাঁদ সহায় প্রজাপত্তর নিয়ে কাছারী করচেন। এই রাত্রেই শোবার সময় আমি অম্বিকাকে বলি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিরাপদ

রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কাল লছমীপুর হয়ে কানিবেলের জঙ্গলের পথে দেওঘর যেতে হবে। তাতে প্রথমে সে ঘোর আপত্তি জানায়, শেষে রাজি হোল।

সেই ১৯২৭ সালের এই দিনটী—আর ১৯৩৭ সালের এই দিন! কত পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে জীবনে সব দিক থেকে···যদি ধরা যায় তারও আগে ১৯১৭ সালের এই সময়ের কথা···সেই মামার বাড়ীতে থিয়েটার করলুম আমি ও মেজমামা মিলে···করুণা গান গাইলে :—

আমি না তোর জান্ কলিজা
ভালবাসা গেছে বোঝা

তবে তো পরিবর্ত্তনের অনন্ত অকূলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে।

১৯২৭ সালে আমি মুক্ত পথিক, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই অপ্রত্যাশিত অজানার সন্ধানে—চোখে মায়ার ঘোর, সৌন্দর্য্যের ঘোর, এখনও আমার সে ঘোর কাটেনি বরং অনেক—অনেক ঘনীভূত হয়েচে। জীবনে তখন ছিলুম একা, এখন আরও সব অনেকে এসেছে। যেমন সুপ্রভা, খুকু, মিন্তু, রেণু—এরা সব। এই সামনের রবিবারে তো খুকুর সঙ্গে দেখা হবে ছ'ঘরেতে—তারপর ৯ই অক্টোবর সুপ্রভা আসবে শিলং থেকে। ওর মায়ের সঙ্গে কাশী যাচ্চে পূজোয় বেড়াতে—ওর সঙ্গেও দেখা হবে। তারপর আমি চাটগাঁ যাবো ইচ্ছে আছে, সেখানে রেণুর সঙ্গে দেখা হবেই। এরা এখন জীবনে এসে আমায় খুব আনন্দ দিয়েচে—তবুও দশ এগারো বছর আগেকার সেই বনে, পথে, প্রান্তরে, অরণ্যসীমায় যাপিত মুক্ত দিন রাত্রিগুলির স্মৃতি ফিরে এলে মনটা কেমন হয়ে যায়···

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান উভয় দিনের মধ্যে আমায় কত বিচিত্র অমূল্য অভিজ্ঞতা বহন করে এনে দিয়েচে। আমি সেদিক থেকে ধনী, তবুও আজ কেউ যদি বলে—সে

জীবন চাও না এ জীবন? আমি সেই জীবনে আবার এখুনি ফিরে যেতে চাই, যদি কেউ সেই দিনগুলো ফিরিয়ে দিতে পারে।

১৯৬৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবো কি? কি লিখবো সে দিনটীতে? তখন কোথায় থাকবে আজকার দিনের সঙ্গীরা? কোথায় থাকবে খুকু, সুপ্রভা?…রেণু-মা?

কে বলবে?

ভীষণ ঝড়ের রাত্রি। ঝড়ের বিরাট সোঁ সোঁ শব্দ। রাত্রে ভয়ে ঘুম হোল না মেসশুদ্ধ। রাত দেড়টা। মনে হচ্চে যেন মেসের বাড়ীটা দুলচে। এমন ভীষণ ঝড় ১৩১৬ সালের পরে আর দেখেচি বলে মনে পড়চে না তো। সারা আকাশ রাঙা ধূসর মেঘে উগ্রমূর্ত্তি, রুদ্র প্রকৃতির রক্তচক্ষু যেন মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারচে।

কাল স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েচে। অন্য অন্য বার এ সময় বাইরে যাবার জন্যে কত আগ্রহ থাকে, কত উদ্যোগ আয়োজন করি। এবার অন্য অন্য দিক থেকে আমার ব্যাপার মন্দ নয়, কিন্তু বাঁ পা-খানা হঠাৎ সেদিন বনগাঁয়ে মচ্‌কে গিয়ে এক রকম শয্যাগত হয়ে আছি—কোথাও দূরে বেড়াতে যাওয়া অসম্ভব। সেজন্য মন ভাল নয়। ভাল লাগে কি এ সময় কোথাও বাইরে যেতে না পারলে? সবাই দূরে কোথাও যাবার পরামর্শ আয়োজন করচে, সজনী ও ব্রজেনদা আজ সন্ধ্যায় চলে গেল ভাগলপুরে। সুধীরবাবু কাল রাত্রের এক্সপ্রেসে যাচ্চে হরিদ্বার ও মুসৌরী, অপূর্ব্ববাবু আজ সকালে চলে গেছেন সিমুলতলা, নীরোদ চৌধুরী গেছে রাঁচী—অশোক গুপ্ত যাচ্চে বেনারস, শচীন সরকার কাল সকালে চট্টগ্রাম যাবে, নীরদ দাসগুপ্ত তো সস্ত্রীক আগেই চলে গেছে চট্টগ্রাম—

উৎকর্ণ

আজ সুধীরবাবুদের দোকানে দুপুরবেলা বসে কেবলই শুনি ওদের টিকিট কেনার, বার্থ রিজার্ভ করার, হাওড়া স্টেশনের এন্‌কোয়ারী আপিসে ফোন্ করার বিপুল ব্যস্ততা। হৈচৈ-এর মধ্যে ওরা নিজেদের ডুবিয়ে রেখেচে —কোথাও যাবো এ আমোদটা কোথাও গিয়ে পৌছোনোর আমোদের চেয়ে বেশী—কিন্তু আমি শুধু বিষণ্ণমুখে বসে বসে ওদের আয়োজন দেখচি আর ভাবচি এবার আমার আর কোথাও যাওয়া হোল না। সুপ্রভা লিখে-ছিল ৯ই তারিখে ওরা এখানে আসবে কাশী যাবার পথে—তাও সে চিঠি লিখেচে এবার তার যাওয়া হোল না। আমার যাওয়ার মধ্যে দেখচি খালি মজিলপুরে দত্তদের বাড়ী সাহিত্য-সেবক-সমিতির নিমন্ত্রণ আছে তারা আমাকে বিশেষ করে ধরেচে যাওয়ার জন্যে—ঐ একমাত্র জায়গা যেখানে যাওয়া ঘটতে পারে, কারণ তারা মোটর পাঠাবে।

হায়, হায়, কি বিভ্রাট এবার—শিলং গেল, চট্টগ্রাম চন্দ্রনাথ গেল, কাশী গেল, হরিদ্বার গেল, মুসৌরী দেরাদুন গেল—শেষকালে কি না পুজোতে বেড়াতে যাবো জয়নগর-মজিলপুর? আরো না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

অথচ মজা এই, সকলেই বলচে আমাদের সঙ্গে এসো। সুধীরবাবুরা বলচে চলুন আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার, নীরদ দাসগুপ্ত তো কাল স্টেশনে লোক পাঠাবে, চট্টগ্রাম স্টেশনে—কারণ কাল সকালের ট্রেনে আমার সেখানে পৌছোনোর কথা পূর্ব্ব ব্যবস্থামত—অপূর্ব্ববাবু তো কাল কলেজ স্কোয়ারে সাধাসাধি আমার সঙ্গে শিমুলতলা চলুন। সজনী বলচে আসুন দু'দিনের জন্যেও ভাগলপুরে।

এমন সময়েও পা ভাঙে মানুষের?

পুজোটা এবার একেবারে মাটি হোল। অগত্যা কাল দেশেই চলে যেতে হবে।

কাল পর্য্যন্ত ভেবেছিলুম কোথাও যাওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পা অনেকটা সেরে উঠলো। রাত্রিটা বসে বসে ভাবলুম কোথাও যাবো না, এটা কি ঠিক? চাটগাঁতেই যাওয়া যাক্। সকালে উঠে স্টেশনে এসে দেখি চাটগাঁয়ের একটা স্পেশাল ট্রেণ ছাড়চে। শচীনবাবুও যাচ্চে সেটিতে। বেজায় ভিড় এমন কিছু নয়—তবে ভিড় দেখলুম স্টীমারে ও চাঁদপুর ট্রেণে বসে, শোওয়া তো দূরের কথা, কাৎ হবার জায়গা নেই। তার ওপরে এক এক স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় আর ছাড়তে চায় না—বিষম বিরক্তির ব্যাপার! চাটগাঁয়ে এসে নীরদবাবুর বাসা খুঁজে না পেয়ে রেণুদের বাড়ীতে এলুম। রেণু তো অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় দেখে খুব খুশি। ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে। রেণুর দাদা এল, মা এলেন। সবাই খুশি আমায় দেখে। রেণু বাক্স থেকে কাপড় বের করে কুঁচিয়ে নীচে নিয়ে গেল স্নানের জায়গায়। স্নান করে খেয়ে ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা গল্প করি। ষোল বছর আগে এদের বাড়ীতে এসেছিলুম—আর এই এখন ষোল বছর পরে। আজ চাটগাঁয়ে বড় গরম, হ্যাভন্ পার্কে আমি রেণুর দাদার সঙ্গে গিয়ে বসলুম—বেজায় ধূলো চাটগাঁয়ের রাস্তায়। নবগ্রহ বাড়ীতে সপ্তমী পূজোর ঢাক বাজচে। একটা বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করলুম। এবার আর হবে কি না কে জানে?

সন্ধ্যার সময় রেণু এসে বসে কত গল্প করলে।

ওবেলা দুপুরে খাওয়ার পরে একটু ঘুমুবো বলে শুয়েছি—রেণু এসে গল্প করতে লাগলো, ঘুম চটে গেল। ও চলে গেলে ঘুমুবার চেষ্টা করতেই ঘুম এল। ও কখন চা এনে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমায় ডাকে নি। সেই সময় আমায় একটু নড়তে দেখে বল্লে—উঠবেন না? চা এনেচি কিন্তু

আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আমি আর ডাকিনি। চা খাবেন আসুন উঠে।

নীরদ বাবুদের বাসা খুঁজে পেলুম না বটে, কিন্তু সেজন্যে আমার কোনো কষ্ট নেই। এদের আতিথ্যে যত্নে, সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েচে।

সকালে রেণুদের বাড়ীতে যখন আজ ঘুম ভাঙলো তখন জানালার ধারে শুয়ে দেখি রাঙা রোদের আভাস পূব আকাশে। পরিষ্কার দিনের অগ্রদূত এই অরুণ বর্ণ উদয় দিগন্তের। ভাবচি—আমি কি বনগাঁর বাসায়? চাটগাঁয়ে এদের বাড়ীতে ষোল বছর পরে এসেচি, এ যেন স্বপ্ন। সেবার যে সেই এদের বাড়ী থেকে অন্নদা বাবুর সঙ্গে ফেণী চলে গিয়েছিলুম—তারপর পৃথিবীতে যুগ পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে। হাওড়ার পুলের নীচে দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে। তখনকার দিনের জীবন আর এখনকার জীবন! সেই আমি আর এই আমি? তারপর ঘটেচে ঢাকা, বর্দ্ধমান, বিভূতি, হরকু, চরি, ইসমাইলপুর, গোটা ভাগলপুরের জীবনটাই। তারপর আমার সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ—স্কুল, কত নতুন বন্ধু লাভ, সুপ্রভা, খুকু ওরা সব। জীবনের চলমান স্রোতে কোথা থেকে কোথায় ভাসিয়ে এনে ফেলেচে ছাখো!...

রেণু চা নিয়ে এল। বুদ্ধু বল্লে—আজ চন্দ্রনাথে চলুন।

বেশ যাবো। কখন গাড়ী আছে ছাখো।

সাড়ে দশটায় গাড়ী।

সওয়া দশটা বেজে গেল বুদ্ধুর দেখা নেই। কোথায় বাইরে গেছে।

আমি একলা স্টেশনে এলুম—ফেরিওয়ালা বিক্রী করচে—চাই বনরুটি

হেঁকে—বলবাশিংস্থু! আমি ভাবি 'বলবাশিংস্থু'টা কি জিনিস? চাটগেঁয়ে কোনো খাবারের নাম নাকি?

চাই বলবাশিংস্থু…বলবাশিংস্থু…

কান পেতে শুনে বুঝলুম লোকটা আসলে বলচে—ভাল পাশিং শো! চাটগেঁয়ে 'ও'-কারান্ত শব্দের উচ্চারণ করে 'উ'-কারান্ত শব্দের মত। জ্যোৎস্নাকে বলবে জুৎস্না। 'শো' হয়ে গিয়েচে 'শু'।

যাক্। চন্দ্রনাথে এসে নামলুম বেলা বারোটা তখন। ঝম্ ঝম্ করচে দুপুরের রোদ। নীল ইস্পাতের মত আকাশ। একা হেঁটে ভাঙা পা নিয়ে পাহাড়ে উঠচি। পায়ের ব্যথা এখনও সারেনি—এখনও বেশ খচ্ খচ্ করে হাঁটতে গেলে। বিরূপাক্ষ মন্দির থেকে যাত্রীদের দল নামচে। দুপুরে ঘেমে নেয়ে উঠচি। বিরূপাক্ষ মন্দিরে উঠতে বাঁ ধারে বনের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ আছে—সেইটে ধরে চললুম। বড় নির্জ্জন রাস্তাটা। হঠাৎ বাঁ দিকে চেয়ে দেখি সমুদ্র দেখা যাচ্চে! পাহাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে সরু পথটা বনস্পতি-সমাকুল ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে উঠে নেমে ঊনকোটি শিবের গুহা বলে একটা ছোট্ট গুহার কাছে গিয়ে শেষ হয়েচে। ঘামের উপদ্রবে দুবার এর মধ্যে গাছের ছায়ায় শিলাখণ্ডে বসেচি। একটা বনকলার পাতা হাতে নিয়েচি—যেখানে সেখানে সেটা পেতে বসচি। ঊনকোটি শিবের গুহা দেখে ফিরবার সময় একটা ছোট ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। পেছনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, ঘন জঙ্গলাবৃত—ঝর ঝর ঝরণার জলের তোড়ের শব্দ পাচ্চি—একটা কি পাখী ডাকচে, ঠিক যেন ঘণ্টা বাজচে। সামনে সমুদ্রের দৃশ্য। সমুদ্রের দিক থেকে মাঝে মাঝে বেশ হাওয়া বইচে—এই ভীষণ গরমে ও রোদে সে ঝিরঝিরে হাওয়াতে যেন সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। ডাইনে একটা উঁচু

চূড়ায় একটী মাত্র নির্জ্জন বনস্পতি অত উঁচুতে সুনীল আকাশের নীচে একটা অসাধারণ ছবির সৃষ্টি করেচে। সুন্দর, কিন্তু যেন অবাস্তব। অত উঁচুতে কি গাছ থাকে ?

ফিরবার পথে সেই ঝরণার ধারে বসলুম। যেমন বড় বড় গাছ জায়গাটাতে, তেমনি বড় বড় শিলাখণ্ড। সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠলুম—ওপরে বিশাল অরণ্য—regular mountain forest—বেশীদূর উঠতে সাহস হোল না এই মচকানো পা নিয়ে—পথটাও জনহীন, শুনেচি চন্দ্রনাথে বাঘ আছে। নেমে আসবার পথে প্রথমে বসলুম সিঁড়িটার ওপরে—মাথার ওপরে চূড়ার পাশে বনের গাছপালা—তার মাথায় চিল উড়চে, দূরে সমুদ্র বেঁকে গিয়েচে। ওই সমুদ্রের দূর গায়ে বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামের বকুলতলার কথা মনে হোল। মহাষ্টমী আজ, গ্রামে গ্রামে কত প্রতিমা, কত উৎসব !

সমুদ্রকে সামনে করে একটা আমলকী গাছে ঠেস্ দিয়ে পড়ন্ত বেলায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। চন্দ্রনাথ পাহাড়কে কতভাবে যে দেখলুম আজ! এক এক জায়গায় এর এক এক রূপ, নামবার পথে সেই ঝরণাটার ধারে ঘন ছায়ায় আর একবার খানিকটা বসলুম, বিকেলের ঘন ছায়ায় এই বনের দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে। সেই যে নীচের পুলটাতে ষোল বছর আগে রোজ সন্ধ্যায় বসতুম এখানে থাকতে—সেইটাতে ঠিক সন্ধ্যার সময়েই আজ বসলুম। আবার এই ষোল বছরের অতীত ঘটনাবলী মনের মধ্যে একে একে উদিত হোল। পরিবর্ত্তন …পরিবর্ত্তন…একেবারে আমি নতুন মানুষ এখন। সে আমিই নেই। শম্ভুনাথের মন্দিরের ডাইনের ঘন বনের রাস্তাটী দিয়ে নামলুম। বনের মাথায় মাথায় শাদা শাদা যেন অনেকটা কাপাস তুলোর ফুলের

মত ফুল ফুটে আলো করে রেখেচে। আরও অনেক রকম ফুল দেখলুম।

ফেরবার পথে অখিল চক্রবর্ত্তীর এক ভাই-এর সঙ্গে দেখা। অখিল সেবার আমার পাণ্ডা ছিল ষোল বছর আগে যখন চাটগাঁ এসেছিলুম। তাদের সে বাড়ীটাও দেখলুম। একটা ছোট্ট মেটে বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করলুম। তখন ছায়া ঘন হয়ে এসেচে। মাটীর উঠান ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পেছনে বাঁশের ছেঁচার বেড়া ও বেতবন, ছোট্ট প্রতিমাটী, কতকগুলি গ্রাম্য নরনারী প্রতিমা দেখতে এসেচে, ট্যাং ট্যাং করে ঢোল বাজচে। ওখান থেকে বার হয়ে স্টেশনের কাছে এক বড় পূজার বাড়ীতে মহাষ্টমীর আরতি দেখলুম। সুপ্রভাদের বাড়ী পূজো আছে, সে-ও এমন সময় হয়তো আরতি দেখচে দাঁড়িয়ে—খুকুও।

ট্রেণ এল। অখিল চক্রবর্ত্তীর ভাই আমার টিকিট কিনে ট্রেণে তুলে দিয়ে গেল। কতকথা ভাবতে ভাবতে চাটগাঁয়ে এলুম। এসে ওপরে বসেচি, রেণু তখনি এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এসে হাতে দিলে। তারপর চন্দ্রনাথ ভ্রমণের গল্প করি বসে। সবাই এক সঙ্গে খেতে বসলুম রান্নাঘরে নেমে—রেণু আমি, বুদ্ধু ও বুদ্ধুর মামা। বুদ্ধুর মামা চন্দ্রনাথের এক পাণ্ডার কীর্ত্তিকলাপ বলতে লাগলো।

ডায়েরী লিখবার সময় বসে বসে ভাবলুম দশমীর দিন দেশে কাটাবো।

এবার পাঁচ দিন পূজো—তাই আজও মহাষ্টমী। আজ সন্ধিপূজা। কাল রাত্রেই সঙ্কল্প করেচি যে যখন এবার পাঁচ দিন পূজো—তখন দেশে বিজয়া দশমী কাটাতে হবে। সকালে উঠে বাইরের ঘরে বসেচি—রেণু এসে বল্লে, বাতাবি নেবু খাবেন? একটা ফিরিওয়ালার কাছে বাতাবি

লেবু কিনে বাড়ীর মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল একটা প্লেটে করে। বল্লে—লেকে বেড়াতে যাবেন তো? আমি যাবো আপনাদের সঙ্গে।

দুপুরে খুব ঘুমিয়ে উঠলুম আজ রাত্রে ট্রেণে জাগতে হবে বলে। মোটর এল, রেণুর দাদা, আমি, রেণু বেরিয়ে পড়লুম। সহর ছাড়িয়ে ছোট ছোট পাহাড়, বন্য কাঁটাল গাছ—কেলে কোঁড়া লতা এত দূরেও দেখে অবাক হয়ে গেলুম। হ্রদটি জঙ্গলে ভরা, পাহাড় বেষ্টিত, বৃষ্টি পড়তে লাগলো—রেণুকে ছাতি দিলুম, সে কিছুতেই খুলবে না। জোর করে খোলালুম। একটা পাহাড়ের ওপর উঠলুম সমুদ্র দেখবো বলে, কিন্তু সামনে আর একটা পাহাড় দৃষ্টি আটকেচে।

বাড়ী ফিরে আমি বিছানাপত্র বেঁধে নিলুম। আমি, বুদ্ধু, রেণু এক সঙ্গে খেতে বসলুম ওদের রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে। গাড়ী এল। রওনা হলুম স্টেশনে। সঙ্গে একজন লোক এল বুদ্ধু তাকে পাঠিয়ে দিলে। তাকে কিছু বখসিস্ দিলুম। ফেরিওয়ালা হাঁকচে—চাই বলবাশিংসু···

• — •

ঘুম হয়নি ট্রেণে, যদিও শুয়েই এসেছিলুম। লাকসাম জংসন ছাড়িয়ে একটুখানি শুয়েচি—অমনি উঠে দেখি চাঁদপুর ঘাট। স্টীমারে এসে বেশ জায়গা পেলুম। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। রাজাবাড়ী, তারপাশা, মৈনট্ কত কি স্টেশন। ওই ঝড় বৃষ্টিতে যখন নৌকো করে খাবার বিক্রী করতে আসচে জলের ঝাপটায় ওদের ধারে যাবার যো নেই। বড় বড় নৌকো করে যাত্রীরা বাক্স বিছানা, মোট পুঁটুলি নিয়ে ছাতি মাথায় ভিজতে ভিজতে তীরে যাচ্ছে স্টীমার থেকে। বড় বড় চর, কাশবন। চরের মধ্যে লোক বাস করেচে। স্টীমার খুব বেগে যাচ্ছে। কিন্তু সারা-দিনের মধ্যে বৃষ্টি থামলো না। একঘেয়ে বসে বসে ভাল লাগচে না।

উৎকর্ণ

বেলা চারটার সময় গোয়ালন্দ ঘাটে স্টীমার এসে লাগলো। ভাবলুম নিজের দেশেই যেন এলুম। এই তো গোয়ালন্দ পোড়াদহ এলুম তো নিজের দেশ আর কতটুকু ?

কলকাতা নেমে দেখি টকু আমার বাসায় বসে আছে। সে কলকাতা বেড়াতে এসেচে। আমি ট্রামে বিভূতিদের বাড়ী গেলুম। মন্মথ এসে বল্লে না খেয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু। খেতে রাত বারোটা হয়ে গেল। তখনও পথে ঘাটে মেয়েছেলের হাত ধরে লোকে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্চে।

সকালে উঠে বাগবাজারে গেলুম পশুপতি বাবুদের বাড়ী নীরদ বাবুদের কি হোল সে সন্ধানে। বাড়ীতো গেলুম, গিয়ে শুনি নীরদ বাবুরা গিয়েছেন গালুডি। সেখানে চা খেয়ে বৌঠাকুরুণের সঙ্গে গল্প করি। বৌঠাকরুণ ৺বিজয়ার প্রণাম সারলেন বিসর্জ্জনের আগেই পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে। আমিও তাই করি। বগলা এল, তার সঙ্গে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব দেখতে গেলুম বাগবাজারে। প্রতিমা বড় সুন্দর হয়েচে। দুজন ছেলের সঙ্গে বগলা আলাপ করে দিলে এবং তাদের দেখিয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললো। তাকে কমল যেতে লিখেচে ঘাটশিলায় তার সঙ্গে সুবর্ণরেখার ধারে বসে কাব্যালোচনা করবে বলে মহা উৎসাহে চলেছিল কিন্তু ট্রেন ফেল করলে। আমি ওখান থেকে বাসায় এসেই ট্রেনে বনগাঁ রওনা হলুম।

দুপুরের পর এসে বনগাঁয়ে পৌঁছুই। প্রফুল্লদের বাড়ী ঠাকুর বরণ হচ্চে আমি, বীরেশ্বর বাবু, যতীনদা, মনোজ সবাই সেখানে গিয়ে বসি। একটু পরে বেলা পড়লে আমি ঘোড়ার গাড়ী করে বারাকপুর গেলুম

বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখবো বলে। কতকাল দেখিনি গ্রামের মেলাটা। এবার যখন আছি দেশে, তখন একবার যাবার খুব ইচ্ছে হোল। পথে খুব ভিড়, চালকীপোতা চাঁপাবেড়ে থেকে বিজয়ার মেলা দেখতে আসচে লোকে বনগাঁ। চাষার মেয়েছেলেরা রঙীন্ কাপড় পরে আসচে। এই জোড়া বটতলা, এই রায়দের বড় বাগান—গ্রামে পৌঁছে গিয়েছি, আমাদের গাঁ!...কোথা থেকে কোথায় এসেছি ছাখো!

বাঁওড়ের ধারে ছেলেবেলাকার মতই মেলা বসেচে। গোপালনগরের হাজারি ময়রা পাঁপর ভাজচে, বাসন-বেচা কুণ্ডু পানের দোকান খুলেচে, গ্রাম্য নরনারী ছেলেমেয়ের ভিড় খুবই। বাঁওড়ে দশ পনেরো খানা নৌকার বাচ্ খেলা হচ্চে। শ্যামাচরণ দা, ফণিকাকা, সাতুকাকা, বৃন্দাবন—এদের সঙ্গে দেখা হোল। অমূল্য কামারের ছেলে এসে হাত ধরে বল্লে—কাকা, একটা পয়সা দিন না, পাঁপর ভাজা কিনবো। রায়দের বাড়ীর ছেলেরা অমনি ঘিরে দাঁড়ালো আমাদেরও দিন। প্রকাণ্ড বড় বটতলায় মেলা হয়। ছায়া পড়ে এসেচে ঘন হয়ে। আমি যেন স্বপ্ন দেখচি। কোথায় চট্টগ্রাম, রেণু—কোথায় মেঘনা আর পদ্মা, কুমিল্লা জেলা, নোয়াখালি জেলা আর কোথায় দাঁড়িয়ে আছি একেবারে আমাদের গ্রামে, বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখচি।

সন্ধ্যা হয়ে আসচে, মেলার জায়গা থেকে বুড়ীর বাড়ী এলুম। বুড়ীকে কিছু দিলাম বিজয়ার দিন—সে তো আমায় দেখে কেঁদেই আকুল। এখন যেন আর ভাল চোখে দেখতে পায় না,—বড্ড বয়েস হয়ে গিয়েচে। পুঁটি দিদিদের বাড়ী এসে দেখি বিলবিলের ধারে বসে পুঁটি দিদি বাসন মাজচে। খুকুদের বাড়ীটা শূন্য পড়ে রয়েচে। ন'দিদিদের সঙ্গে দেখা করলুম—তারপর সকলকে বিজয়ার প্রণাম্ করে কিশোর কাকার বাড়ী এলুম।

কিশোর কাকা কিছুতেই ছাড়লেন না, বসিয়ে একটু জলযোগ করালেন। কতদিন কিশোর কাকার বাড়ী বসে বিজয়ার দিন জলযোগ করিনি। তারপর অশথতলাটায় দাঁড়িয়ে একবার ভাবতে চেষ্টা করলুম কালও ছিলুম পদ্মার ওপরে স্টীমারে—রাজাবাড়ী, বিক্রমপুর এপারে—ওপারে ফরিদপুর কোথায় সেই চন্দ্রনাথে পাণ্ডার বাড়ীতে সেই ছোট্ট প্রতিমা খানা, সেই আমলকী গাছে ঠেস্ দিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকা—আর কোথায় আমার বারাকপুরের হেলা কাঁটালতলা!

চলে এলুম গাড়ী করে বনগাঁয়ে। হরিবাবুর বাড়ী, পটোলের বাড়ী, বীরেশ্বর বাবুর বাড়ী বিজয়ার প্রণাম, আলিঙ্গন সেরে ফেললুম। সুপ্রভা-দের বাড়ীতে তারাও আজ এমনি বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ করচে পরস্পরে। খুকু—সুপ্রভা—রেণু—ওদের সকলকেই মনে মনে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিই।

এবার ভারী চমৎকার পুজো কাট্‌ল। সপ্তমীতে প্রতিমা দেখলুম চট্টগ্রামে, অষ্টমীতে চন্দ্রনাথে, নবমীতে কলকাতার বিভূতিদের বাড়ী, দশমীর প্রতিমা বনগাঁয়ে ও বারাকপুরে। আর কোথাও যাবো না। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে—ঘোড়ার গাড়ী যেন চলেচে ঘন বনবীথির মধ্যে দিয়ে বনগাঁয়ে। আমি বসে বসে চাটগাঁয়ের কথা, পথের কথা ভাবচি। সুপ্রভার কথা ভাব্‌চি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না, কি সুন্দর রাত্রি! বনপুষ্পের জ্যোৎস্নামাখা সুবাস সন্ধ্যার হিম বাতাসে।

আজ দিন দশ-বারো এখানে এসেচি। ক'দিন খুবই ভাল লেগেছিল—এখনও লাগচে মন্দ নয়। বৈকালে কুঠীর মাঠের সেই জলাটার

ধারে বেড়াতে যাই—বনে ঝোপে সর্ব্বত্র বনমরচে ফুলের সুগন্ধ। ওই-খানের ঝোপগুলোতে কেলেকোঁড়া আর কেঁয়োঝাঁকার ফুল ফুটে গন্ধে আমোদ করেচে—বিশেষ করে কেঁয়োঝাঁকার ফুল। কুঠীর মাঠের দিকে বনমরচে লতা বেশী নেই। রোদ রাঙা হয়ে আসে, তখনও পর্য্যন্ত বসে থাকি, আজ আবার এক রাখাল ছোঁড়া জুটে গল্প করে আমার চিন্তার ব্যাঘাত করতে লাগলো। ফিরবার সময় আটির মাঠ দিয়ে গিয়ে বাঁওড়ের ধারের পথে পড়ি ও গোসাঁইবাড়ীর সামনে দিয়ে বাড়ী ফিরি। আজ কি চমৎকার রাঙা মেঘ করেছিল সন্ধ্যার কিছু আগে! আমি গায়ের চেক্ চাদরখানা পেতে কতক্ষণ মাঠের মধ্যে বসে রইলুম ভূষণো জেলের কলাবাগানের পাশের জমিতে। এক পাশে আটির ডাঙায় নিবিড় বন, সামনে মুক্ত মাঠে বৈকালের ঘন ছায়া, মাথার ওপরে আকাশে ময়ূরকণ্ঠী রং, চারিধারে রাঙা মেঘের পাহাড়পর্ব্বত—যেন উঠতে ইচ্ছে করে না। সুপ্রভা কাল যে রুমাল ও বালিশ ঢাক্‌নিটা পাঠিয়েছে, তার সঙ্গে চিঠি ছিল, কাল তো নদীর ধারে মাঠে বসে হাট থেকে এসে পড়েছিলুম, কিন্তু সন্ধ্যার ধূসর আলোয় ভাল পড়তে পারি নি, আজও সেখানা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম। খুকু এবার এখানে নেই, সদাসর্ব্বদাই তার কথা মনে হয়—দুপুরে সে যেন পাশের পথটা দিয়ে-আসচে। এসেই বলচে—কি করচেন? চার পাঁচ বছর পরে এই প্রথম দীর্ঘ অবসান· আমি বারাকপুরে কাটাচ্ছি, যখন ও এখানে নেই। সেইজন্যেই এখনও ওর অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি মন।

ন'টার গাড়ী যাওয়ার শব্দ পাচ্ছি, নিজের খড়ের ঘরটায় বসে আলো জ্বেলে ডায়েরীটা লিখ্‌চি। এখনও মশারীর মধ্যে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বাললে গরম বোধ হয়—অথচ মশা এমন যে মশারী না খাটিয়ে লেখাপড়া করার

যো নেই রাত্রে। দিনটা এখানে বেশ কাটে, রাত্রে অন্ধকার আর নির্জ্জনতায় যেন হাঁপ লাগে। কারো বাড়ী গিয়ে একটু দুদণ্ড গল্প করবো এমন জায়গা নেই। পচা রায় ছিল, সে ডাক্তারী করতে গিয়েছে শুনচি আনন্ডোরে।

আমাদের বাড়ীর পেছনের ওই বাঁশবাগানটায় যে ডোবা আছে, আজ দুপুরে শুকনো বাঁশের খোলা পেতে রোদে ওখানে খানিকটা বসে ভারী ভাল লাগলো। ঘন বাঁশবন চারিদিকে বনমরচে ফুলের ঘন সুগন্ধে আমোদ করেছিল দুপুরের বাতাস—বরোজপোতার ডোবার ওপারে কখনো বসে দেখিনি কেমন লাগে। জায়গাটা বড় চমৎকার।

কুঠীর মাঠের অনেক বন কেটে ফেলেচে দেলেডাঙার চাষারা। ওরা এবার অনেক জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করচে। কুঠীর মাঠের বন আমাদের এ অঞ্চলের একটা অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু কাকে তা বোঝাবো!

আজকাল বনে জঙ্গলে মাকড়সার নানা রকম জাল পাতা দেখি—দু' তিন বছর থেকে আমি এটা লক্ষ্য করচি। জাল গড়বার কৌশল ও বৈচিত্র্য আমায় বড় আনন্দ দেয়—কিন্তু আজ সকালে কুঠীর মাঠে একটা জাল দেখেচি, যা একেবারে অপূর্ব্ব। ঘাসের মধ্যে দুটী দুর্ব্বাঘাসের পাতায় টানা বাধা ঠিক একটী এক-আনির মত একটা মাকড়সার জাল। মাকড়সাটা প্রায় আণুবীক্ষণিক, তাকে খালি চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব—একটা ঘাসের পাতা ধরে একটুখানি নাড়া দিতে একদিকের জাল যেন একটু নড়ে উঠ্‌ল—কি যেন একটা প্রাণী নাড়াচড়া করচে সেখানটাতে। ওই এক আনির মত ছোট্ট জালটুকুই ওর জগৎ।

উৎকর্ণ

ন'টার গাড়ীতে রাণাঘাট গেলুম অবণীবাবুদের বাড়ী। অমৃত কাকা সঙ্গে গেলেন। বৈকালে ওখান থেকে বন্ধুর শ্বশুরবাড়ী। বন্ধুর স্ত্রী এখানেই আছে। রেলবাজারে নীরুর সঙ্গে দেখা তার মুখে শুনলুম শিবু এখানে নেই। গোপালনগর নেমে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমি ও নন্দ ঘোষ বাজার পর্য্যন্ত এলুম। যুগলের দোকানে ভাগ্যিস্ বুদ্ধি করে লণ্ঠনটা রেখে গিয়েছিলুম ওবেলা!

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে সেই ঝোপটার পাশে ঘন অপরাহ্নের ছায়ায় ঘাসের ওপর একটা মোটা চাদর পেতে বসে, 'কেয়োঝাঁকা' ফুলের সুঘ্রাণের মধ্যে 'আরণ্যক'-এর একটা অধ্যায়ের খসড়া করছিলুম। কি নীরব শান্তি, কি পাখীর কাকলী, কি বনফুলের ঘন সুবাস! নানারকম চিন্তা মনে আসে ওখানে নির্জ্জনে বসলে, আমি দেখেচি ঘরের মধ্যে বসে সেরকম খুব কম হয়। মনের আনন্দই তো সৃষ্টির গোড়ার কথা—দুঃখও বটে—কারণ আসলে অনুভূতির গভীরতাটাই আসল, দুঃখেরই হোক বা আনন্দেরই হোক্। আজ সকালেও বেলেডাঙার বটতলার পথটাতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, মাঠের মধ্যে সেই যে একটা ঝোপ আবিষ্কার করছিলাম সেবার—তার পথটা বুঁজে গিয়েচে সেঁয়াকুল-কাঁটায়, ঢুকতে পারা গেল না। নদীতে নেমে সাঁতার দিয়ে গিয়ে উঠলাম রায়পাড়ার ঘাটে।

সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে বসে লিখচি, শিবুদের বাড়ী কলের গান হচ্চে দেখে শুনতে গেলাম। এইমাত্র ফিরচি। অন্ধকার রাত, অন্ধকার আকাশে কি অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়। কত জগৎ, কত পৃথিবী—Jeans, Eddingtonদের ও কথাই মানিনে যে এই পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও

মানুষের বাসের উপযুক্ত গ্রহ বা নক্ষত্র নেই। এই রকম পরিচিত গ্রামের পথ, ওই যে বকুলতলাটা, শিউলিতলাটা—যা কত দিনের স্মৃতিতে মধুর—আর কোথাও বিশ্বে এমন নেই—স্রষ্টা বুঝি দেউলে হয়ে পড়েছিলেন কায়ক্লেশে পৃথিবীকে তৈরী করেই ?

সে অনন্ত, বিরাট দেবতাকে প্রণাম করি। কে-ই বা তাঁকে চেনে, বোঝে বা জানে। যাঁরা জেনেছিলেন, তাঁরা কাউকে বলে বোঝাতে পারেন নি বা সে চেষ্টাও বোধহয় করেননি—অসম্ভব বলেই করেন নি—সাধারণ লোকের জন্যে কতকগুলো মিথ্যে মনগড়া ফাঁকির সৃষ্টি করে গিয়েচেন।

আজও বিকেল তিনটার সময় কুঠীর মাঠের জলার ধারে সেই ঝোপটাতে এসে বসে 'আরণ্যক'-এর একটা অধ্যায় লিখচি। লেখবার জন্যেই এই জায়গাটাতে এসেচি। ভারী সুন্দর বন কুসুমের গন্ধটা—চাঁপা ফুলের গন্ধটাই বেশী। আমার মাথার ওপরে থোকা থোকা ফুলে ভরা ডালটা দুলচে, এখন রোদ রাঙা হয়ে এসেচে যখন এটা লিখচি, জলার পাখীর দল কি অবাধ কূজন সুরু করেচে, গন্ধটা আরও ঘন হয়েচে। ওপারে গাছগুলোর বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরণের শীর্ষদেশে রাঙা রোদ পড়ে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে! পাখীর দল উড়ে যাচ্চে। এইখানে বসে সুপ্রভার ৺বিজয়ার চিঠিখানা পড়ছিলুম আজ। এখানেই লেখা বন্ধ করি। সন্ধ্যা হয়ে এল। জগোদের নিয়ে হাজারির ওখানে গোপালনগরে কালীপূজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে সন্ধ্যার পরেই।

উঠে বাড়ী এসে জগো ও জিবুকে নিয়ে প্রথমে গেলুম বুড়ার বাড়ী। বুড়ী উঠতে পারে না, তাকে দেখে শুনে গোপালনগর গেলুম। দারিঘাটা পুলটার ওপর থেকে ছায়া পথটা কি চমৎকার দেখাচ্ছিল! কত নক্ষত্র,

অসংখ্য, অসীম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম পুলের ওপরে। হাজারিদের বাড়ীতে কালীপুজোতে প্রতি বৎসরই আনন্দ উৎসব হয়। এবার জীতেন, সুধীরদা ছিল—চট্টগ্রাম ভ্রমণের গল্প করলুম ওদের কাছে। বাড়ী ফিরতে হয়ে গেল রাত এগারোটা। নক্ষত্রদের জ্যোতি আরও ফুটেচে। কালপুরুষ ন' দিদিদের উঠোনের ওপারেই উঠে এসেচে। আজ যে নক্ষত্রসংস্থান এই কালীপুজোর রাতে পঞ্চাশ বছর আগেও এমনি উঠতো, আমার ঠাকুরদাদা যখন শিশু তখনও এম্‌নি উঠেচে, দুশো বছর আগে যখন শাঁখারী পুকুরের ধারে বদ্ধিষ্ণু শাঁখারীর বাস ছিল তখনও এমনি উঠতো। আবার পঞ্চাশ বছর কি দুশো বছর পরে ঠিক এমনি দিনে এমনি কালীপুজোর রাতে ওরায়ন ন'দিদিদের বাড়ীর উঠোনের ওপরে এমনি উঠবে—কিন্তু তখন পাশের বাড়ীর পথটা দিয়ে বিলবিলের পাশ দিয়ে খুকুও অমন আসবে না—কে কোথায় চলে যাবে। নতুন দল তখন আসবে পৃথিবীতে—তাদের হাসি কান্না প্রেম ভালবাসায় মুখর হয়ে থাকবে গ্রামের বাতাস।

কাল এখান থেকে চলে যাবো। পূজোর ছুটী ফুরিয়ে গেল। এবার খুকু ছিল না, তা হোলেও কেটেছিল বেশ। বৈকেলে প্রায়ই কুঠীর মাঠে বনে ঝোপের ধারে বসে বিকেলটা কাটাতুম—ভারী আনন্দ পেতাম। এখন রাত্রি দশটা, আমার ঘরে নির্জ্জনে বসে লিখচি। পটী দিদি মাঝের গাঁ থেকে এসেচে, আমার জন্যে একটা ভাঁড়ীর ফুলের ডাল এনেচে ফুল শুদ্ধ। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ী বসে একটু গল্প করে এলুম। কাল গ্রাম ছেড়ে যাবো, সকলের জন্যেই কষ্ট হচ্চে। গঙ্গাচরণ মন্টু রায়েদের বাড়ী বসে ভাঙা হারমোনিয়ম বাজিয়ে বেসুরো গলায় সেকেলে যাত্রা

দলের গান গাইচে ; মনে হচ্চে আহা, ওই একটু গিয়ে বসে শুনে আসি। এদের সকলের জন্যেই কষ্ট হয়। গ্রামের এই সব লোক দরিদ্র, অশিক্ষিত ওদের জীবনে কোনো আমোদ প্রমোদ নেই—জগতের কিছু দেখেও নি, শোনেও নি। সকলের জন্যেই মন কেমন করে। মনু রায়েদের বাড়ী মেয়েরা বাস-আঁচড়ায় গিয়েছিল কালীপূজো দেখতে—এখন সব গরুর গাড়ী করে বাড়ী এল।

শীতে জেলের নৌকোয় বিকেলে বনগাঁ এলুম। বেলা তিনটার সময় বেরিয়েছি, গাজন বাঁশতলার ঘাটে মাছ ধরচে, ফণিকাকা মাছ ধরচে চটকাতলার নীচে। চালকীর ঘাটে একটা লোক ছিপে প্রকাণ্ড কাছিম বাধিয়েছিল, আমরা নৌকা নিয়ে কাছে গেলাম, সুতো কেটে নিয়ে কাছিমটা গেল পালিয়ে। সীতানাথ মাঝি বিশ বছর আগে নেপাল মাঝির নৌকোয় ভোলা ও বরিশালে গিয়েছিল—সে গল্প করতে লাগলো ওর নৌকোতে কাজ করতো বাদুড়ে থেকে থাবার জন্যে চাল ডাল কিনতো। নলচিটিতে সুপুরি কিনে বিক্রী করতে করতে বনগাঁ পর্য্যন্ত আসতো—ওখানে সব বিক্রী হয়ে যেতো। নৌকোতে মধু ছিল—চালতে-পোতার বাঁকে ছায়াভরা সেই সুন্দর বন ঝোপের কাছে এসে সে নৌকার দাঁড় বাওয়া রেখে তামাক সাজতে বসলো। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, দুধারে বড় ঝোপ, সাঁই বাবলা বনের অপূর্ব্ব শোভা পূজোর ছুটিটা বারাকপুরে বেশ কেটেচে, পরাজপোতার ডোবার ও পাড়ের কথা এখনও ভুলতে পারচি নে। ওই বাঁশবাগানটায় কি যে একটা মায়া আছে! তারপর সাজিতলার বনটা এবার নতুন আবিষ্কার। সকলের চেয়ে আমার ওইটাই লেগেচে ভালো। কুঠীর মাঠের জলার ধারে ওই ডাঙাটা।

সবই ভাল কেবল সন্ধ্যার পরে লোক অভাবে বড় নির্জ্জন লাগে। নয়তো এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাবেশ কোথায় আছে কলকাতার এত কাছে? সুপ্রভাকে পাঠাবো বলে কিছু বনের ফুল সংগ্রহ করেছিলুম কাল পাঠাবো।

কাল বৈকেলে খুকুদের ওখানে দেখাশুনো করে এলুম। বেশ কাট্‌লো বিকেলটা। যতীনদার বাড়ীর ধারের ডোবাটাতে সকালে উঠে যেতে গিয়ে দেখি সাদা সাদা কচুরির ফুল ফুটে আলো করে রেখেচে। কি যে তার শোভা! আবার বেড়িয়ে ফিরবার সময় ঘণ্টা-দুই পরে দেখি সূর্য্যের কিরণে ফুলগুলোর রং-এর মধ্যেই নীলাভ হয়ে উঠেচে। সূর্য্যের আলোর কি যে রসায়ন বুঝলুম না—ফুলগুলির কাছে ঘাসপাতায় কি ল্যাবোরেটরি নিহিত, তাই বা কে বলবে? আমি দেখে ভারী মুগ্ধ হয়েচি।

আজ সকালে রাম অধিকারী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা মুড়াপুর ঘাটে। সে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ী। সেখান থেকে গল্পগুজব করে এসে বাড়ীতে অভিভাষণের শেষটুকু লিখি। দুপুরের পরে গেলুম সজনীর বাড়ী। ছেলেবেলায় রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্য মহাভারত একবার পড়েছিলুম, গ্রামে তখন কি একটা নিমন্ত্রণ ছিল। মা এক বাটী সুজি করে দিলেন খেতে অনেক দেরী হবে বলে, আর চালভাজা। আমি খেতে খেতে মহাভারতখানা পড়তে লাগলুম রান্নাঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু সেদিন আর দেরী হয়নি, অল্প পরেই খাবার ডাক এসেছিল। আজ সেই মহাভারতখানা সকালে পড়তে পড়তে ছেলেবেলার সেই কথাই মনে পড়েছিল।

উৎকর্ণ

সজনীর বাড়ী অমিয় মোটর নিয়ে এল আমাদের নিয়ে যেতে। মনোজ বসু আমাদের সঙ্গে যাবে বলে এসেচে। ওকে দেখে খুব খুসি হলুম। প্রেমেনকে তুলে নিলাম বরানগর থেকে বালি ব্রিজ পার হয়ে। আজকাল দক্ষিণেশ্বর একটা রেলওয়ে স্টেশন হয়েচে জানতুম না। শ্রীরামপুরে টাউন হলে যখন আমরা পৌছুলাম তখন চারটে বেজেচে। লোক আসতে সুরু হয়েচে। সভার কাজ আরম্ভ হোল। প্রথমেই কথা-সাহিত্য শাখার কাজ আরম্ভ করবার জন্যে সবাই মত দিলে। কাজেই আমার অভিভাষণ প্রথমেই পাঠ করতে হোল। তারপরে প্রেমেনের। বেশ বিকেলটা। সভায় কাজ করতে করতে ডাইনের বড় জানালা দিয়ে অপরাহ্নের আকাশ ও একটা তালগাছের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল আগে শ্রীরামপুরে আসতুম জ্ঞান বাবুর সঙ্গে—সে এক ধরণের দিন ছিল। আমাদের গ্রামে আমার খড়ের ঘরখানার কথাও মনে হোল। বকুলতলায়ও এমনি ছায়া পড়ে এসেচে, এই তো সেদিন ছেড়ে এসেচি, কিন্তু তাদের কথা মনে হচ্চে।

সভার কাজ শেষ হবার কিছু আগে আমি চলে এলুম বিনয় দা'দের বাড়ী। হরিদাস গাঙ্গুলী সামনের রবিবার শেওড়াফুলি যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। দিদিদের বাড়ী দেখলুম শান্তি এসেচে, মান্তুও আছে। শান্তি আমার অনেক বই পড়েচে, বলতে লাগলো। ওখান থেকে উঠে লীলা দিদিদের বাড়ী এলাম। লীলা দিদি না খাইয়ে ছাড়লেন না। তারপর ট্রেণে আমি, প্রেমেন, সুরেন গোস্বামী একসঙ্গে এলুম। মনোজদের দল আগের ট্রেণে চলে গিয়েচে সভা ভাঙতেই। বেশ কাটলো রবিবারটা। কাল স্কুল খুলবে। পূজোর ছুটী আজই শেষ হোল।

উৎকর্ণ

ঘুমিয়ে উঠেই মনে পড়লো বহুদিনের কথা—যখন আমরা কেওটা থেকে ফিরচি—আমার বয়স ছ'বছর—রাজি ও পটী দিদি আমাদের বাড়ীর সামনের পথে বাঁশের খোলা ও ধুলো নিয়ে খেলা করচে। ওরাও তখন নিতান্ত বালিকা। আজ এতক্ষণ পাগলা জেলে গিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসেচে। কারণ সাড়ে এগারোটার ট্রেণে সে গিয়েচে—ওর কথা ভাবতেই মনে পড়লো।

বারাকপুরকে মধুর করে গিয়েচে কত লোক। পিসিমা ছেলেবেলায়। মা, চক্কত্তি খুড়ীমা, জ্যাঠাইমা, সইমা, মণি আর একটু বেশী বয়সে। প্রথম যৌবনে গৌরী। এদের দান কত বড় তাই ভাবছিলুম। সেই পিসীমার উঠোন ঝাঁট্ দেওয়া, হেমন্তের এক বিকেলে হঠাৎ কোথায় অন্তর্দ্ধান। সেই গৌরী তাকের কোণে কি একটা নিতে এল। সদ্যস্নাতা কিশোরী, ভিজে চুল পিঠে দুলচে। আমি কাছেই তক্তপোষে বসে পড়চি পুরানো বই—আমার দিকে চেয়ে লজ্জুকচোখে হাসলে। তারপরে সেও কোথায় গেল চলে। মার কত দিনের কত ভালবাসা মনের মধ্যে গাঁথা রয়েচে।

এখন যারা বারাকপুরে বাস করে তারা জানে না বারাকপুর কি। এখানে যে দেবী বাস করেন, সৌন্দর্য্যময়ী রহস্যময়ী গ্রাম্যদেবী—বেরোজ-পোতার বাঁশবন রাঙা-রোদ সন্ধ্যা বেলায় তাঁর আসন পাতা, আমি যেন কতবার একলা সেখান বেড়াতে গিয়ে দেখেচি। আর কেউ দেখেনি।

একসঙ্গে সবাই দেহ ধরে পৃথিবীতে এসেচি এ্যাডভেঞ্চারের জন্যে। সবাই, পৃথিবীসুদ্ধ নরনারী একই সময়ে যারা পৃথিবীতে এসেচে—পরস্পরের আত্মীয়। তাদের উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা, পরস্পরকে elevate

করা। কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে থাকার জন্যেই পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করে। নইলে কি স্পেনে উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলে অসহায় শিশু ও নারীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারতো আজ?

মনে পড়লো পিসিমা শীতের বদলে 'জাড়' কথাটা ব্যবহার করতেন ছেলেবেলায় শুনেচি। এখন আর কারো মুখে আমাদের গাঁয়েও ও কথাটা শুনি নে।

আজ বিকেলে P. E. N. Club-এর একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, সরোজিনী নাইডু ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিক-দের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন—তাই এই বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সকালে আজ কলেজ স্কোয়ারে যখন বেড়াতে যাই, তখনও আমি জানতুম না যে ব্যাপারটা আজই হবে। সরোজ ও গিরিজা দা' ছিল স্কোয়ারে. আমি আর রমাপ্রসন্ন তো আছিই। ওখানেই সরোজ কথাটা বল্লে, কারন আমি তখনও পর্য্যন্ত চিঠি পাইনি—তারপর বেড়িয়ে এসে পত্র পেলাম।

নীরদ বাবুর সঙ্গে গেলাম, চৌরঙ্গীতে একটা রেস্তরাঁতে হচ্চে। খুব বেশী লোক হয়নি, জন চল্লিশ। মেয়েদের মধ্যে শান্তা ও সীতা দেবী। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সুরেশ বাঁড়ুয্যে, সরোজ চৌধুরী, সুধীর বাবু—মণি বোস—এই রকম জন-কতক। খগেন মিত্র ও হুমায়ুন কবীর একটু দেরী করে এলেন।

সরোজিনী নাইডু দেখলুম অদ্ভুত কথা বলতে পারেন। মেয়েদের মধ্যে অমন সুবক্তা আর অমন নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ মেয়ে আমি খুব কমই

দেখেছি। ইংলণ্ডের নানা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তরুণ বয়সে কি ভাবে ওঁর প্রথমে আলাপ হয়, সে বিষয়ে অনেক গল্প করলেন, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের কথা এত ভাল লাগছিল আমার যে আরও দুঘণ্টা বল্লে যেন ভাল হয়, এমন মনে হচ্ছিল।

ওখান থেকে সোমনাথ বাবুর ও সুশীল বাবুর বাড়ী হয়ে ফিরলুম নীরদ বাবুর বাড়ীতে। ওরা 'বিচিত্রা' সম্পাদক হওয়ার জন্যে আমায় বিশেষ অনুরোধ করচে কিন্তু আমি রাজি হই নি। সুশীল বাবু আজ বিশেষ পীড়াপীড়ি। আমার তা ইচ্ছে নয়।

ইদের ছুটীতে শুক্রবারে বনগাঁ এসেচি। একদিন বিকেলে রাজনগরের মাঠে গিয়ে বিকেলে বসি। ঠিক যেন ইসমাইলপুরে সেই সোঁদামাটীর ও কাশের গন্ধ। পরদিন চলে গেলুম বারাকপুরে। পুঁটিদিদি একা বাড়ী আছে। বরোজপোতার ডোবার ধারের বাঁশবাগানে শীতের দুপুরে কি সুন্দরই হয়েচে। দুপুরের পরে গেলুম কুঠীর মাঠে ইন্দুদের বাড়ী খেয়ে। ছোট এড়াঞ্চির গাছে মুকুল ধরেচে—নির্জ্জন মাঠ, ভূষণ জেলের পুরোনো কলা বাগানের পাশেই। ভারী সুন্দর লাগছিল। রোদ রাঙা হয়ে গেলে উঠে এলুম বরোজপোতার বাঁশবনে আবার। তারপর হেঁটে বনগাঁয় এলুম সন্ধ্যার পরে।

আজই সকালে দেশ থেকে ফিরেচি। দেশে ভারী চমৎকার কাটলো, যদিও খুকু ছিল না, কেউই ছিল না। একাই পুঁটিদিদিদের ঘরে থাকতুম, সকালে বিকেলে নিজে খাবার তৈরী করে খেতুম, কঞ্চি কাটতুম, জল আনতুম, কাঠ ও বাঁশের শুক্‌নো খোলা কুড়িয়ে আনতুম। আর রোয়াকে

বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, খুকুদের বাড়ীর দিকের নেবুতলার ঘাটে। ফিরে সেই মেয়েটী আসচে না বসে বসে ভাবতুম। এবার বারাকপুর একেবারেই শূন্য। তবুও বেশ লেগেচে। দুপুরের পরে ভূষণ মাঝির জমিতে একটা খেজুর গাছে ঠেস্ দিয়ে বসে লিখতুম কি পড়তুম। ছোট এড়াঞ্চি ফুলের কি শোভাই হয়েচে চারিধারে। একদিন বেলেডাঙার পথে আমি ও ইন্দু বসে কতক্ষণ গল্প করি। নীল আকাশের তলায় বটতলার কোলে শাদা বক উড়চে আমি বসে ভাবচি কে বলেচে আপনার সুখ্যাতি শুনতে বেশ ভাল লাগে। তাই তো শুনতে চাই।

একদিন চালকী গেলুম শিবে বাগ্দীর বানে রস খেতে। বড় বটগাছটার তলায় সে বসে বসে ভূতের গল্প করলে। একদিন আইনদ্দির বাড়ী গেলুম বিকেলে—তার এক ছোট নাতি বই নিয়ে আমার কাছে এল। বাড়ীর মেয়েরা দেখতে লাগলো বনগাঁয়েও খুব হৈ হৈ করা গেল। রোজ রোজ ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে আড্ডা হোত। একদিন দেবেনের মোটরে সুপ্রভার চিঠি আনতে গোপালনগর গেলুম বনগাঁ থেকে—সেদিন হাজারীর বাড়ী কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার গিয়েচে অনুকুলের মেয়ের চিকিৎসা করতে। তাদের সঙ্গে খুব আনন্দ হোল। এক মুচী বুড়ীকে কাপড় দিতে আসবার আগের দিন সর্ব্ব পরামানিকের বাগান দিয়ে নেমে ওর বাড়ী গেলুম। বেশ লাগলো সে সকালটা। ইন্দুর বাড়ী সন্ধ্যায় বসে নানা গল্প হোল—আগুন করে আমতলায় ন'দি ও খুড়িমা পোয়া[illegible]।

কিন্তু সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুসলমান বুড়ী মারা গেল আমি তখন ওখানে। তার 'কবর' দেওয়ার সময়ে আমি কতক্ষণ আমতলায় বসে কালু মুসলমানের সঙ্গে গল্প করলুম। আর রাধাবল্লভ বোস্টমের বাড়ীর পাশের পথটা দিয়ে এলুম কতকাল পরে এক

সন্ধ্যায় বুড়ীকে দেখতে। তখন সে বেঁচে ছিল—পরদিন সকালে মারা গেল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন।

সেনেটে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ক্লিওরের বক্তৃতা ছিল—সেখানে খুব ভিড় হয়েচে শুনতে গিয়ে দেখি। আগের বেঞ্চিগুলো প্রতিনিধিদের জন্যে রিজার্ভ আছে, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে অধ্যাপককে দেখা—কাজেই আমি এগিয়ে প্রতিনিধিদের বেঞ্চি দখল করে বসলুম। কি আর করি! আমার আসনের পেছনে মেয়েদের আসন, সেখানে একটী মেয়েকে যেন সেদিন ইন্দিরা দেবীর ওখানে দেখেছি। বক্তৃতা তো শেষ হোল, ভিড়ের মধ্যে আমি সেনেটের পূর্বদিকের হলে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় তিনটী লম্বা চওড়া সাহেব হলে ঢুকতে গিয়ে ঢুকবার জায়গা না পেয়ে একটা চেয়ার পেতে একপ্রান্তে বসলো। আমার মনে হোল এদের মধ্যে একজন সাহেব Sir James Jeans, মূল সভাপতি।

গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি স্যর জেমস্ জিনস্?

—হাঁ।

—আপনার বক্তৃতা কবে হবে? আমি আপনার বইয়ের একজন ভক্ত। আপনার অধিকাংশ বই পড়েচি।

—বক্তৃতা হবে বুধবারে।

—বিষয় কি?

—নেবুলা।

—দার্জ্জিলিং ও হিমালয় আপনার কেমন লাগলো?

—চমৎকার।

—আপনাকে আর একটী প্রশ্ন জিগ্যেস করবো। আমাকে সময় দেবেন কি?

—আমার গলা ধরেছে ঠাণ্ডা লেগে। কথা বলতে কষ্ট হয়।

আমি নাছোড়বান্দা। বল্লুম—দয়া করে এক মিনিট সময় দেবেন?

—কি বল?

—আপনার নাম কি ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর সাইকিক্ রিসার্চ্চেসের সঙ্গে জড়িত আছে?

—না, কখনো না। আমি ও জিনিস বিশ্বাস করি না।

ইতিমধ্যে একটী মেমসাহেব অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এগিয়ে এল দেখে আমিও আমার পকেট থেকে মোহিত মজুমদারের পাটনার অভিভাষণখানা বার করলুম—এই একমাত্র কাগজ যা আমার পকেটে ছিল। স্যর জেম্‌স্ মেমটীর অটোগ্রাফ লেখা শেষ করে তাকে জিগ্যেস করলেন—আমি কি তোমার এই পেনটী ব্যবহার করতে পারি?

তারপর আমাকে অটোগ্রাফ দিলেন।

সেনেট হলের মধ্যে আমিও ঢুকলুম স্যর জেমস্ জিন্‌সের পিছু পিছু। ওঁদের কাউন্সিলের মিটিং বসবে—ডাঃ শিশির মিত্র মঞ্চ থেকে লোকের ভিড় সরাতে ব্যস্ত। শিশিরবাবুকে বল্লুম—এঁদের মধ্যে এডিংটন আছেন? শিশিরবাবু বল্লেন—না।

ডাঃ কালিদাস নাগ আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ডাঃ এ্যালবার্ট ডেভিস্ মিড-এর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। দুজনের সঙ্গে করমর্দ্দন করলুম ও কার্ড বিনিময় গেল। আমি তাঁরও অটোগ্রাফ নিলুম।

ভুলে আমার ফাউন্টেন পেনটা ডাঃ মিড্-এর কাছে রেখে গিয়েছিলুম,

উৎকর্ণ

সেনেট্ হল থেকে বার হয়ে ট্রাম লাইনের কাছে গিয়ে মনে পড়লো ; ফিরে এসে সেটা আবার নিলুম।

স্যর জেমস্ জিন্স্-এর সঙ্গে আলাপ করেছি আজ! স্মরণীয় দিন না জীবনের?

আজ সারাদিনটা কি অপূর্ব্ব আনন্দে কাটলো! এমন দিন কটাই বা আসে জীবনে! প্রথমে তো সকালে বিশ্বনাথ এসে বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনের কথা বল্লে। দেশে এমন একটা সাহিত্য-সভা হবে শুনে খুবই আনন্দ হোল। সেই আনন্দ নিয়ে ও যদি কমল সরকার আমাদের দেশে যায়, তবে সে কেমন গান গাইবে পুঁটীদিদিদের ভাঙা রোয়াকে বসে বসে —সে কথা ভাবতে ভাবতে তো স্কুলে গেলুম। স্কুল থেকে বিকেলে সুধীর বাবুর দোকানে গিয়ে শুনি আজ স্যর জেমস্ জিন্সের বক্তৃতা শোনা যাবে না। কার্ড বিলি করা হয়েচে, বিনা কার্ডে ঢুকতে দেবে না, মণীন্দ্রলাল বসু ওদের নাকি বলেচে। আমি মনে ভাবলুম, এই কলকাতা সহরে এমন কোনো লোক নেই যে আজ আমায় Jeans-এর বক্তৃতা শুনতে বাধা দেয়। দেখি ঢুকতে পারি কিনা!

গিয়ে দেখি সেনেটের সব দরজা বন্ধ। পেছন দিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে গিয়ে দেখি সেদিকেরও দরজা বন্ধ। তখন পূর্ব্বদিকের দালানের কোণের দরজা খোলা দেখে সেখান দিয়ে ঢুকলুম। দেখি অত বড় হলে মাত্র ছ'জন প্রাণী উপস্থিত। একজন তার মধ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান জগতের লোক সুধাংশু। সে আমায় ডাকলে। তার কাছে গিয়েই বসলুম। কিছু পরে সোমনাথবাবু সস্ত্রীক এলেন। ডাঃ সুশোভন সরকার এলেন, আমাকে দেখে পাশে এসে বসলেন। একটু পরে ভীষণ ভিড় জমে

গেল। দরজা সব বন্ধ, দরজায় লোক ধাক্কা মারতে লাগলো। ভিড় ঠেলে দেখি নুটু আসচে। নুটু সামনের দিকে গেল। বি, এম, সেন মাইক্রোফোনের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন—Ladies & Gentlemen, Sir James Jeans has arrived and I am only testing the microphone—একটা খুব হাসির রোল উঠলো। একটু পরে জিনস্ বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। যখন যে স্লাইড্‌খানা পড়ে পর্দ্দায় আমি অমনি বলি এটা ওরায়ণ নেবুলা, এটা এন্ড্রোমিডা, সিফিড্ ভেরিয়েবল্‌স্-এর কথা Jeans তুলতেই সুশোভনবাবুকে বল্লুম। নিজের ওপর নিজের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পেছনের সন্ধ্যার আকাশে দূরে একটা গ্রামের এক মেয়ে বলেছিল —আপনার সুখ্যাতি শুনতে ভাল লাগে—সেই কথা, সেই বাঁশবন, সেই বকুলতলা, সেই ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা নির্জ্জন মাঠ—বার বার মনে হচ্ছিল—আর মনে হচ্ছিল শিবুর বাবাকে আজ ফি-এর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি—শিবুর ম্যাট্রিকের ফি, গরিব লোক কাল হাটবেলা পিয়নে যখন টাকা দেবে, কি খুসিই হবে। পশুপতিবাবু যে কাল ফোনে বোলেছিল— আপনি মিডিয়ম ভালোই, তামার তার ভিন্ন কি বিদ্যুৎ চলে? খুব ভাল কথা।

বক্তৃতা অন্তে কালিদাস নাগ ও সেই পরশুকারের এ্যাল্‌বার্ট ডেভিস্ মিডের সঙ্গে দেখা। কালিদাসবাবু বল্লেন—রবিবার দুপুরে কোনো এন্‌গেজমেণ্ট নেবেন না, বিভূতিবাবু।

আমার বোধ হয় উনি কোনো পার্টি দেবেন বৈদেশিক ডেলি-গেটদের।

বাইরে আসবার পূর্ব্বে ডাঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দেখা। বল্লুম— মেঘনাদদা', ময়দান ক্লাবের কথা মনে আছে? ১৯১৪ সালের?

ট্রাম লাইনের কাছে সেনেটর সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়েই দেখি জিনস্-এর বক্তৃতার সেই কালপুরুষ উঠেচে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তির মাথার ওপরকার আকাশে। এই পাশের কার্ণিসে বসে মাধববাবুর বাজার থেকে ফুলুরি কিনে খেতুম যখন ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র—সে কথা মনে পড়লো। সেও এই শীত-কালে। তখন কোথায় কি? কোথায় সুপ্রভা, কোথায় খুকু, কোথায় আমি! সুপ্রভার কথা বড্ড মনে হচ্ছে। যদি এ সময়ে সে আসতো! যখন যে মেয়ে হলে ঢোকে, তখনই আমি দেখি সুপ্রভা যদি তাদের মধ্যে থাকে!

নীরদবাবু ও কান্তিবাবু রাস্তা পার হচ্চেন, বল্লেন—কত খুঁজলুম আপনাকে। সোমনাথবাবুর মুখে শুনলুম আপনি এসেচেন। কাল যাবেন ঠিক সাড়ে চারটার সময়—'বিচিত্রা' সম্পর্কে পরামর্শ আছে।

সুধীরবাবুর দোকান হয়ে রমাপ্রসন্নের বাড়ীতে বসে আশু সান্ন্যাল ও রমাপ্রসন্নের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে বাসায় এসে দেখি সুপ্রভা পত্র লিখেচে। সে আসচে ২৫শে জানুয়ারী কল্‌কাতায়। কি আনন্দ যে হোল! এখন যদি আসে তবে তো? তার কথার কোনো ঠিক নেই।

Eddington-এর বক্তৃতায় সেনেটে বড় কড়া ব্যবস্থা ছিল। ও দুদিন খুব ভিড় ছিল বলে এ ব্যবস্থা এরা করেচে। দিনগুলো বড় ব্যস্ততা ও engagement-এর মধ্যে দিয়ে কাটচে। Dr. Fisher-এর সঙ্গে সত্যেন বোসের তর্কযুদ্ধ সেদিন বেশ উপভোগ করা গেল বেকার ল্যাবরেটরিতে। আজ সকালে সজনীর বাড়ী থেকে সাড়ে ন'টার সময় আসচি, দেখি খুব ভিড় সেনেটে। ঢুকে দেখি লর্ড হারবার্ট স্যামুয়েলের বক্তৃতা হচ্চে, বিষয় 'Basis of Philosophy', Sir James Jeans সভাপতিত্ব

করচেন—তারপর জিনস্‌কে ভলান্টিয়ারেরা ঘিরে নিয়ে এসে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে—ওদিকে বক্তৃতা-মঞ্চে লর্ড স্যামুয়েলকে বহুলোকে ঘিরেচে বক্তৃতা মঞ্চের ওপরে, অটোগ্রাফের জন্যে। জিন্‌স্‌ অনেকক্ষণ মোটরে বসে ডাঃ কমল মুখার্জ্জির সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলবার পরে মোটর থেকে নেমে লর্ড স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। লর্ড স্যামুয়েলকে বল্লেন—I will see you after lunch. এইটুকু মাত্র আমার কানে গেল। তারপর লর্ড স্যামুয়েল গবর্ণরের মোটরে চলে গেলেন। বহুলোক জড় হয়েছিল সেনেটের সামনের রাস্তায় এঁদের দেখবার জন্যে।

দুটো বিষয়ে দুটো অদ্ভুত গোলযোগ ঘটল দিন কয়েকের মধ্যে, তাই সেটা এখানে লিখে রাখলাম। প্রথম কথাটা আগে বলি। ১৯১৩ সালে যখন আমি বনগাঁয়ে বিধুবাবুর ওখানে থাকি, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, তখন নতুন 'ভারতবর্ষ' বেরুল। মন্মথ বাবু মোক্তার আমাকে তখন 'ভারতবর্ষ' পড়তে দিতেন। 'ভারতবর্ষ'-এ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন নতুন লেখকের গল্প পড়ে অল্প বয়সেই মোহিত হয়ে যাই। ভাবি, এমন-ধারা লেখক তো কখনো দেখিনি—কত তো গল্প পড়েছি। তারপর বহুদিন কেটে গিয়েচে, থাক্।

গত রবিবার সেই বনগাঁয়ে সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায় বসে গল্প করচি অনেকে—এমন সময়ে অপূর্ব্বর ছেলে অরুণ একখানা অমৃত-বাজার পত্রিকা হাতে দিয়ে বল্লে—শরৎ বাবু মারা গিয়েচেন, এই যে কাগজ।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ কাগজখানায় বেরিয়েচে, রবিবারে তিনি বেলা দশটার সময় মারা গিয়েচেন।

উৎকর্ণ

কি যোগাযোগ তাই ভাবি। কত জায়গায় বেড়ালুম, কত দেশে গেলুম, কত লোকের বৈঠকখানায় বসলুম—কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ কোথায় পেলুম—না সেই বনগাঁয়ে সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায়, যে আমায় অত বছর আগে শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করে দিয়েছিল!

ভাববার কথা নয়?

এইবার অন্যটার কথা বলি। সেটা ঘটল আজ এখুনি, এই সন্ধ্যার সময়।

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমি মৃজাপুর ষ্ট্রীটের একটা উড়ে ঠকুরের হোটেলে দিনকতক খেতুম। উড়ে ঠাকুরটার নাম সুন্দর ঠাকুর। সে এখনও আছে বেঁচে, তবে ওখানকার হোটেল সে আজ ১৫।১৬ বছর উঠিয়ে দিয়েচে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে পথে ঘাটে দেখাশোনা হয়।

এখন এই ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাস আমার জীবনে বড় শোকাবহ দুর্দ্দিন—হাতে নেই পয়সা, মনেও যথেষ্ট অবসাদ ও হতাশা। গৌরী সেবার মারা গিয়েচে। সুন্দর ঠাকুরের দোকানে রাত্রে গিয়ে লুচি খেতুম, কোথা থেকে যে দাম দেবো না ভেবে খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি।

তারপর সুন্দর ঠাকুরের হোটেল উঠে গেল, সেখানে অন্য কি দোকান হোল। আমিও চলে গেলুম কলকাতার বাইরে। জাঙ্গিপাড়া, হরিনাভি চাটগাঁ, কুমিল্লা, ভাগলপুর, মুঙ্গের নানাস্থানে—কোথায় বা না গিয়েচি চাক্‌রী নিয়ে? বহুকাল পরে কলকাতায় ফিরে আবার যখন এখানেই চাক্‌রী নিলুম, মৃজাপুর ষ্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় সুন্দর ঠাকুরের হোটেলের ঘরটা প্রায়ই চোখে পড়ত। ভাবতুম পুরোনো দুর্দ্দিনের কথা। ওই ঘরটায় সেদিন আমার সেই মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলির স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো—না ভেবে পারিনে।

উৎকর্ণ

আজ একটা বালিসের খোলে তুলো ভর্ত্তি করার দরকার হোল। পাটনায় বক্তৃতা আছে শনিবার, সেখানে যেতে হবে, অথচ ভাল বালিস নেই। মৃজাপুর ষ্ট্রীটে একজায়গায় একটা তুলোর দোকান। দোকানে বসে তুলো ভর্ত্তি করে উঠতে যাচ্ছি এমন সময়ে নজর করে দেখলুম এটা সেই পুরোনো দিনের সুন্দর ঠাকুরের সেই হোটেলের ঘরটা। আজকাল সেখানে তুলোর দোকান হয়েচে।

মনে পড়লো এও জানুয়ারী মাস এবং ১৯১৯ সালের পরে আজ এই প্রথম আবার সেই ঘরটাতে ঢুকে বসলুম। তারপর ফিরে আসচি হঠাৎ মনে পড়লো বালিসের খোলটা সুপ্রভা তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন আগে। কি অভাবনীয় যোগাযোগ।

কাল হাওড়া স্টেশনে ট্রেণ অত্যন্ত দেরীতে এল। রাত্রে ঘুম ভাল হয় নি। একে তো বেজায় শীত, তার-ওপর কৃষ্ণপক্ষের ভাঙ্গা চাঁদ উঠেছে দূর মাঠের মাথায়, ট্রেণের জানালা খুলে সেই শীতের মধ্যেও হাঁ করে চেয়ে আছি। সৌভাগ্যের বিষয় একটা কামরা আমরা একেবারে খালি পেয়েছিলুম, অরবিন্দ গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক (অত্যন্ত সুপুরুষ লোক, আমি অমন সুপুরুষ খুব কমই দেখেচি) সপরিবারে পশ্চিমের দিকে যাচ্চেন, তাঁরাই কেবল ছিলেন আমার কামরাতে, আর কেউ নয়। একখানা পুরানো ডায়েরী ছিল আমার কাছে বাবার, তাতে পড়ে দেখা যায় বাবা ১২৮৭ সালের দিকে পশ্চিম ভ্রমণে বেরিয়ে এই পাটনা, মুঙ্গের, আগ্রাতে এসেছিলেন।

ভোর হোল শিমুলতলা স্টেশনে। আর বছর যখন পাটনা আসি, আমি, সজনী, নীরোদ, ব্রজেন দা—ভোর হয়েছিল কিউল স্টেশনে।

অরবিন্দ বাবুটী অতি ভদ্রলোক, আমাকে খাবার খেতে দিয়ে বল্লেন—একটু মিষ্টি মুখ করুন। অথচ তিনি আমায় জানেন পর্য্যন্ত না।

রৌদ্র উঠলো কিউলে। বিহারের দূরবিসর্পী প্রান্তর, অড়রের ক্ষেত, সরিষার ক্ষেত, খোলার বাড়ীওয়ালা গ্রাম, চালে চালে বসতি, ইঁদারা, ফেনি-মনসার ঝোপ, মহিষের দল আরম্ভ হয়ে গিয়েচে। শিমুলতলায় পাহাড়ের শোভা যদিও তেমন কিছু দেখলুম না তবুও শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সাঁওতাল পরগণার উচ্চাবচ প্রান্তর ও ছোট খাটো পাহাড় রাজি দেখতে দেখতে এত বিভোর হয়ে গেলুম যে ঘুম কিছুতেই এলো না।

পাটনা ষ্টেশনে মণি ও কলেজের ছাত্রেরা নামিয়ে নিতে এসেচে। তার আগে বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে কানা ও পশুপতি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল দেখা করবার জন্যে। অনেকদিন পরে ওদের সঙ্গে দেখা হোল। মণিদের বাড়ী আসবার কালে মোটরটা বড় ঘুরে এল—কারণ এক জায়গায় রাস্তার পিচ্ দেওয়া হচ্চে নতুন।

* * *

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আজকাল পাটনাতেই রয়েচে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বল্লে, এ জায়গা ভাল লাগচে না, বাংলাদেশে ফিরতে চায়। তারাশঙ্কর একজন সত্যিকার শক্তিমান লেখক, বাংলার মাটী থেকে ও প্রাণরস সঞ্চয় করচে, ওর কি ভাল লাগে এসব জায়গা?

মণিদের ছাদের ওপরে দুপুরের নীল আকাশের তলায় বসে এই অংশ লিখচি। সুপ্রভাকেও একটা চিঠি দেবো। দূরে তালের সারির মাথায় অনেকটা দূর দেখা যাচ্চে, এই নিস্তব্ধ দুপুরে সুদূর বাংলার একটী সজনে ফুল বিছানো পল্লীপথের কথা মনে পড়চে, একটী সরলা পল্লী বালিকা এসময় কি করচে সে কথাও ভাবচি।

উৎকর্ণ

ছাদের ওপর যোগীন বাবুর দুই নাৎনী খেলতে এসেচে আর বলচে—

চু কপাটি আইয়া

যাকে পাবে ভাইয়া …

এ কি রকম খেলার ছড়া? বাংলা দেশে তো এ ছাড়া কোনো ছেলেমেয়ের মুখে শুনিনি?

পাটনা কলেজের হলে মিটিং। সেখানে অনেকদিন পরে অমরবাবুকে দেখে বড় আনন্দ পেলুম। সেই ভাগলপুরের অমরবাবু! ইনি শুনলুম এখন এখানে রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী, কিছুদিন আগে এখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তারাশঙ্করও উপস্থিত ছিল. ও আজকাল এখানেই থাকে মামার বাড়ীতে। সভার টেবিলে বাবার পুরানো ডায়েরী-খানা পড়ে দেখছিলুম তিনি পাটনায় এসেছিলেন কবে। ঠিক সাড়ে ছ'টার সময়ে সভা থেকে উঠতে হোল, তারাশঙ্করকে সভাপতির আসনে বসিয়ে বলে এলুম, সঙ্গে সঙ্গে এলেন অমর বাবু। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার পিছু পিছু এসে বল্লেন—একটা কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্চে, আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনারা কলকাতা থেকে এসে বক্তৃতাটা দিয়েই পালান, এতে এখানকার লোকে দুঃখিত।…একটা ছেলে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে, একবার দুবার। একবার যখন করলে, তখন আমি ওর দিকে চাই নি। আবার যখন করলে, তখন আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে বাইরে নিয়ে গেলুম। বল্লুম—তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়? ও বল্লে—বাড়ী ভাগলপুরে। আমি নবীন গাঙ্গুলীর নাতি। তখন তো আমি অবাক্। ওদের বাড়ী কত গিয়েচি ভাগলপুর

থাকতে সে কথা বলি। তিনকড়িকে চেন? বলতেই বল্লে—হাঁ, তিনি আমার মেসোমশায়।

অমর বাবুর মোটরে মণিকে তুলে নিয়ে চলে এলুম মণিদের বাড়ীতে। ইন্দু যে কোথায় ছেঁড়া মাদুর পেতে বসে আছে, খুকু যে ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে ভুগচে, কেবল এই সব কথা মনে পড়ে। মণির বাড়ীতে এসে চা খেতে খেতে সমর বাবুর সঙ্গে ভাগলপুরের দিনের গল্প করি। মোটরে আসতে আসতে তিনি মণিকে ক্ষীরোদ বাবুর অশরীরী-রূপে ঘরে উপস্থিত থাকার সেই পেটেন্ট গল্পটী করলেন। আমি তো শুনে অবাক যে গত বছরের সেই সুদর্শন যুবক প্রীতি সেনই ক্ষীরোদ বাবুর ছেলে। কি সব অভাবনীয় যোগাযোগ! এবার প্রীতি সেনকে না দেখে দুঃখিত হয়েচি।

সমর বাবুর গাড়ীতেই স্টেশনে এলুম। মণি শেষ পর্য্যন্ত রইল। কত পুরোনো দিনের গল্প হোল অমর বাবুর সঙ্গে। ওর সাদর আলিঙ্গনটী বড় বন্ধুত্বের চিহ্ন।

ট্রেণে বক্তিয়ারপুর নেমে কালীদের বাড়ী এসে দেখি সে কোথায় থিয়েটারের রিহার্সেলে গিয়েচে। একটু পরেই এল। কত রাত পর্য্যন্ত গল্প হোল। ঠিক হোল কাল রাজগির যাওয়া হবে সকালের ট্রেণে।

কালী ও কালীর মামাশ্বশুর আমার সঙ্গেই ছিল। শো স্টেশনের একটা জায়গা দেখিয়ে কালী বল্লে—ওখানে আমাদের 'রসচক্র' সভা হয়েছিল, আমি একটা কবিতা পড়লুম। আমি বল্লুম—তুমি কবিতা লেখ না কি? বল্লে—শোনাবো এখন। বাড়ীতে আছে। আহা, ওরা সভা-সমিতিতে যেতে পারে না, এক আধটু হোলে কি খুসিই হয়।

উৎকর্ণ

১

Ignominy thirsts for respect—কি কথাই বলেচে ভিক্টর হিউগো !

চেরো, হরনৌৎ—এই সব স্টেশনের নাম। অপরিষ্ট ও নোংরা বিহারের বস্তি। ধুলো, ধুলো—সর্ব্বত্র ধুলো। ধুলো-পড়া পেঁড়া, খোয়া ক্ষীর (এদেশে বলে মেওয়া) ও তিলুয়া বিক্রী হচ্চে দোকানে। এক ঘরের দেওয়ালের গায়ে আর এক ঘর বাড়ী তুলেচে।

শো স্টেশনে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ বলে একজন হিন্দি গ্রাম্য কবির সঙ্গে আলাপ হোল। লোকটীকে এখানে সবাই পাগল বলে—তা তো বলবেই। কবিকে চিনবার মত লোক এ সব পাড়াগাঁয়ে কে আছে? কবি আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। আসবার সময়ে তিনি দয়া করে শো স্টেশনে আবার আমাদের কামরাতেই উঠে দেখা করেছিলেন।

রাজগিরের শৈলমালা দূর থেকে ধোঁয়ার মত দেখা গেল। কিছু পরেই বিহার-শরীফ ও নালন্দা। নালন্দা থেকে ট্রেন ছাড়লে দূর থেকে স্তূপ ও বাড়ীঘর দেখা গেল। এবার আর নালন্দা যাওয়ার সময় হোল না।

রাজগির নেমে পাহাড়জঙ্গলের পথে সোনভাণ্ডার গুহায় চলে গেলুম। বুদ্ধের চরণরজপূত এই স্থান। ঐ গুহায় বুদ্ধদেব সমাধিস্থ ছিলেন, পাশের গুহায় তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ ধ্যানস্থ ছিলেন।

এই পাহাড়টার নামই গৃধ্রকুট। গৃধ্রকুটের ওপরে কাঁটাগাছপালা ঠেলে অনেকটা উঠলুম। এক জায়গায় পাথর ঠেস্ দিয়ে যুৎ করে বসলুম। ঠিক দুপুর, নির্ম্মেঘ, নীল আকাশ। দূরে প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান দ্বারা খোদিত একটা স্তূপ বা চৈত্য দেখা যাচ্ছিল। পাহাড় থেকে নেমে আমি সেটা

দেখতে পেলুম, কালী পাথরের নুড়ি কুড়ুতে লাগলো। আমি চৈত্যটা দেখে ফিরবার সঙ্গে বাঁশবনের ছায়ায় ঝরণার স্রোতের ধারে খানিকক্ষণ বসলুম। ওরা ততক্ষণ চলে গিয়েচে। এখানেই সেই করন্ত বেণুবন, যেখানে বুদ্ধদেব মহানির্ব্বাণ সূত্র বিবৃত করেন আনন্দকে। কালের কুয়াসায় সব ঢেকে মুছে একাকার হয়ে গিয়েচে···কোথায় কি আজ! আড়াই হাজার বছর আগেকার মত বেণুবন কিন্তু রাজগিরির উপত্যকায় অজস্র। ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে স্নান করে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হোল। তারপর আমি একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে ছায়ায় বসে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম—হঠাৎ মনে পড়লো আজ গোপাল নগরের হাট, বেলা তিনটে, সাড়ে তিনটে—এতক্ষণ বটতলা দিয়ে কত লোক হাটে চলেচে।

ফিরবার পথে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে এসেচে বড় বড় মাঠে। একজন সৈনিক লামা আর একজন লামাকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসে কি একটা বাজনা বাজাচ্চে ট্যাং ট্যাং করে আর কেবল ঘাড় নীচু করে প্রণাম করচে। সে ভারী সুন্দর দৃশ্য! ট্রেন ছেড়ে গেলেও অনেকদূর পর্য্যন্ত বাজাতে বাজাতে চলন্ত ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে এল।

বক্তিয়ারপুর পৌঁছে একটী ছোক্‌রা তার কবিতা শোনাতে বসলো। গাড়ীতে তার লেখা কবিতা দু'তিনটা শোনালে। সাহিত্যপ্রীতি ওদের বেশ প্রশংসনীয়—তবে দূর বিহারের দেহাতে, কে ওদের উৎসাহ দিচ্ছে আর কে-ই বা ওদের কবিতা ছাপাচ্ছে!

রাত্রের ট্রেণেই কল্‌কাতা রওনা হলুম, দানাপুর এক্সপ্রেসে। সারা রাত্রি ঘুম এল না। একবার একটু তন্দ্রামত এসেছিল—উঠে দেখি জসিডি স্টেশন। তারপর আবার শুয়ে পড়লুম—ভাঙা কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ

উঠেচে, বেজায় ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে বইচে, জানলা দিয়ে মুখ বার করলে মুখে যেন লক্ষ ছুঁচ ফোটে। কুয়াসা হয়েচে, বনগুলো যেন ঠিক ইসমাইলপুরের সেই বন—অনেক রাত্রে উঠে এই শীতের সময় ইসমাইলপুর কাছারীতে ঠিক যেমন বন দেখতুম, তেমনি দেখাচ্চে।

পাটনা থেকে এসে মধ্যে অনেক ব্যাপার হয়ে গেল। মধ্যে সুপ্রভা কল্‌কাতা এল ওর মা বাবার সঙ্গে। একদিন ওর সঙ্গে 'মুক্তি' দেখতে গেলুম 'চিত্রা'তে। ভাল লাগলো না কারো, সেবা ও রবি ছিল সঙ্গে। তারপর আমার পড়ে গেল বনগ্রামে সাহিত্য-সম্মেলনের হুজুগ। বিশ্বনাথ এখানে খুব যাতায়াত করলে। খগেন মিত্র মহাশয় সভাপতি হয়ে গেলেন এখান থেকে, রমাপ্রসন্ন ও গৌর পাল গেল, খুব হৈ হৈ কাণ্ড হয়ে গেল সরস্বতী পূজোর সপ্তাহে। সাহিত্য-সম্মেলন থেকে আমায় আবার দিলে একটা মানপত্র ও অভিনন্দন।

পরের সপ্তাহেই পড়ে গেল কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলন। আমি ঈদের ছুটিতে বাড়ী গেলুম। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, কোকিল ডাকচে, শীত যদিও বেশ, কিন্তু বসন্তের আমেজ দিয়েচে। বাড়ী গেলুম, পাড়ায় কেউই নেই এক ন'দি ছাড়া। নিজের খড়ের ঘরটিতে দুপুরে শুয়ে খুব ঘুম দিই। আগের রাত্রে যতীন কাকার মেয়ে উষার গিয়েচে বিয়ে। তখনও বরযাত্রীরা রয়েচে। যতীন কাকার মেয়ের বিয়ে দেখছি চিরকাল। ঐ একই চণ্ডীমণ্ডপে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে গাছে গাছে পাকা কুল খেয়ে বেড়াই। ভূষণ জেলের ছেলের জমিতে খেজুর গাছটা ঠেস দিয়ে বসে 'আরণ্যক' উপন্যাসের এক অধ্যায় লিখি। সন্ধ্যাবেলায় ইন্দুর বাড়ীতে সেদিনকার মিটিং ও

আমার মানপত্র দেওয়া সম্বন্ধে খুব কথা বার্ত্তা হোল। ইন্দু বল্লে—আজ যদি আপনার বাবা-মা বেঁচে থাকতেন!

সকালে টুকোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ছেলেবেলার টুকো খেলতো আমার ছোট বোন মণির সঙ্গে। সে আজ ১৫।১৬ বছর পরে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেচে। এসে আমায় নমস্কার করলে—ওর মুখ ভুলেই গিয়েছিলুম—এখন দেখে মনে হোল হাঁ, এ মেয়েকে আগে দেখেছিলুম বটে।

পরদিন সকালে নটার ট্রেণে কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলনে গেলুম। গাছে গাছে শিমুলফুল ফুটে লাল হয়ে আছে। সজনী, অমল বোস, সুনীতি বসু, প্রবোধ সান্যাল, বিজয়লাল সকলের সঙ্গে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে দেখা। অতুল গুপ্ত ও যামিনী গাঙ্গুলী একখানা মোটরে আসছিলেন, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাতেই আমায় উঠিয়ে দিলেন। মনোমোহন ঘোষের যে বাড়ীতে আজকাল কলেজিয়েট স্কুল, ওখানেই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢুকেই দেখি প্রবোধ সান্যাল বসে খাচ্চে। আমি ও ইউনি-ভার্সিটীর প্রিয়রঞ্জন বাবু একসঙ্গে খেতে বসে গেলুম। খেয়েই সভাস্থলে যাই প্রমথ চৌধুরী সভাপতি। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর নাটমন্দিরে সভা বসেচে। কখনও এর আগে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর মধ্যে ঢুকিনি—যদিও এর আগে বাল্যকালে একবার কৃষ্ণনগর এসেছি। তার অভিজ্ঞতা খুব অদ্ভুত। আর বছর-দুই আগে কয়েক ঘণ্টার জন্যে যে এসেছিলুম আমার ছোট ভাইয়ের জন্যে পাত্রী দেখতে, সে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

কৃষ্ণনগরে বাবার সেই মা—আমাদের আলুভাতে ভাত খাওয়ানো—আমার হতাদর—কত কথাই মনে পড়ে। সেই আর এই! সে গল্প আর একদিন করবো।

উৎকর্ণ

কৃষ্ণনগর থেকে সেই রাত্রে রাণাঘাটে এসে খগেন মামার বাড়ীতে রইলুম—তাও সেই বাল্যে ওদের বাড়ী শুয়েছিলুম আর কখনও থাকিনি। একটা সরস্বতীঠাকুর বিসর্জ্জন দিতে গেল শোভাযাত্রা ক'রে অনেক রাত্রে। বেজায় শীত পড়লো রাত্রে।

পরদিন এলুম এগারোটার ট্রেণে গোপালনগরে। স্টেশনে আবার খগেন মিত্র ও প্রভাতকিরণ বসুর সঙ্গে দেখা। রেস্তোরাঁতে বসে চা খেতে খেতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল অনেকক্ষণ।

দেশে গিয়ে বেশ লাগলো। তখনি ন'দির কাছে একটু তেল চেয়ে নিয়ে নদীতে স্নান করে এলুম। ওপাড়ার সেই কুমুরণী ক্ষার কাচছে। শুক্‌নো ফুল পড়ে আছে কত বনসিমতলার ঘাটে। পরশু কতক্ষণ ঘাটে বসেছিলুম, বনের ফুল পেকেচে একটা ডালে, দরিদ্রা পল্লীজননী আর কি দিয়েই বা আদর করবেন? তবুও কত স্মৃতি জড়ানো রয়েচে এই বন-সিমতলার ঘাটের সঙ্গে! খুকু ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করতো নেয়ে উঠে—এই তো সেদিনও।

সেদিন এসে খুব ঘুমুলাম দুপুরে। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। চড়কতলার এসে বসলুম, মুসলমান মাষ্টারটী কোথা থেকে সন্ধান পেয়ে এসে পড়েচে অম্‌নি। চাচা এসে আগুন করলে ও বক্ বক্ সুরু করলে। ইন্দু রাত্রে একটী বিদেশী পথিক সেদিন কেমন করে শিঙেতলার মাঠে বেঘোরে মারা গিয়েছিল—সে গল্প করলে। সে কাহিনী বড়ই করুণ।

পরদিন সকালে সীতানাথ জেলের নৌকাতে বনগাঁয়ে চলে এলুম। ভেবেছিলুম খুকুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো—কিন্তু ঘটে উঠলো না। রাত্রে খুব চমৎকার জ্যোৎস্নায় মন্মথবাবুর বাড়ী বসে হরিবাবু, যতীনদা,

ডাক্তার বাবুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া গেল। বিপ্রদাসবাবুর বাড়ী সত্য-নারায়ণের সিন্নীর প্রসাদ পাওয়া গেল।

সেখান থেকে এসে কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে।

নগেন বাগচীদের যে বাড়ীটাতে থাকতুম—অনেক দিন সে বাড়ীর সে ঘরটার পথ বন্ধ ছিল। আজ ফুনির ছোট ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সে ঘরটার সে বারান্দাতে গিয়ে বসি। এখানেই আমার মা মারা যান। তারপর কতকাল এ বাড়ীটাতে আসিইনি। এইখানেই বালক কবি পাঁচুগোপালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সতেরো বছর আগে—যে আমায় প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

ফিরে এসে ফুনিদের উঠোনে মাচাতলার উনুনে ওরা পরোটা ভাজতে বসলো—আমি একখানা বেলে দিতে গেলুম—হোল না। ফুনি ও বৌমা তো হেসেই কুটিপাটি। তারপর বৌমা বেলে দিতে লাগলো—আমি শুধু নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। সুন্দর লেবুফুলের গন্ধ বেরুচ্ছিল!

জ্যোৎস্নার মধ্যে কাল রাত্রেই কলকাতায় ফিরি। বেগুন আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল একেবারে মেন্ পর্য্যন্ত। কত ধরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে এ দিনগুলো কাটলো! ...না?...

সাধে কি বলি ভগবানের দান এ জীবন, যে জানে ঠিক মত এর স্বাদ গ্রহণ করতে, সে জানে এ কি মধু!

আর বছর ঠিক এইদিনে পুরী যাওয়া হোল না ব'লে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এবার ঠিক এই দিনেই বেশ কাটলো। শনিবার সুপ্রভা আসবে বলে পত্র পেলুম, বিকেলে বেড়িয়ে এসে একটা কাগজ পেলুম তাতে জানা গেল ওরা কাছাকাছি একটা হোটেলে এসে উঠেছে। দেখা করতে

গেলুম ও তারপর কর্জ্জন পার্কে বেড়াতে গেলুম ওকে নিয়ে। পরের দিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হয়ে ইডেন গার্ডেনে খানিকটা বসে কত গল্প করলুম। কিন্তু সকলের চেয়ে আনন্দ হোল ওকে তুলে দিতে গিয়ে স্টেশনে। কেউ জানতো না যে আমি স্টেশনে যাবো—আমি একটী অদ্ভুত আনন্দ পেলুম। ট্রেণটী ছেড়ে চলে গেলেও কতক্ষণ বেঞ্চিতে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কত ধরণের সূক্ষ্ম অনুভূতি! ভাবুকতা জীবনের খুব বড় একটা সম্পদ। এ যার নেই, সে সত্যিই দরিদ্র। টাকায় কি করে?

শেয়ালদ' স্টেশনে আমার কল্যকার সেই দশ মিনিটের দাম অর্থে নিরূপিত হবার নয়।

বসন্তটা এমনভাবে ভাল করে দেখিনি অনেকদিন। শিবরাত্রির ছুটীতে এবার গেলুম বারাকপুরে। কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে চালকীর মুসলমান পাড়ার ওই কাঁচা রাস্তাটার ধারে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের বনের! তার ওপর নদীর ওপারে, ঠিক গাজিতলার পথের বাঁকে একটা চারা শিমুলগাছে ফুল ফুটেচে, আমি যখন বারাকপুরে যাচ্চি তখন দুপুর রোদ। কি অদ্ভুত যে দেখাতে লাগলো সেই ঝম্ ঝম্ দুপুরে ওপারের সেই ফুলে ভর্ত্তি শিমুল চারাটা! অপ্রকাশিতভাবে গিয়ে দেখি খুকুরা ওখানে আছে। অনেক দিন পরে এখানে ওদের পেয়ে মন খুসি হয়ে উঠলো। আমি ন'দিদিদের রান্নাঘরের দাওয়ায় জল খেতে গিয়েচি, ও দাঁড়িয়ে আছে পুঁটীদিদিদের উঠোনে। বল্লুম—কি রে! তারপরে ওদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম। দুপুরে ওদের রান্নাঘরে বসে পোলাও বিষয়ে একদিন বল্লুম। শিবরাত্রির দিন ন'দিদিদের ঘরে ওদের কাছে শিবরাত্রির ব্রতকথা

শোনালুম। ট্যাংরার মাঠে ইন্দুর সঙ্গে একদিন কুল খেতে গেলুম—বড় খোলা মাঠ, দিক্‌চক্রবাল বড় দূরবিসর্পী, একটা উইয়ের ঢিবির কাছে বসে সেদিন সূর্য্যাস্ত দেখলুম। ঘেঁটুফুল এখানেও খুব ফুটেচে। গণেশ মুচি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েচে, ট্যাংরার ধারে গরু চরাচ্ছিল। লেবুতলার ওই পথে অনেকদিন কেউ আসেনি, যখন রোয়াকে বসে থাকি, এইদিন দেখলাম নীল সাড়ি পরে আসতে ওই পথটাতে বহুদিন পরে।

গত শনিবারে সাউথ গড়িয়া গ্রামে বেড়াতে গেলাম বোধহয় পনেরো বছর পরে। ভূতনাথ এখানে থাকতে আমি এখানে এসেছিলুম, সে কি আজকার কথা? বড় রোদ পড়েচে, বারোটার ট্রেণে ওখান থেকে রাজপুর এলুম। ডুলিদের বাড়ীর পিছনে বাঁশবনের তলায় কেমন ছোট ছোট ঘেঁটুগাছ। বেশ লাগে ওই বাঁশবনের মধ্যের জায়গাটা।

আজ গিয়েছিলুম নীরদবাবুদের মোটরে গরিয়া গ্রামের একটা ভাঙা শিবমন্দিরের ধারে। জ্যোৎস্না উঠেচে খুব, ভাঙা মন্দির আর একটা প্রাচীন বটগাছ—পটভূমিকা বেশ চমৎকার। বেশ লাগলো আজ জ্যোৎস্নাটা। কতক্ষণ বসে গল্প করলুম।

গত সপ্তাহের শুক্রবার থেকে আরম্ভ করে কি ঘোরাই গেল ক'দিন! প্রথম তো শুক্রবার আসাম মেলে রংপুর রওনা হলুম সেখানে সারস্বত-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে। দুপুরের রোদ বেশ বাড়চে—পথে পথে ঘেঁটুফুলের শোভা—সারা পথেই ঘেঁটুফুল দেখতে দেখতে চলেছি। নৈহাটীর কাছাকাছি এসে মনে হোল আমাদের গ্রাম এখান থেকে বেশী দূর নয়—সোজা গেলে হয়তো বিশ মাইলের মধ্যে। এই দুপুর রোদে আমাদের পাড়ার সবাই যে যার ঘরে ঘুম দিচ্চে হয় তো। রাণাঘাট

সভার পরে প্রবোধ বাবুর বাড়ীতে চা খেয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্টেশনে রওনা হলুম! সহরের কয়েকটি ভদ্রলোক আমায় তুলে দিতে এলেন। খুব জ্যোৎস্না, পূর্ব্বদিকের আকাশও খুব উজ্জ্বল। গরম একেবারেই নেই। পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে চড়ে বসলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মা দেখে বড় ভাল লাগলো। ভোর হোল রাণাঘাটে স্টেশনে—তখনও আকাশে নক্ষত্র রয়েচে।

কলকাতার বাসায় গিয়ে স্নান ক'রে বসে আছি, এমন সময় নীরদ বাবুর ড্রাইভার এসে খবর দিলে গাড়ী এসেচে। নীরদ বাবু সস্ত্রীক গালুডি যাচ্ছেন, আমায় সেই সঙ্গে যেতে হবে। তখনি জিনিষপত্র বেঁধে ছেঁদে আবার রওনা। নাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা তিনটার সময় গালুডি পৌছলো। পথে খড়গ্‌পুরের পরে উঁচু ডাঙ্গা ও শালবনের দৃশ্য দেখবার লোভে দুপুরে একটু ঘুম এল না চোখে।

কতদিন পরে আবার নামলুম গালুডি। আজ বছর তিন চার আসিনি—১৩৩৪ সালের পূজোর পর আর কখনো আসিনি। তবে সে গালুডি এখন অনেক বদলে গিয়েচে। নেকড়েডুংরি পাহাড়টা ছাড়া, তার নীচেকার সে চমৎকার শালচারার জঙ্গলটা অদৃশ্য। কে পাথর কেটে নিয়ে যাচ্চে পাহাড়টা থেকে, রোজ সকালে একদল গরুর গাড়ী এসে পাথর কেটে বোঝাই করে নিয়ে যায়—পাহাড়টা এবার গেল। এদিকে কারো জ্ঞান নেই যে ওটা চলে গেলে গালুডির একটা beauty spot চলে যাবে।

অপরাহ্ণে সুবর্ণরেখা পার হয়ে কুমীরমুড়ি গ্রামের জঙ্গলে বসে রইলুম কতক্ষণ। প্রথমে যাচ্ছিলুম রাখা মাইনস্‌-এ। কিন্তু বেলা

গিয়েচে দেখে ভরসা হোল না। একজায়গায় ধাতুপ্ ফুলের ঝাড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম—কাছেই একখানি বড় পাথর। হঠাৎ দেখি বনের মধ্যে একটা গোল্‌গোলি ফুলের গাছে হল্‌দে ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। সেখানে ঢুকে দেখি বনে লতানে পলাশ গাছে পলাশ ফুটেচে, তা ছাড়া একরকম বন যুঁইএর মত কি ফুল ফুটেচে, কামিনী ফুল গাছের মত গাছে। মোরাম্ ছড়ানো মাটি—ঠিক যেন কয়লার টুকরো ছড়ানো পড়ে রয়েচে। বনে বসে মনে হোল কাল ঠিক এসময় রংপুরে টাউনহলের ক্লাবঘরে বসে চা খাচ্চি—আর আজ এসময় সুবর্ণরেখার ধারের বনে! কোথায় ছিলুম কোথায় এসেচি! চাঁদ উঠচে ঠিক সেই গোলগোলি ফুলগাছের পেছনে! প্রকাণ্ড গাছটা—আমাদের দেশের একটা মাঝারি গোছের আমড়া গাছের মত। ফুলগুলো অনেকটা দূর থেকে দেখতে সূর্য্যমুখী ফুলের মত। কতক্ষণ বসে রইলুম, তারপর জ্যোৎস্না ফুটবার পূর্ব্বেই লতানো পলাশের একটা গুচ্ছ তুলে নিয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডি চলে এলুম। . .

বড় সুন্দর জ্যোৎস্না! বাংলার বাহিরে ভিন্ন এ ধরণের ছায়াহীন অদ্ভুত ধরণের জ্যোৎস্না বড় একটা দেখা যায় না। বাদল বাবুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে কালাঝোরা পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে চোখ ফেরানো যায় না যেন—জ্যোৎস্নারাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে যদিও, তবুও কি তার চেহারা!

হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েচি। চা খেয়ে ওপারের বনে বেড়াতে যাওয়ার পূর্ব্বে গালুডির হাটে বেড়াতে গেলুম। ১৯৩৪ সালের গুডফ্রাইডের ছুটির পরে এই হাট আমি আর কখনো দেখিনি। সেই পুরানো দিনের মত টোমাটো, শুটকি মাছ, মহুয়ার তেল বাজে

লাড্ডু আর তেলের খাবার বিক্রী করচে। সাঁওতাল মেয়েরা গল্প করচে, পাঁচগ্রামের লোকের সঙ্গে আলাপ করচে। কাল ঠিক এই সময়ে কিন্তু রংপুরের সভাতে বসে আছি।

পরদিন ভোর ছ'টাতে আমরা চারখানা গরুর গাড়ী করে দীঘাগড়া পাথর খাদানে রওনা হই। প্রথমে তো যাবার রাস্তা এরা ভুল করলে। ফুলকাল ও বনকাটি গিয়ে না গিয়ে প্রায় চলে গেল ঘাটশিলার কাছাকাছি। কালাঝোরা পাহাড়টা প্রায় সেখানে শেষ হয়েচে। বাদলবাবু কেবলই বলে, এখনো পথটা আসিনি, আরও আছে। এমনি করে অনেকটা গিয়ে তারপর বাঁ-পারে পথ পাওয়া গেল। ঝাঁপড়ি শোল বলে একটা সাঁওতালী গ্রামের প্রান্তে গাছতলায় সবাই সতরঞ্চি বিছিয়ে চা খেতে বসা গেল। মেয়েরা চা করতে লাগলেন। ভিক্টোরিয়া দত্ত খাবার দিলেন সবাইকে। বেলা নটা। সামনে কালাঝোর পাহাড় শ্রেণীর পাদদেশে ঘন বন স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। দূরের গ্রামের এক পল্লী বালিকা একমনে বকুলতলায় কি করচে মনে হল। চা খাওয়া শেষ করে একটা সাঁওতাল ছোক্‌রার সঙ্গে দেখা। আমি তখন গরুর গাড়ী ছেড়ে একটু এগিয়ে চলেছি। সে বল্লে—দীঘার চেয়ে বাসাডেরার বন খুব বেশী। কিছু পয়সার লোভে সে আমাদের বাসাডেরা নিয়ে যেতে রাজি হোল। নীরদবাবু কেবলই কালকার জ্যোৎস্না রাত্রির কথা বলছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি আমার হাতে হাত দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন আর একদিন জ্যোৎস্নায় আমরা আবার এখানে আসবো। বনের শোভা বড় সুন্দর। প্রথম বসন্তে শৈলসানুর বনে অজস্র গোলগোলি ফুলের গাছে ফুল ফুটেচে, পলাশ ফুটেচে, শাদা শাদা এক ধরণের ফুল গাড়োয়ানেরা বললে, বুরবা। লোহাজালির ফুলে বেশ সুগন্ধ

—আর যেখানে সেখানে প্রস্ফুটিত শালমঞ্জরীর তো কথাই নেই—সুবাসে দুপুরের বাতাস মাতিয়েচে। বনের মধ্যে একটু কুয়া এক জায়গায় সাঁওতালেরা জল নেয়। আমরা সেই কুয়ায় জল খেয়ে নিলাম। ডাইনে বেঁকে বনের মধ্যে বুরুডি গ্রাম। একটা পাথরের কারখানাতে পাথরের গেলাস, থালা, বাটি, খোরা, তৈরী হচ্ছে, মেয়েরা নেমে কারখানা দেখতে গেলেন—আমরাও গেলুম সঙ্গে। বেলা সাড়ে দশটা। খুকু এতক্ষণ ওদের রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে রাঁধতে বসেচে। ক্রমশঃ বন গভীর হয়ে এল। পথের ধারে বন্য হস্তীর পদচিহ্ন গাড়োয়ানেরা দেখালে। গাইড্ ছোক্‌রা বল্লে বনে খুব মজুর আছে। মজুর? মজুর কি? একজন গাড়োয়ান্ বল্লে বাবু, আপনারা যাকে ময়ূর বলেন। এ বনে যেখানে সেখানে পলাশ গাছ, লতার মত জড়িয়ে উঠেছে অন্য বড় গাছের গায়ে—ফুল ফুটে রয়েচে। গোলগোলি গাছটা এ বনে তত দেখচি নে। একস্থানে খুব উঁচু ঘাট, অনেকটা শিলং-সিলেট্ রোডের মত, ডাইনে নীচু খাদ—গরুর গাড়ী খুব কষ্টে উঠতে লাগলো। বাসাডেরা গ্রামের চারিধারেই পাহাড়, মধ্যে একটা উপত্যকায় একটী সাঁওতালি বস্তি। গ্রামের লোকেরা আমাদের গাড়ীর দিকে অবাক চোখে চেয়ে দেখচে। বাসাডেরা গ্রাম পার হয়ে কি একটা বেগুনি রংয়ের বড় ফুলগাছ দেখলুম জঙ্গলে—খুব জঙ্গল এদিকটাতে। এখানে ঝাটি-ঝর্ণা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে জঙ্গল আরও অনেক বেশী। ঘন জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কত গ্রাম রয়েচে। পাহাড়ী ঝর্ণা তাদের জল যোগাবার একমাত্র স্থান। বাসাডেরা গ্রাম ছাড়িয়ে এমন হোল যে জল কোথাও পাওয়া যায় না—আমি একটী উপলাকীর্ণ শুষ্ক নদী খাতের পাশের জঙ্গলে একটা মোটা লতার ওপর উঠে বসে রইলুম। একটু

পরে গাইড্ এসে জলের সন্ধান দিলে। পাহাড়ী ঝর্ণা বেয়ে এক জায়গায় জলাশয় সৃষ্টি করেচে। আমি সাঁতার দিয়ে সেই জলাশয়ে স্নান করলুম। মেয়েরা রান্না চড়িয়ে দিলেন। আমি ও কনক ডান দিকের পাহাড়টাতে উঠলুম। কনক কিছুদূর গিয়ে আর উঠতে সাহস করলে না—আমি একটা মসৃণ পাথর পেয়ে উঠে গেলুম। খুব ওপরে প্রায় পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে দাঁড়িয়ে চারি দিকের পাহাড়গুলো চেয়ে দেখলুম। সব পাহাড়ের মাথাতেই বন। বনে আগুন লেগেছিল কিছুদিন আগে এখনও এ পাহাড়ে একটা মোটা শেকড় ধোঁয়াচ্ছে। একটা শিবগাছের রেণু হাতে মেখে মুখে দিলাম, যেন পাউডার মুখে মাখচি এমনি শাদা হয়ে গেল। নামবার সময় মসৃণ পাথর খানা বেয়ে আর নামতে পারিনে, মাঝামাঝি এসে আটকে গেলাম—অবশেষে একটা শেকড় ধরে এসে নামলুম কণক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অবস্থা দেখে কণকের ভয় হয়ে গিয়েছিল। আরও নেমে এসে তবে সেই জলাশয় ও সেই প্রস্তরাকীর্ণ উপত্যকা, যেখানে মেয়েরা রান্না করবেন। নেমে এসে দেখি রান্না হয়ে গিয়েচে।

খাওয়া দাওয়া সারতে ও বিশ্রাম করতে বেলা গেল। রওনা হবার সময়ে দেখি আমার পায়ের আঙ্গুলে পাহাড়ে ওঠবার সময়ে যে চোট লেগেছিল, তার দরুণ দস্তুরমত ব্যথা হয়েচে। সুতরাং গরুর গাড়ীতে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে এমন সুন্দর অপরাহ্ন নষ্ট ক'রে ফেলতে হোল বাধ্য হয়ে—কেবল পাহাড়ের ঘাট পার হয়ে ঘন জঙ্গলের পথে খানিকটা খালি পায়ে হেঁটে এসেছিলুম। পথে জ্যোৎস্না উঠলো। এক জায়গায় বনের মধ্যে গাছ তলায় আমরা সতরঞ্জি পেতে বসে চা করে খেলাম, গল্পসল্প করলাম। তারপর ক্রমেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটলো অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাময়ী

রাত্রি। আর সেই বনভূমি, অজস্র গোলগোলি ও পলাশ যেখানে ফুটে রয়েচে, যদিও জ্যোৎস্না রাত্রে এমন ফুল আদৌ দেখা যাচ্চে না। নন-কাটি নামে একটা খুব বড় সাঁওতালী গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা বড় শাল বনের পাশ কাটিয়ে রাত এগারোটার সময়ে গালুডি এলাম। আমরা যখন এলুম, তখন মেইল ট্রেনের ঘণ্টা পড়লো স্টেশনে।

পরদিন দোল। ভিক্টোরিয়া দত্তদের বাড়ী রং খেলা হল—আমি শাল মঞ্জরী ভেঙে নিয়ে আজ প্রায় চার বৎসরের পরে বলরাম সায়েবের ঘাটে নাইতে গেলাম। বিষ্ণু প্রধান নাইচে, দোল খেলার রং সাবান দিয়ে তুলে ফেলচে। স্নান করবার সময়ে কালাঝোর পাহাড় শ্রেণীর দৃশ্য আর সেই একটা গাছের আঁকা বাঁকা সীমারেখা যেন ঠিক একটা ছবির মত মনে হচ্ছিল। দুপুরে খুব ঘুমিয়ে উঠে চা খেয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে ও পারের জঙ্গলে বেড়াতে গেলুম। একটা গাছ ঠেস্ দিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পায়ে ব্যথা ছিল। কিন্তু বেশী হাঁটতে হয় নি। কালকার গাড়োয়ান সুজন গাড়ী নিয়ে যাচ্ছিল, তার আগে গাড়ী নিয়ে যাচ্ছিল পঞ্চুবাবুর বাংলোয় আমাদের পুরোনো চাকর কেষ্ট। সুজন আমায় গাড়ীতে উঠিয়ে নিলে—তারা পাথর আনতে যাচ্চে সুবর্ণরেখার ওপারে।

কতক্ষণ বসে থাকার পরে চাঁদ উঠলো। ছোট শাল চারার জঙ্গল—অপূর্ব্ব শোভা হোল চাঁদের আলোতে! কতক্ষণ জঙ্গলে এখানে ওখানে বসি, কখনও বা শুক্‌নো শাল পাতার রাশির ওপর শুই। সুবর্ণরেখার নদীগর্ভে কতক্ষণ ওপারের পাহাড়ের আলোর মালার দিকে চেয়ে বসে রইলুম। জ্যোৎস্না পড়ে নদীখাতের শুক্‌নো বালির রাশি চক্‌চক্ করচে, দূরে মৌভাডার আলো—ডাইনে টাটার আলো। ওপারের জঙ্গলের

রেখা মুসাবনীর দিকে বিস্তৃত—অল্পক্ষণের জন্যে মনে হোল ঠিক যেন ইস-মাইলপুরে ঘোড়া করে জ্যোৎস্না রাত্রে বন ঝাউয়ের বনের পাশ দিয়ে কাছারী ফিরচি ভাগলপুর থেকে। বাড়ী ফিরে এসে দেখি গালুডি শুদ্ধ মেয়ে পুরুষ একত্র হয়েচে—দোলের ভোজ হচ্চে, মাংস, পোলাও কত কি আয়োজন। আমায় দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠলো—Leader-এর এ কি ব্যাপার! এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন?...ইত্যাদি।

খাওয়া দাওয়া সেরে রাত বারোটায় রাঁচী এক্সপ্রেসে কলকাতা রওনা হই। আজ এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে জেগে বসে থেকে জ্যোৎস্নাময়ী মুক্ত প্রান্তর ও দূরবর্ত্তী শৈলমালার কি শোভাই যে দেখলুম, তা বর্ণনা করতে গেলেই ছোট হয়ে পড়ে। সে মহিমা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে বোঝাবার না। রাত্রে সারারাতই জ্যোৎস্নালোকিত শালবনের শোভা দেখতে দেখতে এলাম। খড়্গপুর ছাড়িয়ে একটু ঘুমিয়ে ছিলাম।

সেদিনই স্কুলের পর ভাটপাড়া গেলাম। রাত আটটার সময় ঘোড়ার গাড়ী ক'রে ঘোষ পাড়ায় দোল দেখতে গেলুম—সঙ্গে ছোট মামীমা ও মাসীমা। বাল্যদিনে গরিফা হয়ে হালিসহর হেঁটে দু' একবার গিয়েছি, সে অনেককালের কথা। তারপর কতকাল পরে আবার গরিফা দেখলুম, হাজিনগর মিল দেখলুম, হালিসহরে পাম্প-ওয়ালা বাঁধা ঘাট ও ৺ ঈশান মিত্রের বাড়ী দেখলুম। হালিসহরের বাজারের সেই সব সুপরিচিত গলি ও রাস্তা দেখতে দেখতে বাস্ ও কাঁচড়াপাড়া ছাড়িয়ে রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময়ে ঘোষ পাড়ার মেলাস্থানে পৌঁছে গেলাম। মেলার স্থান, ডালিমতলা ইত্যাদি হয়ে পালেদের বাড়ীর মধ্যে গেলুম, গোপাল পাল সেখানে মোহান্ত সেজে বসে যাত্রীদের কাছে পয়সা আদায় করচে। নগেন পালের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম—সে এক সাহার কাপড় সংক্রান্ত কি

মোকর্দ্দমার মীমাংসা আমায় করতে দিলে আমি বল্লুম—ও সব এখন পারবো না।

মামার বাড়ী গিয়ে নিচুতলার দিকে দরজা খুলে ছাদের ওপর গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না ফুট্ ফুট্ করচে ছাদের ওপরে। নীচের ছোট ঘরটা বা যে ঘরে গৌরী বসে পান সাজতো—সে সব ঘর বেড়িয়ে এলুম। খুড়ুদের বাড়ীর ছাদের মত—এই তো সবে রাত দশটা—হয়তো ন'দিদিদের বাড়ী সবাই গল্প করচে, কি তাস খেলচে। ছোট-মামীমা চা করছে, আমরা গল্প করতে করতে চা পান করলুম। পটল মামার এক ছোট মেয়ে বেড়াতে এল। তারপর কালীতলার পথ দিয়ে আমরা ওপাড়ায় বেড়াতে গেলুম। রাত এগারোটার সময় মেয়েদের আলাপ শেষ হোল, সবাই মিলে আবার এলুম দোলতলায়। কোথায় কাল এ সময়ে গালুডিতে দোলের ভোজ চলচে, দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি ও কালাঝোর শৈলমালা ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট দেখাচ্চে—আর আজ কোথায় কোনো পুরোনো স্মৃতি জড়ানো রাজ্যের বুকের মধ্যে এসে পড়েছি! রাত অনেক হয়েচে। শান্তিদের দোকানে গিয়ে ওকে জাগিয়ে কদমা কিনে সবাই ঘোড়ার গাড়ীতে এসে উঠলুম। রাত ত্নটোতে ভাট পাড়াপৌছাই।

•

ভাটপাড়া থেকে এলুম শুক্রবার সকালে, শনিবার গেলুম বনগাঁ। এই সপ্তাহটা অদ্ভুত ধরনের বেড়ানো হোল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। বনগাঁ পৌছেই চলে গেলুম খয়রামারির মাঠে ও রাজনগরের বটতলাটাতে। মনে পড়ল আজ যখন বটতলায় ঝুরি ঠেস্ দিয়ে বসে, সেদিন এম্‌নি সময় কুমীরমুড়ির জঙ্গলে সুবর্ণরেখার ওপারে ঠিক এম্‌নি একটা গাছ ঠেস্ দিয়ে বসেছিলুম—কিম্বা তারও আগের দিন বাসাডেরার বন্যপথ

দিয়ে গরুর গাড়ী করে গালুডি ফিরচি। ওখানে কতক্ষণ বসে তারপর মাঠের মধ্যে এসে বসলুম। হু হু হাওয়া বইচে, রোদ-পোড়া মাটীর সোঁদা গন্ধে বাতাস ভরপুর।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুর চলে গেলুম। খুকু রান্নাঘরে রাঁধচে, বেলা দশটা, আমি ইন্দুদের বাড়ী একটু বেড়িয়ে তারপর খুকুদের রান্নাঘরে গিয়ে ডাক্‌চি, ও খুড়ীমা, খুড়ীমা!—খুকু আমায় দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েচে, বল্লে—আপনি কখন এলেন? বললুম, এই তো খানিক আগে আসচি। দুজনে গল্প করচি, তখন খুড়ীমা এলেন। আমি একটু পরে বরোজপোতার বাঁশবনে ঘেঁটুফুলের বন দেখে স্নান করতে গেলুম আমাদের ঘাটে। তিত্তিরাজ ফলের বীচির গন্ধ, মাটীর গন্ধ, শুক্‌নো পাতা ও ডালের গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, কঞ্চির গন্ধ—নানা প্রকার জটিল ও বহুদিনের সুপরিচিত, বহুদিনের কত পুরোনো-কথা-মনে-আনিয়ে-দেওয়া গন্ধের সমাবেশ। তাই আমাদের ঘাটে স্নান করে উঠে কুলতলাটা দিয়ে যখন আসি, মন যেন এক মুহূর্ত্তে নবীন হয়ে বাল্যদিনে চলে গেল বাল্যদিনের পরিচিত গন্ধে। গালুডি ও সিংভূমের বনের সঙ্গে কোনো স্মৃতি নেই কাজেই তা রুক্ষ ও বন্য—বাংলা দেশের এই প্রকৃতি মায়ের মত নিতান্ত আপন, নিতান্ত ঘরোয়া এর প্রতি ভঙ্গিটী আমার পরিচিত ও প্রিয়।

চলে আসবার সময়—সন্ধ্যার গাড়ীতে চলে এলুম— খুকু ওদের দাওয়ার পৈঠেতে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। চুমরি বাগানে কি অজস্র ঘেঁটুবন, আর কি তার মিষ্টি গন্ধ! আমার মনে ভারী আনন্দ, আর তার সঙ্গে ঘেঁটুফুলের গন্ধটা মিশে আনন্দ ঘনীভূত করে তুললে। বেলা পড়ে এসেচে, হাট থেকে লোক ফিরচে। নানা রকম গাছ, লতাপাতার সুগন্ধ বেরুচ্চে

—শুকনো জিনিসের গন্ধই বেশী, শুক্‌নো ফল, শুক্‌নো মাটী, শুক্‌নো রড়া-ফলের বীজ, শুক্‌নো ডাল পাতা—এই সব গন্ধ।

রাত সাড়ে দশটায় এসে কলকাতায় পৌঁছাই, গত শুক্রবার রংপুর যাওয়া থেকে আরম্ভ করে নানা রকম বেড়ানোর এ অভিজ্ঞতা সপ্তাহে যা হোল, সচরাচর ঘটে না। রংপুর থেকে এসেই গালুডি ও বাসাডেরার জঙ্গল—অমনি সেখান থেকে ফিরেই পুরোনো বাল্যদিনের হালিসহর, শ্যামাসুন্দরীর ঘাট, বল্‌দেকাটা বাগ ও কাঁচড়াপাড়ার মধ্যে দিয়ে ঘোষ-পাড়ার দোল ও মুরাতিপুরের বাড়ীর ছাদে জ্যোৎস্না রাত্রে বসে চা খাওয়া—অমনি সেখান থেকে পরদিন রাজনগরের বটতলা ও বরোজপোতার বাঁশবন ও ঘেঁটুবন, এ সত্যিই অতি দুর্ল্লভ আনন্দ!

প্রায় একমাস লিখিনি। অনেক রকম ব্যাপার গেল মধ্যে। এক-দিন রাজপুর রিপণ লাইব্রেরীর উৎসবে কৃষ্ণধন দে, অপূর্ব্ব বাগচি, রমা-প্রসন্ন ও গৌরকে নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। ভাঙা রাসমঞ্চে বসে ভম্বলের সঙ্গে সেদিন খুব আনন্দ করা গিয়েছিল। মাচাতলায় বসে ফুলির সঙ্গে অনেক গল্প করি। ফুলিদের বাড়ী আবার ওরা সবাই চা খেলে। জ্যোৎস্না রাত্রে ওদের বাড়ীর সামনে মাঠে বসে বেশ লাগছিল।

তারপর ইষ্টারের ছুটীর আগে একটা শনিবারে বনগ্রামে গেলুম এবং ছোটমামার ছেলের পৈতের জন্যে বৈকালের ট্রেনে রানাঘাট হয়ে এলুম। সেদিনটাতে নিজের মনের চিন্তা নিয়ে ভারী আনন্দ পেয়েছিলুম। মামার বাড়ীতেও সন্ধ্যার সময় অনেকের সঙ্গে আলাপ হোল।

ইষ্টারের ছুটিটাও এবার বেশ কেটেচে। খুকুরা ওখানে আছে। আমি বসে কাগজ দেখতুম, খুকু এসে ডাকতো ওদের উঠোন থেকে—

বলতো এদিকে আসুন না? গিয়ে গল্প করতুম। ওদের রান্নাঘরে বসে কত গল্প করেচি।

বনগাঁয়ের সরকারী ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী একদিন গ্রামোফোন নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ী হাজির। খুব গান হোল। খুকুরা ছাদ থেকে শুনলে।

আমি ও ইন্দু জ্যোৎস্না রাত্রে রোজ নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম—এক-দিন তেঁতুলের নৌকোতে পার হয়ে ওপারের উলুটি বাচড়ায় বসে কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করি।

খুকু একদিন বল্লে—চা খাওয়াবো, সন্দেবেলা আসবেন। গেলুম সন্দেবেলা, কিন্তু সেদিন কি একটা কাজ পড়াতে চা খাওয়া আর হোল না।

সেদিন মরগাঙের ধারে বেলেডাঙায় পাঠশালার নীচে গিয়ে বসেছিলুম ইন্দুর সঙ্গে। ইষ্টার মণ্ডের দিন রত্নাদেবী দেখা করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে টাওয়ার হোটেলে খুব গল্প গুজব করি। তিনি তাঁর হাতে আঁকা ছবি একখানা দিলেন আমায়।

আজ বহুদিন পরে গিয়েছিলুম নন্দরাম সেনের গলিতে সেই প্রসন্নদের বাড়ী। বাল্যে এখানে কিছুকাল কাটিয়েচি। আমার তরুণী মায়ের মুখের শাঁখ যেন এই সন্ধ্যায় এ অঞ্চলে কোথায় আজও বাজচে। প্রসন্ন বসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। প্রসন্নের মা মারা গিয়েচেন গত ফাল্গুন মাসে। সেই মাথম বুড়ী এখনও বেঁচে আছে।

গ্রীষ্মের ছুটীতে দেশে এসেচি। বেশ লাগচে এবার। ছুটী হবার দুদিন আগেই এসেছিলুম, বনগাঁয়ে প্রথমদিন দুপুরবেলা খয়রামারির মাঠে

বেড়াতে গিয়ে বিল্বফুলের সুগন্ধ আর দুপুরের খর রৌদ্র, নীল আকাশ আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে একঘেয়ে কলকাতার সংকীর্ণ জীবন ছেড়ে মুক্ত প্রকৃতির কোলে এসে পড়েচি। দু'দিন পরেই বারাকপুর এলুম, খুকু এখানেই আছে, সে সকালে শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে গল্প করে—বনসিমতলার ঘাটে আবার সেদিন ওর সঙ্গে দেখা নাইবার সময়ে, আজ দুপুরে যখন ঝড় উঠলো, ও এল ছুটে আম কুড়ুতে. আমি বিল্‌বিলের ধারের আম গাছটায় দুটো আম ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলুম—দুটো মোটে পেয়েছিল —দুটোই দিয়ে দিলে আমাকে। স্নান করে এসে রোয়াকে দাঁড়াতেই ছুটে ওদের সামনের উঠোনে এসে জিগ্যেস করলে—বনগাঁয়ে যে বিয়েতে গিয়েছিলেন—বর কেমন হোল তাদের?···এ সব ১৯৩৪।৩৫ স্যালের সুন্দর গ্রীষ্মাবকাশ মনে এনে দেয়।

সত্যিই এবার ভারী ভা'ল লাগচে এখানে এসে। একদিন কুঠীর মাঠে বৈকালে বেড়াতে গিয়েচি, দেখি দুজন লোক খাঁচা নিয়ে ফাঁদ পেতে ডাক পাখী আর গুড়গুড়ি পাখী ধরচে। গুড়গুড়ি পাখী ডাকে কেমন সুন্দর! আমি ও ডাক অনেক শুনেচি, কিন্তু ও যে গুড়গুড়ি পাখীর ডাক তা জানতুম না।

কাল বৈকালে আদিত্য বাবুর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে বিকেলে গেলুম বনগাঁ। সঙ্গে ইন্দুর ছেলে গুট্‌কে গেল। চালকীপাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কি চমৎকার গ্রাম্য-ছবি চাষার মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাইয়ে হাত মুখ ধুইয়ে দিচ্চে, কেউ বা কাঁথা-সেলাই করচে, ঘরের দাওয়ায় বসে। সারা পথ বেশ ঝড়ের মত হাওয়া—দুপুরের অসহ্য গুমটের পরে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। চাঁপাবেড়ের কাছে ভীষণ মেঘ ও কালবৈশাখীর ঝড়। ডালপালা, ধুলোকুটো উড়িয়ে নিয়ে আসচে—পথ দেখবার যো নেই

উৎকর্ণ

—ঢং ঢং করে ছ'টা বাজলো। আমি একটা শিশুগাছের গুঁড়িতে ছেলেটাকে নিয়ে বসি। বাসায় পৌঁছে ওকে কিছু খাবার খাওয়ালুম। মন্মথ বাবুর নিচুতলার আড্ডায় খুব গল্প করে আদিত্যবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাই। গরমে কিন্তু রাত্রে ঘুম হোল না। জলপাইগুড়ি ছাত্র-সমিতি থেকে সেখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েচি, কিন্তু এখন যাওয়া অসম্ভব।

আজ সকালে দুজনে দিব্যি হেঁটে বারাকপুর এলুম। পথে চালকী দিদির বাড়ী গেলুম। দিদি যত্ন করে বেলের পানা, চা, ক্ষীর কাঁটাল খাওয়ালেন।

বাড়ী আসবার একটু পরেই নামলো বৃষ্টি। সেই থেকেই বাদলা চলচে—এখন বেলা পাঁচটা, বৃষ্টি গুঁড়গুড়ি পড়চে। কাল গিয়েচে যেমন অসহ্য গরম, আজ তেমনি ঠাণ্ডা।

সুপ্রভাকে পত্র দিয়েচি, তার চিঠিও এরই মধ্যে পাবো আশা করচি। ইতিমধ্যে পিরোজপুর থেকে যে নিমন্ত্রণ এসেচে, তারই কি করা যায় ভাবচি। সভাসমিতি করে বেড়ানো এ সময়টা মোটেই ভাল লাগে না।

আজ সকালে গোপালনগরে গিয়ে অনেকগুলো চিঠি ডাকে দিলুম। বাড়ী এসে আমতলায় চেয়ার পেতে বসে অনেক দিন পরে Cleopetra পড়চি, এমন সময় খুকু আমার কাছ দিয়ে ন'দিদিদের বাড়ী থেকে গেল। ইচ্ছে করেই গেল, কারণ সুপ্রভাকে চিঠি লিখতে চাইনি। সেই রাগটা কম করাতে যে এল, এটি বেশ বোঝাই যায়। ওদের দাওয়ার এ ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত গল্প করলে।

বিকালে আমি The Croxley Master বলে Conan Doyle-এর

একটা গল্প পড়তে পড়তে বেলা গড়িয়ে ফেললাম। উঠতে আর পারিনে—এমন কৌতূহল। Conan Doyle ছোট গল্পে ভালো শিল্পী ছিলেন। তাঁর A Struggle of '15 এবং আরও দু' একটা গল্পের মধ্যে দেখেচি, বড় শিল্পীর কৌশল বর্ত্তমান। এত খুঁটিনাটি বর্ণনার ওপর দখল (অদ্ভুত দখল!) নিম্নশ্রেণীর শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সামান্য একটু আধটু সেকেলে clap-trap টেক্‌নিক্ আছে—তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

তারপর কুঠীর মাঠ দিয়ে আইনদ্দির বাড়ীর পেছনকার উঁচু মরগাঙের পাড় পর্য্যন্ত গিয়ে সেখানে খানিকটা বসে রইলুম। বেলা একেবারে গিয়েচে। সেই যে রাখাল ছোঁড়া আমায় তামাক খাওয়াতো। গত কার্ত্তিক মাসে যখন কুঠীর পেছনের বন ঝোপের ধারে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম—সেই ছোক্‌রা দেখি পুলের নীচের ঘাট থেকে নিয়ে উঠচে। বল্লে—ভালো আছেন দাদাবাবু? কবে এলেন?

একটু পরে প্রমথ ও তার ভাই এর সঙ্গে দেখা। সাইকেলে গোপালনগর থেকে ফিরচে। সে বনগাঁ স্কুলের মাষ্টার। তার জানবার একমাত্র দরকার দেখলুম ওদের স্কুলে ছেলেরা বাংলায় কত নম্বর পেয়েচে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বেলেডাঙায় গোয়ালাদের দোকানে বসে একটু গল্প করে মাঠের মধ্যে দিয়ে এসে যখন আমাদের ঘাটে নাইতে নামলুম—তখন অন্ধকার আকাশ তারায় তারায় ভরে গিয়েচে। সাঁতার দিয়ে গেলুম ওপারে। এ পারের ঘন অন্ধকার বন ঝোপে কি জোনাকী পোকার মেলা!

ফিরে এসে খুকুদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম—হীরাবাই ও কেশরীবাই এর গানের সম্বন্ধে, 'Life of Emile Zole' ফিল্ম সম্বন্ধে। খুকু বল্লে—সেই যে কি একটা ফিল্ম দেখেছিলেন—পাহাড় থেকে পড়ে গেল, কি একটা চমৎকার কথা আছে তাতে?

উৎকর্ণ

আমি তখনই বুঝতে পেরেচি ও 'A Tale of Two Cities'-এর কথা বলচে।

বল্লুম—কথাগুলো কি? 'I am the life and the Ressurrection He who believeth in Me'—এই পর্য্যন্ত বলে উঠলো—হাঁ, হাঁ—ঠিক।

বল্লুম—পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া তো নয়—গিলেটিনে যখন ওদের প্রাণদণ্ড হচ্চে—সে সময়।

ও বল্লে—ঠিক এবার সব মনে হয়েচে।

মনে এবার কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও উত্তেজনা।

কাল পচার সঙ্গে বিকেলে কুঠীর মাঠের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে যখন বেলেডাঙায় কামার দোকান পর্য্যন্ত গিয়েচি, আইনদ্দি চাচা ডাক দিলে।

—কি চাচা, কেমন আছ?

চাচা বিদ্যাসুন্দর ও মহাভারত দিব্যি মুখস্থ বলে গেল। বল্লে একখানা বিদ্যাসুন্দর আমার ছেল, কে যে নিয়ে গেল!

তারপর আমরা গিয়ে কলাতলার দোয়ারে বসলুম। ভারী সুন্দর জায়গা। অনেকখানি জল আছে। জলের একধারে ফুল ফোটা ঝিঞের ক্ষেত। জলের ধারে দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাস। বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা জায়গা। দূরে বট অশ্বত্থের সারি।

আজ বৈকালে কলাতলার দোয়াতে বেড়াতে গেলুম। চমৎকার ঝিঙের ফুল ফুটেচে। অনেকক্ষণ কাটালুম বৈকালে—এদের সকলের কথাই মনে

হোল। ঘর সংক্রান্ত একটা গোলমাল হয়েচে, মট্‌কা কাল ঝড়ে উড়ে গিয়েচে—ভগবান এ বিবাদ থেকে উদ্ধার করুন।

অনেকগুলো চিঠি নানা জায়গা থেকে আজ এসেচে। প্রকাশকদের নিকট থেকে সভাসমিতি সংক্রান্ত ইত্যাদি। সুপ্রভার চিঠিও ছিল। কলাতলায় দোয়াতে জলের ধারে বসে কত কথা মনে এল্। রেণুর একখানা পত্রও পেয়েচি আজ অনেকদিন পরে। চাটগাঁয়ে গিয়েছিলুম সেই কতদিন আগে—এখন আমাদের দেশের এই খেজুরের কাঁদি ভরা খেঁজুর গাছ, ওল গাছ, ঝিঙের ক্ষেত, ধানক্ষেত, বট অশ্বত্থের গাছ, ওপারে আরামডাঙ্গার বাঁশবনে অস্ত সূর্য্যের হলুদে রো'দের দিকে চেয়ে সে কথা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

গোপালনগর যাচ্চি, দারিঘাটার পুল থেকে বাঁওড়ের ওপারের কি একটা গাছ, অনেকখানি নীল আকাশ—দেখে মনে হোল এই অপূর্ব্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের পিছনে যে শক্তি আছেন, সেই শক্তি মানুষের সুখদুঃখে সাড়া দেন এবং benevolent নিশ্চয়ই—ওবেলা একটা বিশেষ ঘটনায় তার প্রমাণ পেয়েচি। মনে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগালো এই কথাটা ভেবে। বস্তুতঃ এই ভাগবতী শক্তি—যে মুহূর্ত্তে আমরা জীবনের পথে মেনে নেবো—এর বাস্তবতা অনুভব করবো—সেই মুহূর্ত্তে আমরা আধ্যাত্মিক নবজীবন লাভ করবো।

সন্ধ্যার পরে ইন্দুদের বাড়ী বেড়াতে গেলুম। ফণিকাকা ছিল বসে—১৩০৫ সালে রামচাঁদ মারা যান, সে কথা হোল। যুগলকাকার মা আর সরোজিনী পিসিদের, ত্রিনয়নী পিসিমা (তখন বালিকা) ফণিকাকাদের বাড়ী থাকতো সারাদিন, খেতো—কারণ খুব গরীব তখন ওরা—সেইসব গল্প শুনলুম।

রোয়াকে বসেচি। তারা ভরা আকাশ। গভীর রাত্রি। পাশের বাড়ীতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে। আবার সেই সক্রিয়, হৃদয়বান, (পার্থিব ভাষায়) benevolent শক্তির কথা মনে এল। এই শক্তিই ভগবান। যে মনে মনে একে মানে, এই শক্তির বাস্তবতা অনুভব করে প্রাণে প্রাণে, সে সকল বিপদ, দুঃখ, সংকীর্ণতা, মলিনতাকে জয় করে।

বৈকালে সাজিতলার ঘাটে টিনের চালায় আমি আর পচা গিয়ে বসলুম। সারাদিন ঝড় চলচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসচে।

বাল্যে আমি আর ভারত এমন দিনে এই গ্রীষ্মের ছুটীতে দিগম্বর পাটনীর খেয়া নৌকাতে মাধবপুরের হাটুরে লোকদের পার করতুম—সে কথা মনে পড়লো। একবার আমায় পাঠশালার সহপাঠি বন্ধু পার্ব্বতী আর তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে কি আনন্দের দিনই গিয়েচে!

শম্ভু কি করে মারা গেল ইন্দু সেই গল্প করছিল। ওখান থেকে উঠে আমরা কুটীর মাঠের দিকে গেলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে মেঘান্ধকার আকাশের নীচে এপার ওপারের শ্যামল মুক্ত মাঠ ও বনানীর, ক্ষুদ্র নদী ইছামতীর কি শোভা! পচাকে আর সঙ্গে নিয়ে যাবো না—কথা বলে সব মাটি করে দেয়।

ভীষণ ঝড়বৃষ্টি সকাল থেকে। এক মুহূর্ত্তের জন্যে বিরাম নেই। খুড়ীমা এলেন বৃষ্টি মাথায় চা নিয়ে। বল্লেন—খুকু করেচে, বলছিল, বিভূতি দা'কে একদিন চা করে খাওয়াবো বলেছিলাম তা আজ করি। একটু

পরে চায়ের বাটি ওদের বাড়ী দিতে গিয়েচি, খুকু বল্লে—জল খাবেন না? মা জিগ্যেস করো। অর্থাৎ মুড়ি দিয়েছিল চায়ের সঙ্গে তাই জল খাবো কিনা জিগ্যেস করচে। জলের ঘটি ওর কাছেই ছিল, নিয়ে জল খেলাম। তারপর গোপালনগর এলাম 'আরণ্যক'-এর প্রুফ্ ডাকে দিতে। মাঝের গাঁয়ের জিতেন সাধু দেখি তেরোখানা মটর নিয়ে চলেচেন। চালকীর জিতেন দা' একখানা মোটরে ছিলেন—সেখানায় দেখি মোটেই স্থান নেই। কাছেই তখন রেল লাইন দিয়ে হেঁটেই পাঁচ মাইল রাস্তা চলে গেলুম। পূর্ব্ব দিকের আকাশ চমৎকার নীল দেখতে হয়েচে। আমিও ষ্টেশনে পৌঁছেচি! অন্ধকারও নামলো। অমূল্যবাবুদের বাড়ী গিয়ে সারা রাত জাগা, বিজয় মুখুয্যে আর অনাথ বোসের গান হোল। রাত চারটে যখন বেজেচে তখন বীরেন সামনের একটা বাড়ীর দোতলায় শোয়াতে নিয়ে গেল আমায়। তখন ঘুম হওয়া সম্ভব নয়, একটু পরেই ফর্সা হয়ে গেল। আমি মিনুদের বাড়ী চলে এলুম। সেখানে ওরা ছাড়লে না—খাওয়া দাওয়া করিয়ে তবে ছেড়ে দেয় বেলা দুটোর পরে। আড়াইটার ট্রেণে জিতেন ঠাকুরের দলবলের সঙ্গে গোপালনগরে নামি। ওরা মোটরে কলকাতা চলে গেল। তারপর নামলো ঘোর বৃষ্টি। আমি এখানে ওখানে বসে গল্প করে সন্ধ্যার আগে বাড়ী এলুম। খুড়ীমা ডাকছেন ও বাড়ী থেকে বিভূতি এলে নাকি? বল্লুম—হ্যাঁ খুড়ীমা। তারপরে ওদের ওখানে গিয়ে কাল ঘরে রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করি।

সকালে বিশেষ কাজে গোয়াড়ী যেতে হয়েছিল। একটা বড় চমৎকার অভিজ্ঞতা গেল। আজ প্রায় ৫৩ বছর পরে আমাদের বাল্যের চাটুয্যে

বাড়ীর ঠাকুর মায়ের নাতনী লীলা দিদির সঙ্গে দেখা হলো। গোয়াড়ীর মধ্যে এক সময়ে যদু চাটুয্যে বিখ্যাত উকীল ছিলেন, লীলা দিদির সঙ্গে তাঁর বড় ছেলে হরি চাটুয্যের বিবাহ হয়েছিল। লীলা দিদি এক সময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন—আমি ৩৩ বছর পূর্ব্বে বাবার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিলাম বছর সাতেক বয়স তখন। লীলাদি কড়ায় করে মাছ ভাজছিলেন—সেকথা আমার মনে আছে। এখন তিনি বৃদ্ধা।

কাল ওঁদের বাড়ী গিয়ে দেখি যদুবাবুর বাড়ীর পূর্ব্বের সে সমৃদ্ধি কিছুই নেই। চাকরে বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা বসে আছেন—এই বৃদ্ধা যে ৩৩ বছর পূর্ব্বের সেই সুন্দরী লীলাদিদি। (এখনও আমার একটু একটু মনে আছে বাল্যেদৃষ্ট তাঁর সে অপুর্ব্ব রূপ)। তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও মন দিয়ে গ্রহণ করা শক্ত।

লীলাদিদির এক ছোট বোন, তার নাম যোগমায়া—ছেলেবেলায় আমার খেলার সাথী ছিল। লীলাদিদিই বল্লেন—যোগমায়া আমার মেজমেয়ের বয়সী। সুতরাং যোগমায়া লীলাদিদির চেয়ে অনেক ছোট। আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিল যোগমায়া। খুকুদের বাড়ীতে বাঁশের ও থলের দোলায় করে খেলা করেছিলুম মনে আছে। কার কাছে যেন শুনেছিলুম—সেও আজ ১৫।২০ বছর আগে, যে যোগমায়া মারা গিয়েচে। মনে দুঃখ হয়েছিল। কাল হঠাৎ লীলাদিদির কাছে যোগমায়ার নাম করতেই তিনি বল্লেন—যোগমায়া ও এখানে আছে, খোড়োর ধারে তার বাসা।

আমি তো অবাক।

সেই যোগমায়া!···বিশ বছর আগে শুনেছিল যে মরে গিয়েচে—আজ বিশ বছর ধরেই মনে মনে ঠিক করে রেখেচি যোগমায়া নেই।

সে যদি আজ হঠাৎ বেঁচে আছে শোনা যায় তবে সেটা যেন পুনর্জন্মের মত রহস্যময় শোনায়।

যোগমায়ার সঙ্গে দেখা করা কিন্তু ঘটে উঠলো না। ট্রেনের সময় ছিল না। লীলাদি চা, খাবার খাওয়ালেন। দেখা করে বিদায় নিলুম।

এই তো গোয়াড়ী—একদিন দেখা করবো যোগমায়ার সঙ্গে।

সুপ্রভার পত্র শ্যামাচরণ দাদা দিলে হাজারির দোকানে, আমি তখন ষ্টেশনে যাচ্ছি। ট্রেণে পত্রখানা পড়তে পড়তে গেলুম। বেশ আনন্দ পাওয়া গেল পত্রখানা পড়ে।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল, কারণ অনেকদিন পরে মেঘ দূর হয়ে রৌদ্র উঠেছিল। খুকু কতকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের শিউলিতলায় বন্দি করলে। বল্লে ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কষ্ট হয়, না? আমি বল্লুম—সময়ের সার বর্ত্তমান। ভবিষ্যতের ভাবনা মিথ্যে।

বৈকালে পরিষ্কার আকাশের তলা দিয়ে পচার সঙ্গে কলাতলার দোয়া পার হয়ে সুন্দরপুরের কাছাকাছি গেলুম বেড়াতে—একজায়গায় জলের ধারে দুজনে বসে ওর পঞ্চানন মামা কি ক'রে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিল সে গল্প শুনি। এক গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে ছিল পরমা সুন্দরী, তার বাপকে ওদের সে বখাটে মামা শোনালে যে পচাদের বিষয়ের আট আনার অংশীদার। বিয়ে হয়ে গেল—তারপর মেয়েটার কি দুর্দ্দশা! গল্পটা শুনে মনে বড়ই কষ্ট হোল।

জলের ধারে ঝিঙের ফুল ফুটেচে। পরিষ্কার আকাশ, খেজুর গাছে গাছে স্বর্ণবর্ণ খেজুরের কাঁদি। একপাশে সবুজ উলুটি বাচ্ড়া বড় বড় বট অশ্বত্থ.

শিমুলগাছ। ওর মুখে গল্প শুনি আর ওবেলার মনের সে আনন্দটা আবার মনে আনবার চেষ্টা করি। কত গাছ, লতা মোটা মোটা—একটাতে কেমন ঝুলবার সুবিধে আছে। বিল্বপুষ্পের বাস এখনও আছে, দু-একটা গাছে। বাওড়ের ওপারে কি সুন্দর ইন্দ্র নীলরংয়ের আকাশ হয়েচে!

আইনদ্দি চাচার বাড়ী এসে বসি। আমার মনের আনন্দের আইনদ্দির বাড়ীর একটা যোগ আছে। চাচা বসে থালুই বুনচে। ওর সেই নাতি বসে বসে গল্প করতে লাগলো। বেশ ছেলেটী। আমি বসে বসে ওপারের বট অশ্বত্থের সারির দিকে চেয়ে রইলুম। কি সুন্দর আকাশ, কি চমৎকার সবুজ বনশোভা, কত কথা মনে আসে, সুপ্রভার কথা, সে লিখেচে এবার আর দেখা হবে কবে? সে কথা।

দেখা ওর সঙ্গে করবো শ্রাবণ মাসে, ঠিক করেই রেখেচি। যে সময় চেরাপুঞ্জিতে আনারস খুব সস্তা হবে, সে সময় চেরাপুঞ্জির বাজারের সেই খাসিয়া মেয়েটার দোকান থেকে আর বছরের মত একটা গোটা আনারস কিনে খেতে পারবো সে সময় যাবো শিলং।

এবার গ্রীষ্মের ছুটীতে যেমন অপূর্ব্ব দিনগুলো কাটচে, এমন সত্যিই অনেক দিন কাটেনি। সেবারের বড়দিনকেও ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েচে রসের ও আনন্দের অভিনবত্বে ও প্রাচুর্য্যে।

এদিন বিকেলে পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাইনি। ওর সঙ্গে বেরুলে কেবল বাজে বকে। প্রকৃতির মধ্যে কিছুক্ষণ নিরিবিলি চুপচাপ বসে চিন্তার আনন্দ উপভোগ করার জন্যে একাই গিয়ে মরগাঙের উঁচু পাড়ে আইনদ্দির বাড়ীর পিছনদিকে রাস্তার ধারে বসলুম। সঙ্গে সুপ্রভার চিঠিখানা ছিল। ডাইনে মরগাঙের বাঁকে বাঁশ ঝাড় ও নতুন পাড়ায়

গোয়ালাদের বাড়ী, ওপারে আরামডাঙায় ঝিঙেফুল দু'একটা ঝিঙে ক্ষেত পেছনে একটা কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে, খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর—সত্যিকার ট্রপিক্যাল দেশের দৃশ্য! কলকাতা থেকে কত দূরে, কত নিভৃত, শান্ত পল্লী অঞ্চল আমাদের এ দেশ—কেমন একটা অপরূপ শান্তি মাখানো। ভগবান যে Romance ও Poetry-র উৎসমূল, তাঁর মধ্যে যে শুধুই Poetry ও Romance-এ আমি বেশ অনুভব করলুম। কোথায় বিরাট দ্যুতিলোকের সৃষ্টি, আর কোথায় এই কাঁদি কাঁদি খেজুর, ওই বেগুনী রংএর জলকচুড়ীর ফুল, সুগন্ধ বেলফুল সবই তাঁর মধ্যে কল্পনা-রূপে একদিন নিহিত ছিল। "কল্পনা সৃষ্টি বীজঞ্চ"। কল্পনাই সৃষ্টির বীজ। 'যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যাঃ'—কালিদাস কবি হোলেও দার্শনিকের দৃষ্টি তাঁর ছিল। আমরা সকল কবিই অল্পবিস্তর ভাবে দার্শনিক তো বটেই। অনেক সময় তাঁরা যা দেখেন, দার্শনিকেরাও তা দেখতে পান না।

এখানে ক'দিন ভয়ানক বর্ষা চলচে। সকালে উঠে বেড়াতে বার হয়েছি মাছিনপুর বলে একটা গ্রামের দিকে। পাশে একটা ছোট খাল। বাঙাল মাঝিরা নৌকো চালাচ্চে। নারিকেল সুপারির বাগান চারিদিকে প্রত্যেক লোকের বাড়ীর উঠানে, ঝুপসি বনে অন্ধকার, স্যাঁত্‌সেঁতে মাটী। টিনের চালা-ওয়ালা দরমার বেড়া দেওয়া সব ঘর—তার বাইরে টিনের সাইনবোর্ড ঝুলচে, "মোজাহার আলি মোক্তার" কিংবা "আহাদ আলি বি, এল, প্লীডার।" বাড়ীর পাশে ছোট ছোট ডোবা মত পুকুর—সুপুরির বাগানটা দিয়ে ঘেরা বেড়ায় আবরু। আবর্জ্জনা, পচাপাতার জঞ্জাল বাড়ীর পাশেই, নীচু আর্দ্র উঠোনে বা মেজেতে। একজায়গার লেখা আছে 'রসিক লাল সেন নায়েবের বাসা'। তারপর একটা সরু

খালের ধারে ধারে নারিকেল সুপুরির ছায়ার ছায়ায় কতদূর বেড়াতে গেলুম, ফিরে এসে একটা কাঠের পুলের ওপরে বসলুম। দুটী ছোট ছোট মেয়ে মাছ ধরচে। কতক্ষণ পুলটাতে বসে রইলুম। কি বিশ্রী জায়গা এই পিরোজপুর! পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে যদি কেউ বলে তুমি এখানে এক বছর থাকো—তা আমি কখনো থাকিনে। এমন জায়গায় মানুষ থাকতে পারে? রত্নাদেবী ও তাঁর স্বামী সত্যিই বড় কষ্টে থাকেন, অমন আমুদে লোক বেশী দেখা যায় না। রত্নাদেবী বড় গল্পপ্রিয়—দিনরাত মুখের বিরাম নেই। আর কি সেবা যত্ন ক'দিন! নিত্য নতুন খাবার তৈরী হচ্চে আমায় খাওয়ানোর জন্যে। বৈকালে বার-লাইব্রেরীতে মিটিং হোল, আমার সাহিত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একঘণ্টা বক্তৃতা করা গেল। জ্যোৎস্না রাত্রে বাইরে বসে গল্প করি রত্নদেবীর সঙ্গে।

পিরোজপুর থেকে এসে মনে কোথায় একটা অমুক্তির দৈন্য ছিল। সেখানকার সেই নারকোল সুপুরি বনের ঝুপ্সি ছায়ায় সাঁৎ সেঁতে ভিজে উঠোন আর সুপুরির বাসলোর আবরুর কথা, সেই রসিক লাল সেন নায়েবের বাসার কথা মনে হোলেই মনে একটা অস্বস্তি আসতো। আমাদের দেশে আসবার সময় ঝিকরগাছা ঘাটে পৌছেই মনে হোল স্বদেশে পৌছে গেছি। নাভারনের কাছে যশোর রোড ও বিলিতি চটকার ছায়া দেখে মনে হোল আমরা একেবারে বাড়ী পৌছে গেছি। বাড়ী এলুম ন'টার গাড়ীতে এসেই খুকুর সঙ্গে দেখা। ও দেখি ওদের দাওয়ায় বেড়াচ্চে আমায় দেখে প্রথমটা পিছু হটে সরে গেল তারপরই চিনতে পেরে ছুটে এল। পিরোজপুরের গল্প হোল অনেকক্ষণ। ওর জন্যে যে কেক্ পাঠিয়েছিল তা দিয়ে এলুম।

পরদিন এল সুধীর বাবুরা—। ওদের নিয়ে হৈ হৈ করে দিন কেটে গেল। মোটরখানা ওদের রইল আমাদের আমতলায়। আমাদের ঘাটে স্নান করিয়ে আনলুম সবাইকে। নদীতে স্নান করে সব খুব খুশি।

ওরা চলে গেল বৈকালে। পরদিন এল কালী চক্রবর্ত্তীর ঘোড়া আমাকে সিমলে নিয়ে যাবার জন্যে—অনেকদিন পরে ঘোড়ায় চড়া গেল। গোপালনগর স্টেশনের কাছে ছাতি সারিয়ে নিলুম—তারপর গণেশপুরের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তা থেকে মাঠের রাস্তায় নেমে সোজা হাতীবাঁধা বিলের পাশ দিয়ে চললুম। কত গাছপালা, বটতলা, ঝোপঝাপ পার হয়ে যে চলেচি! আসবার সময়েও তাই। তখন বৈকালের ছায়া পড়ে এসেচে, হাতী বাঁধা বিলের চমৎকার শোভা হয়েচে—কতদূর জুড়ে প্রশস্ত চক্রবালরেখা দূরত্বের কুয়াসায় অস্পষ্ট। হে ভগবান, আমি আপনার এই মুক্ত রূপের উপাসক। যদি কখনো আসেন, তবে এই রূপেই আসবেন। নভোনিলীমা যেখানে মেঘলেশশূন্য, দিকচক্রবাল যেখানে মুক্ত, উদার—ধরার অরুণোদয় যেখানে নিবিড় রাগরক্ত, সে রূপেই আপনি দেখা দিন—রসিক লাল সেন নায়েবের বাসা থেকে আমায় মুক্তি দেন যেন!

শিমলে থেকে ফিরে যখন নদীতে যাচ্চি গা ধুতে—বেলা খুব পড়ে গিয়েচে, ছায়া নিবিড় হয়েচে বাঁশবনে। খুকু ওদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে ঘাট থেকে ফিরচে, বাঁশবনের পথে দেখা ঠিক পুঁটিদিদিদের বাড়ী থেকে নেমেই। ওরা সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে দাঁড়াতে যাচ্চে, বল্লুম—চলে আয়। ও আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে হাসতে গেল, কি সুন্দর হাসতে পারে! এক তরুণ মুখের প্রসন্ন হাসিতে সারাদিনের মানসিক দৈন্য যেন এক নিমেষে ঘুচে গেল।

গিরীন দাদাদের কলাবাগানের মাঠে কতক্ষণ বসলুম, আকাশ রঙীন্

মেঘ-স্তূপে ভরা—সবুজ মাধবপুরের চর, বাঁশবনের দুলুনি কেমন সুন্দর ! কত বছর চলে যাবে, ঐ বনসিমতলার ঘাটে অনাগত দিনের তরুণী বধূ ও মেয়েদের জলসিক্ত পদচিহ্নে আঁকা থাকবে একটী অপূর্ব্ব প্রণয় কাহিনী—হয়তো কেউ কখনো বলবে, ছিল এরা দুজন অতি প্রাচীনকালে—গ্রামের স্নিগ্ধ বসন্ত দিনের বাতাসে তার মূর্চ্ছনা থেকে যাবে।

সকালে যখন বসে লিখচি, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, একটু পরেই এল বৃষ্টি। একবার দেখি খুকু বিলবিলে থেকে উঠে গেল, কিন্তু বোধ হয় খুবই ব্যস্ত ছিল, তাই চেয়ে দেখলে না এদিকে। স্নান সেরে এসে যখন গেল, তখন বোধ হয় মনে পড়ল, তাই চেয়ে হেসে গেল। কালোর সঙ্গে বাঁওড়ের ধারের বটতলায় বেড়াতে গেলুম। একটা গাছে উঠে বসেচি, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলেকে নিয়ে বেলেডাঙায় কুটুম্ব বাড়ী যাচ্চে। আমার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ গল্প করে গেল। স্নান করতে জলে নেমে দেখি ভারী চমৎকার দৃশ্য ওপারের মাধবপুরের সবুজ উলুবনের চরে। দুপুরে যখন ঘরে শুয়ে আছি, তখন খুব বৃষ্টি এল। বৈকালে বেড়াতে গেলুম বেলেডাঙার জলে—আবার ওবেলার সেই বেলেডাঙার ছেলেটার সঙ্গে দেখা। নদীজলে স্নান করে আনন্দ হোল, জ্যোৎস্না এসে পড়েচে নদীজলে। চমৎকার দেখাচ্চে।

রোয়াকে খুব জ্যোৎস্না। চেয়ার পেতে বসেচি, খুকু ডাকলে—প্রথমে ওদের শিউলিতলার উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসচে হি হি করে, তারপর ডাকলে—বল্লে, আসুন না ? গিয়ে বসেচি, ও উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করচে। আমার ছুটী ফুরিয়ে এল শুনে বলচে—আমিও ছ'ঘরে যাবো ; মা এখানে থাকবে। আপনি আর সেখানে যেতে পারবেন না, মজা হবে।

বল্লুম—মজা বেরিয়ে যাবে। বুঝবি তখন।

বল্লে—তা বটে।

বসে গল্প করচি একবার বৃষ্টি এল। আমার চেয়ার পাতা রয়েচে রোয়াকে, উঠতে যাচ্চি, ও উঠতে দেবে না। বল্লে—বসুন, বসুন বৃষ্টি ঐ থেমে গেল। বল্লে, কাল অত সকালে উঠে গেলেন কেন? বল্লুম—পাঁচু কাকার ছেলের আশীর্ব্বাদ হচ্ছিল, তাই। একটা ছোট গল্প বলতে বল্লে। কিন্তু সাধক দাদার বাড়ীতে একজন গায়ক এসেছিল, তার গান শুনতে বড় ইচ্ছে হোল বলে চলে এলুম।

বনগাঁয়ে যেতে হোল নৌকোতে পচা রায় ও তাদের দুই ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে। বার লাইব্রেরীতে প্রফুল্লর কাছে বিশেষ দরকার ছিল, সেখান থেকে বীরেশ্বর বাবুর সঙ্গে দেখা করে মন্মথ বাবুর লিচুতলা ক্লাবে বসে পিরোজপুর ভ্রমণের গল্প করি। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর নৌকা ছাড়া হোল। মেঘলা আকাশে চাঁদ উঠেচে, ঝিরঝিরে বাতাস, পচা বেশ নানারকম গল্প করতে করতে এল। সুখ পুকুরের ঘাট থেকে সয়ারামকে উঠিয়ে নেওয়া হোল।

খুকু আজ এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে ওদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে। আমি তখন স্নান করে এসে সবে বসেচি, ঝম্‌ঝম্‌ রোদে ও খাড়া দাঁড়িয়ে রইল উঠোনে, আমিও রোয়াকে চেয়ার পেতে বসে রইলুম। একবার দুপুরের পরে খুড়োদের বাড়ীর দিক থেকে এল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে। তারপর আমি Cleopatra পড়ে তাতেই মসগুল হয়ে বেড়াতে গেলুম বেলেডাঙায় বড় বটতলা ছাড়িয়ে সুন্দরপুরের পথে। রাত্রে খুকুদের দাওয়ায় বসে Cleopatra-র ইতিহাস বলি। ওর ভারী ভাল লেগেচে

বললে,—আজ এত দেরী করে এলেন যে? বল্লুম—খুড়ো এসে বসে গল্প করছিল, তা কি করি? পরদিনও Cleopatra-র গল্প শুনে খুকু ভারী খুশি, হেসে বলচে—আহা, বলবার কি ভঙ্গি! 'কচুকাটা করচে! ওর হাসি আর থামে না যখন বলেচি হারম্যাকিম্ কি করে মার্ক এণ্টনির সেনাপতিদের Ceasar-এর দলে যোগ দেওয়ালে।

সন্ধ্যার জলে নেমে বনসিমতলার ঘাটের দিকে চেয়ে, পয়লা আষাঢ়ের নবনীলনীরদ-মালার দিকে চেয়ে ওপারের শ্যাম মাধবপুরের চরের দিকে চেয়ে আনন্দে মন ভরে উঠলো। এই বনসিমতলার ঘাট কত ভাবে সার্থক হোল!

এবারকার গ্রীষ্মের ছুটীর মত আনন্দ কোনোবার হয় নি।

বনসিমতলার ঘাট থেকে যখন স্নান করে আসচি, গুয়োথলী আম গাছটার তলায় মাথা মুছবার জন্যে দাঁড়িয়েচি, ঘন মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অস্তমেঘের রাঙা আভা ভূষণ জেলের জমির একটা ময়নাকাঁটা গাছের গুঁড়িতে পড়ে—কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েচে!

বাদলা বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মশা বেড়ে গেছে। বিলবিলে জলে টইটুম্বুর, বকুলগাছ ও আমগাছগুলোর ভিজে ভিজে কালো গুঁড়ি, কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে। এই আর্দ্র, মশকসঙ্কুল, অতি নিরানন্দ স্থান কিন্তু অপূর্ব্ব কবিতাময়। অন্ততঃ আমার কাছে এ সমস্তটা মিলে এক অফুরন্ত, চির-নূতন কবিতা।

বসে পড়চি রোয়াকে, চেয়ারটা খুড়োদের বাড়ীর দিকে ফেরানো, হঠাৎ যেন মনে হোল বিলবিলের জলে ঝুপ করে একটা আম পড়লো। তাকিয়ে দেখচি, আর একটা ঝুপ করে শব্দ হোল। তারপর আবার একটা।

আশ্চর্য্য হয়ে ভাবচি এত আম পড়্‌চে কোথা থেকে, তখন দেখি কে যেন বিলবিলের ও ঘাট থেকে কি একটা ডাল ছুঁড়ে জলে মারচে।

আমি চেয়ে দেখতেই খুকু হাসতে হাসতে উঠে এল—বল্লে, কবির তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে কি খারাপ কাজই করেচি!

···সুন্দর কবিতা।

কিংবা এ যদি কবিতা না হয়, তবে কবিতা কি, তা আমার জানা নেই।

যেখানে জীবন, যেখানে আনন্দ, যেখানে প্রাণের প্রাচুর্য্য ও নবীনতা—তাই Testament of Beauty—কবিতা।

•

একদিন বিকেলের দিকে মেঘের সৌন্দর্য্য ভারী চমৎকার ফুটেচে সূর্য্য অস্ত যাবার সময়ে। পচা রায় মাছ ধরতে বসেচে কুঠীর নীচে—তার ওখানে গিয়ে বসে গল্প করি। আর এপার ওপারের শ্যামল সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি—কয়টি উলুবন, খেজুর গাছ, পটল ক্ষেত, ঝিঙের ক্ষেত, শান্ত কালো নদীজল, কাটাশেওলার দাম, নলে জেলের ডিঙি নৌকা—ওপরে নীল আকাশ, রাঙা মেঘ—সব সুদ্ধ মিলিয়ে চমৎকার ছবি।

•

আজ দিনটা বেশ চমৎকার। সারা ছুটীর মধ্যে এমন পরিষ্কার দিন আসে নি। বল্লার ভাঙনের কাছে একটা চারা শিমুল গাছ আছে, তার চারিপাশে সবুজ কচি ঘাস বন, নিকটে উলু'খড়ের রাশি রাশি ফুল ফুটেচে, ঝলমলে রোদ, নীল আকাশ। রৌদ্রে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে বেশ মজা। স্নান করে এসে বসেচি, খুকু এসে অনেক গল্প গুজব করলে। বিকেলে কি চমৎকার রোদ! এমন রোদ এবার সারা জ্যৈষ্ঠ মাসে

দেখিনি। পচা রায় মাছ ধরতে গেল। কুঠীর নীচেই জলের ধারে ঘন বন, তার মধ্যে ঢুকে খানিকটা বসি। এমন ঘন বন যে এদিকে আছে তা জানা ছিল না আমার। জলের ধারে কতক্ষণ বসে গল্প করি পচার সঙ্গে আকাশের বড় বড় মেঘস্তূপ ক্রমে রাঙা হয়ে এল বেলা পড়লে, আমি উঠে মাঠের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। এদিকের মাঠ ওদিকের চেয়ে অনেক ভালো। কুঠীর নীচে সেই জলাটার চারিপাশের দৃশ্য বড় সুন্দর। আমাদের ঘাটের ওপরে ডাক্তারদের কলাবাগানে একদল গোয়ালা গরু চরাতে এসে রান্নাবাড়া করচে। তাদের কাছে বসে খানিকটা গল্প করলুম। ওদের বাড়ী ঝিকরগাছার কাছে। ও দেশ জলে ডুবে গিয়েচে বলে এখানে গরু চরাতে এসেচে।

আজ আকাশের রঙ্ অদ্ভুত রকমের নীল, এমন নীল রং সেই আর বছর আষাঢ় মাসের পরে আর কখনো দেখিনি, বৃষ্টি-ধৌত আকাশ না হোলে এমন নীল রং বুঝি ফোটে না। মদের নেশার মত কেমন নেশা লাগিয়ে দিল এই আকাশের নীল রংটা। রোদের রং হয়েচে অদ্ভুত— প্রখর সাদা নয়, যেন হলদে ধরনের। গাছপালা ঘাসের রং যেন হয়েচে হলদে। আমাদের ঘাটে নাইতে যাবার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে দূরের বাঁশবন, কাঁদি কাঁদি খেজুর ঝোলানো খেজুর গাছ, অন্যান্য গাছ-গুলোর রৌদ্রালোকিত পত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে চোখ আর ফেরাতে পারিনে। আমাদের ঘাটের ধারে ফুলভর্ত্তি বাবলা গাছ, সাদা-ডানা প্রজাপতি উড়চে—সে দৃশ্যটা মনে অপূর্ব্ব ভাব নিয়ে এল। এই নীল আকাশ থাকবে আরও ষাট বছর পরে, এই বনসিমতলার ঘাট থাকবে তখনও, ওপারের চরে এমনি উলুর ফুল ফুটবে, এমনি সাঁইবাবলার পত্রশীর্ষ বৃষ্টি-

উৎকর্ণ

ধোয়া নীল আকাশের তলে সূর্য্যের আলোর দিকে খাড়া হয়ে রইবে, কত অনাগত তরুণী বধূরা জলসিক্ত পদচিহ্ন অঙ্কিত করে ঘাটের পথে যাওয়া আসা করবে। আমি তখন আর থাকবো না এ গ্রামে জানি—তবুও আমার কথা গাঁয়ের এমনি আষাঢ় দিনের হাওয়ায়, নির্ম্মল নীল আকাশের আনন্দের মধ্যে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে, সেই দূর ভবিষ্যতের কথা মনে হয়ে চলমান জগতের রূপ আমার মনে আনন্দের বাণী বহন করে আনলে।

আজ সন্ধ্যায় কি অপূর্ব্ব শ্রী! অস্তমান সূর্য্যের রঙে সমস্ত মাঠ, বন মায়াময় হয়ে গিয়েচে—সারা পৃথিবীটা কি অপরূপ শিল্প তাই ভাবি। আকাশের রং নীল নয়—সে কি রং তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন—ওরকম রংএর কি নাম তা আমার জানা নেই। সন্ধ্যায় নদীজলে নেমে স্নান তো যেন দৈনন্দিন উপাসনা।

আজ এখানে বেড়াবার শেষ দিন। কারণ লাল শুঁটোর বিয়েতে যদি বরযাত্রীদের সঙ্গে যেতে হয়, তবে কাল আর আসতে পারবো না। পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাবো তার একটু আগে খুকু উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করে গেল তাতে হয়ে গেল একটু দেরি। আমি পচাদের বাড়ী গিয়ে দেখি সে নেই। গাজিতলার পথে সে অনেক দূরে চলে গিয়েচে, তাকে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে গেলুম বেলেডাঙার বাঁকের মাথায়। কতক্ষণ সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মরগাঙের ওপারের চর, খেজুর গাছ, বাঁশবন, জলি ধানের ক্ষেতের দিকে চেয়ে বসে পচা রায়ের সঙ্গে গল্প করি। বেলা যখন যায় যায়, তখন উঠে আইনদ্দির বাড়ীতে এসে দেখি সে বাড়ী

নেই। বেলেডাঙার স্কুলের ওপর কতক্ষণ বসে রইলাম শ্যামল সবুজের বন্যার দিকে চেয়ে। কি দিগন্ত প্রসারী ধানক্ষেত, বটঅশ্বত্থের বীথি, নতিডাঙার গ্রামপ্রান্তর বাঁশবনের সারি, কি বিচিত্র মেঘস্তূপ নীল আকাশে। সন্ধ্যা প্রায় যখন হয়ে এল, তারপরে আমরা ওখান থেকে উঠে আসি। পচা একটা কলার বাগান থেকে কলা সংগ্রহ করলে। আমি বনসিমতলার ঘাটে এসে নাইলুম। আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে, বনের মধ্যে জোনাকীর ঝাঁক জ্বলচে, অন্যদিনের চেয়ে আজ বেলা গিয়েচে। সন্ধ্যায় খুকুদের বাড়ী বসে অনেক রকম গল্প করলুম, তারপর উঠে গেলুম পাঁচু কাকাদের বাড়ী, ওঁদের বাড়ী কাল বিয়ে, অনেক কুটুম্ব কুটুম্বিনী এসেচে— পাঁচুকাকার ভাই ফণি কাকা এসেচেন জলপাইগুড়ি থেকে—একবার সব দেখাশুনো করে সামাজিকতা রক্ষা করতে যাওয়া দরকার।

আজ চলে যাবো। বেলা তিনটের সময় আমার ঘরে ঘুম ভেঙে উঠলুম—তারপর বেড়াতে গেলুম নদীর ধারের মাঠে। বেজায় গুমট গরম, আকাশে শাদা মেঘ। একটু পরে পাঁচু কাকার ছেলে গুঁটো বিয়ে করে নববধূ নিয়ে গ্রামে ঢুকলো। সানাই বাজচে, ঢোল বাজনার শব্দ শুনে কল্যাণী, খুড়ীমা, খুকু এরা সেজে গুজে ছুটলো। আমতলায় দেখি সব চলেচে। খুকু একবার চেয়ে দেখলে আমার দিকে। ঐ ঘোড়ার গাড়ীতেই আমি চলে এলুম বনগাঁ স্টেশনে। সারা পথ ট্রেনে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল কি অপূর্ব্ব সুন্দর গ্রীষ্মের ছুটীই আজ শেষ হয়ে গেল।

কলকাতায় এসে ক দিন বড় ব্যস্ত ছিলুম। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা

করে বেড়াচ্চি—সাঁৎরাগাছি ও রাজপুরেও গিয়েছিলুম। পরন্তু হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে উষা এসেছিল—দেখা করতে এসেছিল মেসে। আমি তখন সবে চুল কাটতে বসেচি। তাড়াতাড়ি যেতেও পারিনে—বসতে বলে যত শীঘ্র হয় চুল ছেঁটে দেখা করে এলুম। উষার নির্দ্দেশমত বালিগঞ্জে গেলুম দুপুরের পর। অনেকগুলি মহিলা ছিলেন সেখানে—সাহিত্যিক আলোচনা হোল অনেকক্ষণ ধরে—সকাল থেকে বার হয়ে বিকেলের দিকে ইন্দিরা দেবীর বাড়ী গেলুম রেডিওর বক্তৃতার নকলটী আনতে। কাল রাত্রে রাজপুরে বেণুন, আমি ও ফুলির দুই ছেলে এক মশারীর মধ্যে শুয়ে প্রাণ যায় আর কি গরমে আর মশায়! সারারাত চোখের পাতা বোজেনি।

এরই মধ্যে একদিন আয়েলীর সঙ্গে দেখা হোল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গত মঙ্গলবারে আমি আয়েলীর কথা বলচি নীরদ বাবুদের বাড়ী, যে ওই একটী মেয়ে, যার সঙ্গে আর দেখা হবে না—কারণ ওর মা ওকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে বাপের বাড়ী চলে গিয়েচে। হঠাৎ সেদিন প্রবাসী অফিসে গিয়েচি, সেখানে দেখা ডাঃ প্রমথ রায়ের সঙ্গে। অনেকদিন পরে দেখা, কেউ কাউকে ছাড়তে পারিনি, অনেকক্ষণ ওখানে থেকে বার হয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে গল্প হোল পুরোণো দিনের—যখন 'শনিবারের চিঠি' আপিস ছিল মাণিকতলায়। প্রমথ এখন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক—ভারী বন্ধুবৎসল, ছেড়ে দিতে আর চায় না।

প্রমথ এসে আমায় উঠিয়ে দিয়ে গেল হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত। আমি কর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলরের চিঠি দিতে গেলুম নীরদবাবুর বাড়ী—সেখানে ড্রয়িংরুমে ঢুকবার আগেই মেমসাহেবের গলা শুনে আমি অবাক হয়ে ভাবচি কোন্ মেমসাহেব এখানে এল! ঢুকেই দেখি আয়েলী ও মিসেস্ এণ্টনি বসে। আয়েলীও আমায় দেখে খুব খুশি হোল—ওরা

সিঙ্গাপুর থেকে হু একদিন হোল এসেচে, শুনলুম। এখন কল্‌কাতাতেই থাকবে। ভারী আনন্দ পেলাম ওকে দেখে—আয়েলী বড় ভাল মেয়ে। ও এখানে পড়তো লা মার্টিনিয়ারে। এতদিন পড়া বন্ধ ছিল সেইজন্যেই ওর মা মিসেস্ এণ্টনি ওকে আর ওর ছোট ভাই পিটিকে এখানে এনেচে।

কাল বালিগঞ্জে এক ভদ্রলোকের ওখানে রাত্রে ছিল নিমন্ত্রণ। মিসেস্ দে বলে যে মহিলাটীর সঙ্গে উষার ওখানে সেদিন দেখা হয়েছিল—তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাতে আমার আলাপ হয় তার খুব ইচ্ছা। ভদ্রলোকটীর নাম কে, সি, দে। কিরণ দে। কাল সন্ধ্যা-বেলা তাঁদের বাড়ী অনেকক্ষণ কাটানো গেল। বড় অমায়িক লোক স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। ভূরিভোজন হোল অবিশ্যি, আইস্ ক্রীম পর্য্যন্ত বাদ গেল না। মনীষা সেনগুপ্তা বলে একটী মেয়ে উপস্থিত ছিল, মেয়েটী ছেলে-মানুষ। এবার বি, এ অনার্সে ইংরিজিতে প্রথম হয়েচে, কিন্তু এত লাজুক ও মুখচোরা-- রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে বললুম। সবাই পড়চে—মেয়েটী লজ্জায় একেবারে মুষড়ে পড়লো—কিছুতেই পড়বে না। তারপর মিসেস্ দে অনেক করে একটা ছোট কবিতা পড়ালেন।

বেশ কাটলো সন্ধ্যাটী, সাহিত্যিক আলোচনাতে, গল্পে, আবৃত্তিতে, খাওয়া দাওয়ায়। অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরি।

পরশু ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে হেষ্টিংসে গিয়েছিলুম। কলকাতার মধ্যে অমন চমৎকার ফাঁকা জায়গা বেশী দেখিনি। ওর সন্ধান পেয়ে মনে আনন্দ হোল। নীল আকাশ, ফাঁকা সবুজ মাঠ, দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মার্ব্বেল চূড়াটা দেখা যাচ্চে নীল আকাশের পটভূমিতে, যেন আকাশে

ভাসচে বলে মনে হচ্চে। কূলে কূলে ভরা গঙ্গা, সবুজ ঘাসে ঢাকা তীরগুলি জল ছুঁয়েচে। জলের ধারে নাটা ঝোপ, কালকাসুন্দা ও বনবেড়েলী—ঠিক যেন পাড়াগাঁ অথচ জলের ধারে ধারে ছোট বড় ছায়াতরু, সেখানে বেঞ্চি ফেলা রয়েচে—সত্যিই বড় ভাল জায়গা—অথচ বেশ নির্জ্জন—খুব লোকজন বা মোটরগাড়ীর ভিড় নেই।

বাড়ী এসেই সেদিন উষার পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হোলাম। সুরেশবাবু বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বড় যদিও, কিন্তু ভাগলপুরে থাকবার সময়ে মিশতেন ঠিক যেন সমবয়সীর মত। অমরবাবুর বাড়ীর আড্ডাতে দিনের পর দিন আমাদের কত চা-পানের মজলিস বসতো। সুরেশবাবু একজন ভাল শিকারীও ছিলেন। শিকারের গল্প করে জমিয়ে রেখে দিতেন। একবার বাবারিঘাটে আমি ষ্টীমার থেকে নামচি—আজিমগঞ্জ থেকে আসচি অনেককাল পরে ভাগলপুরে—সেই ষ্টীমারে সুরেশবাবুও আসচেন—উনি তখন বনেলি রাজ ষ্টেটের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার—আমায় দেখে বল্লেন—এই যে ম্যানেজারবাবু কোথা থেকে আসচেন? আর কি সে হাসি, কি সে মনখোলা বন্ধুত্বের স্পর্শ!

পরশু বাড়ী ফিরে উষার চিঠিতে জানলুম সুরেশবাবু আর ইহলোকে নেই। উষারা যেদিন এখান থেকে গেল মজঃফরপুরে, তার পরদিনই সুরেশবাবু মারা গিয়েচেন বলে উষা লিখেচে। অত্যন্ত দুঃখ হয়েছে চিঠিখানা পড়ে। ভগবান তাঁর আত্মার সদ্‌গতি-বিধান করুন।

কাল সায়েন্স কলেজের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে আচার্য্য পি, সি, রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম অনেককাল পরে। বয়স হয়েচে, কোন্ দিন

মারা যাবেন—আর অনেকদিন যাওয়া হয়নি—এইসব ভেবেই দেখা করতে গেলাম। ভারী আনন্দ পেলাম বসে কথা কয়ে ওঁর সঙ্গে। বললুম—মাঠে যান এখনও? বল্লেন—ও বাবা, না গেলে কি বাঁচি?...বল্লুম—ফিলজফার আসেন? বল্লেন—রোজ আসেন তোমার কথা যে সেদিন বলছিলেন, তুমি আর যাও না কেন? তারপর আলামোহন দাস বলে একজন বড় ব্যবসারীর গল্প করতে লাগলেন—তিনি নাকি প্রথম জীবনে মুড়ি মুড়কি বিক্রী করতেন। এখন ক্রোরপতি লোক। চার-পাঁচটা মিল আছে।

বললেন—গ্রিন্ বোট করেচি, শ্রীপুরের ঘাটে বাঁধা রয়েচে। একবার তোদের বারাকপুরে যাবো গ্রিন্ বোটে করে ইছামতী দিয়ে।

বললুম—বেশ আসুন না?

অনেকদিন পরে বুড়োর সাথে গল্প করে বড় আনন্দ পেলুম। বুড়ো কবে মরে যাবে, একটা অনুতাপ থেকে যাবে মনে।

গত শুক্রবার অর্থাৎ ২৯শে জুলাই গ্রীষ্মের ছুটীর পরে প্রথম বাড়ী গিয়েছিলুম। ভারী ভালো লেগেচে এবার। খুকুদের দাওয়ায় বসে ক'দিনই সন্ধ্যার সময় কত গল্পগুজব করি। ওরা একদিন খাওয়ালো। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খুকু রান্নাঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এল। আমি গেলেই সতরঞ্চিখানা ঘরের মধ্যে থেকে এনে বড় করে পেতে দেবে—আর ওর মা বলবে ছোট করে পাত। ছোট করে পাত। কাঁ[illegible]বাটা বেড়াতে গেলুম পচা রায়ের সঙ্গে। রবিবার হাটে গেলুম। [illegible]লতলা দিয়ে হাট করে ফিরি। খুকু দাঁড়িয়ে আছে, আমি বলচি খুড়ীমা, কাউকে তো দেখতে পাচ্চি নে? ও বলচে কেন হাতীর মত দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাচ্চেন না? তাড়াতে পারলে তো সব বাঁচেন।

আমি তারপর নদীর জলের একেবারে ধারে গিয়ে বসলুম। লম্বা শীস্ ও ফুল ফুটেচে, এপারে ঘন সবুজ গাছপালা, নদীর জল আবর্ত্ত কোরে ঘুরচে—বেশ লাগচে। দিলীপের সঙ্গে সেদিনকার সেই তর্ক মনে পড়লো। থিয়েটার রোডে ওর বাড়ী বসে তর্ক করেছিলুম ওর বই নিয়ে। একজন চাষা আজ হাট থেকে ফিরবার পথে গল্প করছিল—নতা যদি বেশি হয়েচে, তবে আর ঝিঙে তাতে ফলবে না। তার সেই গল্পটা মনে করচি। এই গ্রামের সত্যিকার জীবন—মাটীর সঙ্গে সব সময়েই এদের যোগ। মাটীর সঙ্গে যোগ হারালে, গাছপালার সঙ্গে যোগ হারালে এরা বাঁচবে না।

বড় বড় বাঁশঝাড়, কত কি বৃক্ষলতা, ষাট বছর পরে যখন আমি থাকবো না, তখনও ওরা থাকবে, হয়তো খুকুও অতি বৃদ্ধা অবস্থায় থাকতে পারে। তখনও ইছামতীতে এমনি ঘোলার ঢল নামবে, বনশিমতলার ঘাটে নতুন মেয়েছেলে কত ফুল নিতে আসবে, হাসবে, খেলবে, জল ছুঁড়বে যেমন একদিন আমরাও করেছিলুম।

খুকুদের হাসাতুম 'ভাল কি মন্দ? মন্দ হইলে তো গন্ধ হইত' এই কথাটা পূর্ব্ব বঙ্গের সুরে বলে। এবার গিয়ে মনে হোল এমন বর্ষা-সজল দিনের গভীর আনন্দ কোনো বছর এর আগে পাই নি। এ যেন একটা স্বপ্নের মত কেটে গেল—এত সুন্দর সকাল সন্ধ্যা!

ফাল্গুন মাসে যখন শালমঞ্জরী নিয়ে গিয়েছিলুম, বা যেবার গিয়ে দেখি উড়েরা তত্ত্ব বয়ে নিয়ে গিয়ে ভাত খাচ্ছে, সে সব দিনের ঘটনা তো এখন পুরোনো মনে হয়—Fresh, ever young! দিন গুলির মধ্যে তাজা আনন্দ তো থাকা চাই-ই, আনন্দের নব নব সৃষ্টি স্রষ্টামনের প্রাণ-শক্তিরই পরিচয় দেয়।

এই সব দিনের সঙ্গে দশবিশ বছর আগেকার পুরোনো, ছাতা-পড়া, ভঙ্গুর দিনগুলির যদি প্রতিযোগিতা হয় তবে স্মৃতির ও আশার দরবারে সম্মান লাভ করতে পারে না। তা হেরে যেতে বাধ্য। সেইজন্যেই সেই সব অসহায়, নিরপরাধ, নিরুপায় দিনগুলোর জন্যে মমতা আসে।

নিজের ঘরে বারাকপুরে সেদিন শুয়েচি, শুক্রবার রাত্রে। শুনচি ন'দিদিদের ঘরে খুব গল্প ও হাসির শব্দ। বোধহয় খুকু কোনো গল্প করচে ওদের কাছে। এই ঘরে শুয়ে শুয়ে ১৯২৪ সাল থেকে, আজ ১৯৩৮ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত এই গল্প ত আমি শুনে আসচি—এ একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা। তাই কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে একরাত্রে বারাকপুরের খড়ের ঘরে নির্জ্জন রাত্রে শুয়ে সে অভিজ্ঞতাটা হঠাৎ হওয়াতে খানিকটা এমন অবাস্তব বলে মনে হোল যে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চৈতন্যটাকে এর মাটীতে নামিয়ে এনে তবে সে অভিজ্ঞতাটুকু গ্রহণ করতে পারলুম।

তারপর আর একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা।

অনেক রাত্রে চৌকীদার হাঁকতে বেরিয়ে আমার ঘরের মধ্যে লণ্ঠন বাড়িয়ে দেখচে। আমি বল্লুম—কিরে, ভাল আছিস্? চৌকীদার বল্লে—হাঁ বাবু, আছি। কবে এলেন বাবু?

তারপর সে নিজের নিমোনিয়া হয়েছিল, সে গল্প বলতে সুরু করলে। আমার তখন সত্যিই মনে হোল আমি এই গ্রামেরই লোক—থাকি প্রবাসে কলকাতায়। আসলে আমার বাড়ী এখানেই। সে কি যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। গ্রামের মাটীর সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে সেই গভীর রাত্রে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়ে গেল সুরেন চৌকীদারের একটা কথায়—বাবু বাড়ী আলেন কবে?

উৎকর্ণ

রবিবার (১৫ই শ্রাবণ) হাট করতে গিয়ে গোপালনগরের দোকানে দোকানে বেড়িয়েও ঠিক ওই রকম অনুভূতি হোল। একজন লোকে তো বল্লে—আপনি কি সেই থেকেই বাড়ী আছেন?

বর্ষা-সজল প্রাতে সোমবারে হেটে বনগাঁ এসেও কি তৃপ্তি! ওদের উঠোনে খুকু দাঁড়িয়ে রইল। যখন আসি দরজার কাছেও দাঁড়ালো একবার।

বনগাঁয়ে খয়রামারির মাঠে যেখানে সেই মটরলতার ঝোপ, সেখানে এ বছর প্রথম বেড়াতে গেলুম এদিন। ছোট এড়াঞ্চির জঙ্গল বড্ড বেশী বেড়েচে।

সত্যিই, অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েছিলুম দেশে গিয়ে এই বর্ষামুখর শ্রাবণ দিনে। শুক্রবার দিন ছিল ১৩ই শ্রাবণ, আমার ছেলেবেলার ওই দিনটী আমার কাছে ছিল একটা বড় উৎসবের দিন, মনসার ভাসান বসতো ওই দিনটীতে আর তিন চার দিন ধরে চলতো জেলেপাড়ায় পুরোনো মনসা-তলায়। বন্য মটরলতায় সবুজ ফলের থোলো যখন দুলতো ঝোপে ঝোপে এই শ্রাবণ মাসে, তখনকার দিনগুলির সঙ্গে মনসার ভাসানের সুরেন জেলের নাচ আর গান জড়িয়ে রয়েচে আমার মনে—কতকাল পরে আবার সেই তেরোই শ্রাবণ, সেই মনসার ভাসানের উৎসবের সময় বাড়ী গিয়েচি, ঝোপে ঝোপে তেমনি দুলচে মটরলতার কচি সবুজ ফল, মেয়েরা তেমনি নতুন শাড়ী পরে নাগ পঞ্চমীর উৎসবে যোগ দিতে চলেচে নৈবিদ্যির রেকাবী হাতে—কেমন করে বাল্যের সেই স্বপ্নজগতে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলুম অতর্কিতে! কিন্তু স্বপ্ন সেটা নয়, কারণ খুকু ছিল। আর তোলই বা স্বপ্ন, জীবনের কতখানি স্বপ্ন দিয়ে গড়া তা কি সবাই জানে?

বাংলা দেশের মর্ম্মকাহিনী লুকোনো আছে এই সব নিভৃত পল্লী প্রান্তের

আম-বকুল-বাঁশবনের আড়ালে, যিনি লেখক হবেন, যিনি লেখনী ধারণ করবেন বাংলার কথা শোনাবার জন্যে তাঁকে আসতে হবে এখানে, মিশতে হবে এদের সঙ্গে, যোগ দিতে হবে এদের এই সব শান্ত উত্তেজনা-হীন, তুচ্ছ, অনাড়ম্বর, অখ্যাত গ্রাম্য জীবনের উৎসবে, এদের বুঝতে হবে, ভালবাসতে হবে। খ্যাতি যশের জন্যে বা টাকার জন্যে কেউ লেখে না জানি—Jules Lemaitre-এর সেই কথা—The end is nothing, the road is all)—প্রত্যেক আর্টিষ্টের মনে রাখা উচিত।

হাঁ, পচা রায়ের সঙ্গে শনিবারের বিকেলে (১৪ই শ্রাবণ) কাঁচিকাটার পুলে বেড়াতে গিয়েছিলুন—কি অজস্র সোঁদালি ফুল কুঠীর মাঠের প্রায় প্রত্যেক গাছে! আমি তো অবাক্, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সোঁদালি ফুল জীবনে তো কখনো দেখিনি।

ভালবাসা জিনিসটা কখনো কখনো কারো গায়ে পড়ে করার মত ভুল আর কিছু নেই। কারণ যাকে তুমি ভালবাসচো অত করে, সে তোমার ওই ভালবাসাকে 'ভালবাসা' বলে গ্রহণ যদি করতে না পারে, তবে তোমার ভালবাসার ফল কি? ভালবাসা pity নয়, করুণা নয়, charity নয়, সহানুভূতি নয়, এমন কি বন্ধুত্বও নয়—ভালবাসা ভালবাসা। এখন সেই জিনিসের সূক্ষ্ম মহিমা ও রসটুকু না বুঝে যে নষ্ট করে ফেলে অযাচিত ভাবে দিয়ে, অপাত্রে দিয়ে—তার চেয়ে মূর্খ আর কে?

যারা বলে "এতো স্বার্থপর ভালবাসা হোল" শ্রীধর কথকের সেই গান বাবা গাইতেন—"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" ইত্যাদি—এ সব কথার কোনো মানে হয় না। ভালবাসার নিয়মই এই, না পেলে দেওয়া যায় না, বা না দিলে পাওয়াও যায় না। এখানে এই

কথায় খুব গভীর অর্থ আছে। ভালবাসা না পেলে যে ভালবাসা দেওয়া—যে পেলে তার কাছে তা আর ভালবাসা রইল না, সে তার উপযুক্ত মূল্য দেবে না—সে গভীর, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অপরূপ আনন্দ পাবে না ভালবাসা থেকে, পাবে একটা সাময়িক উত্তেজনা বা egoistic satisfaction তাতে ভালবাসার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হোল। আর না দিলে নেওয়াও যাবে না—আমি যাকে ভালবাসিনে, তার কাছে যদি আমি ভালবাসা পাই তাকে আমি ঘাড়ে-পড়া বালাই বলে ভাবি। তার উপযুক্ত মূল্য ও সম্মান আমি দিতে কখনোই পারবো না। সে যত গভীর ভাবে আমায় ভালবাসবে, আমার দিকে attention দেবে—ততই আমি ভাববো আমার দিকে ঝুঁকচে বিরক্ত হয়ে উঠবো। সে প্রাণপণে ভালবাসচে অথচ যাকে ভালবাসচে, সে এ থেকে কিছুই আনন্দ পাচ্চে না—এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে? ভালবাসা পাওয়ায় যে সত্যিকার অপূর্ব্ব অনুভূতি যা এ ধরনের পাওয়ার মধ্যে থাকে না—সুতরাং এ রকম ভালবাসা এ ক্ষেত্রে না দেখানোই ভালো।

ভালবাসা জিনিসটা দেওয়া নেওয়ার, আমি যে অর্থে ভালবাসা ব্যবহার করচি সে অর্থে। যারা ভালবাসা কি কখনো জানে না, সত্যিকার ভালবাসা কি কখনো পায় নি—তারা 'নিঃস্বার্থ' ইত্যাদি বাজে কথা ব্যবহার করে। ভালবাসা মনের এক অদ্ভুত রসায়ন—উভয় মনের সমান যোগ ভিন্ন এ দিব্য, অপূর্ব্ব, অতীন্দ্রিয়, দুর্ল্লভ রসায়ন তৈরী হয় না। যে হতভাগ্য এ আস্বাদ করে নি—সে শাস্ত্র থেকে, দর্শন থেকে, পাঁজিপুঁথি থেকে বড় বড় নিঃস্বার্থতার বুলি আওড়ায় গিয়ে—কিন্তু যে জীবনে এর আস্বাদ পেয়েছে সে জানে ওসব লম্বা লম্বা কথা কত অন্তঃসারশূন্য ও ফাঁকা, অনেকক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ভগবান এইজন্যই বোধহয় মানুষকে ধরা দেন না—অনেক সাধনা যে করে সে তাঁর ধরা দেওয়ার মূল্য দেয়—সহজভাবে ভগবান আমাদের গায়ে এসে ঢলে পড়লে, তাঁর চেয়ে মহকুমার তুলসী দারোগার বন্ধুত্বের মূল্য আমাদের কাছে বেশী দাঁড়াতো।

ওপরের কথা যে বলা হোল এটা কিন্তু ভালবাসবার অবস্থার প্রথম দিকের কথা নয়—অত্যন্ত প্রাইমারি স্টেজে আলাদা কথা। সেখানে অনেক সময় ভালবাসা দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুকে পাবার চেষ্টা করতে হয়—সে অন্য কথা। যখন কেউ কাউকে ভালো জানে না, সে অবস্থায় কেউ কাউকে খুব খারাপ বা গায়ে পড়াও ভাবে না—তখন দুজনেই দুজনের কাছে খানিকটা রহস্যমণ্ডিত থাকে কিনা—কেউ কাউকে খুব খারাপ ভাবতে পারে না। কিন্তু খানিকটা ভালবাসার পরে যখন দেখবে যে সে তোমার ভালবাসা নিতে পারচে না, নানা রকম চেষ্টা করেও যখন তার মনের মধ্যে ভালবাসার প্রেরণা দিতে পারবে না তখন তার ঘাড়ে পড়ে ভালবাসা দিতে যেও না—তাতে সে বিরক্ত হয়ে উঠবে, তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার ভালবাসার মূল্য সে দিতে পারবে না বরং উল্টোই হবে—তখন তাকে ছেড়ে দিও।

[এই ডায়েরিটা লিখলাম কেন? কোনো ব্যক্তিগত কারণ আছে। কিন্তু সেটা আজ আর লিখলুম না]

বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলুম অনুকূল বাবুর নিমন্ত্রণে। কি অমায়িক ভদ্রলোক! কি আতিথেয়তা ও সৌজন্য! সত্যি, অমন ব্যবহার, অমন একটী প্রীতি-শুভ্র পারিবারিকতার আবহাওয়া কতকাল ভোগ করিনি।

বিষ্ণুপুরে জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন মন্দিরগুলি আমার মনে এক অদ্ভুত

ভাব জাগিয়েচে। প্রসিদ্ধ দলমাদল কামান এখন লালবাঁধ বলে প্রকাণ্ড দীঘির একপাশে বসানো আছে। অনুকূল বাবুর কাছারীর জনৈক পেয়াদা আমায় নিয়ে গিয়ে দেখালে। জোড়াবাংলা বলে একটী মন্দিরের পাথর বাঁধানো চাতালে আমি ও অনুকূলবাবু বসে রইলুম সূর্য্যাস্তের সময়ে। বড় ভাল লাগলো।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মাটী রাঙা, সব শাল ও কেঁদ বন—বড় চমৎকার দৃশ্য, কাঁকুরে মাটী, কাদা নেই—খটখটে শুক্‌নো।

দেখি ফিরবার সময়ে দূরপ্রসারী সবুজ মাঠের প্রান্তে দিকচক্রবালের শোভায় বৈকালের দিকে কত কথাই মনে নিয়ে এল! দূরে আমার গ্রাম—আজ রবিবার, এতক্ষণে সকলে হাটে যাচ্চে। যুগল ময়রার দোকানের সামনে ফণিকাকা দাঁড়িয়ে আছে, খাজনা আদায় করচে—এই ছবিই কেবল যেন মনের চোখে ভাসছিল।

বন্যার জল অতি ভীষণভাবে আমাদের গ্রামের চারিদিক ঘিরেচে। আজই সকালে চালকী থেকে এখানে এসেচি। প্রথমে মধু পাগলা (আদাড়ি জেলেনীর নাতি) মাছ ধরচে পাকা রাস্তার ধারে। সে পথ দেখিয়ে দিলে। সাজিতলার বাঁকে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য যেন পদ্মা কি, সমুদ্রের মত। থৈ থৈ করচে জলরাশি। আমাদের পাড়ায় রামপদর ঘরে বন্যাপীড়িত মানুষেরা আশ্রয় নিয়েচে। ন'দিদি তেল দিলে—আমাদের বাড়ীর পিছনে শ্যামাচরণ দাদাদের চারা গাবতলায় স্নান করলাম। বরোজপোতার ডোবা দিয়ে তর তর করে স্রোত চলেচে। ইন্দু রায়ের সঙ্গে সঙ্গে জেলের নৌকা করে খুকুদের চারা আমবাগান দিয়ে গেলুম বেলেডাঙ্গার আইনদ্দির বাড়ী। সেখানে একটু গল্প করে এপারে

এলুম। বট অশ্বথের শ্যাম বীথির কি শোভা! সর্ব্বত্র জল, বটতলায় সাঁতার জল কিন্তু অপূর্ব্ব শোভা হয়েচে বটে।

চড়কতলার বাগানে নৌকো চড়ে গোঁসাই বাড়ীর রাস্তা দিয়ে পাকা রাস্তায় এসে নামলুম। হেঁটে সাড়ে তিনটার সময় বনগাঁ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুকুদের বাসায় বসে গল্প করি।

পূর্ণিমার রাত্রে ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, সজনী, আমি, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং সুবল এক সঙ্গে বম্বে মেলে খড়গ্‌পুর এলুম। হাওড়া স্টেশনে প্রথমেই হাসির ব্যাপার। একজন উঠে বল্লে, আপনারা কে লণ্ডন যাবেন? আমরা তো হেসে বাঁচিনে। যাচ্চি মেদিনীপুর, বলে কে যাবে লণ্ডনে! সজনী তো হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি!

খড়গ্‌পুর নেমে মোটরে মেদিনীপুর গেলাম কাঁসাই নদী পার হয়ে। S. D. O. ধীরেনবাবু এসেছিল আমাদের নামিয়ে নিতে। স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্‌ ছিলেন সভাপতি, তিনি ও অমূল্য বিদ্যাভূষণ এক গাড়ীতে গেলেন—আমি, ব্রজেন দা, তারাশঙ্কর এক গাড়ীতে।

গিয়েই জ্ঞান চৌধুরী উকীলের বাড়ী ডিনারের নিমন্ত্রণ। প্রায় আশি জন লোক নিমন্ত্রিত। ডিনারের পরে ধীরেনবাবুর বাড়ীতে আমরা অতিথি হয়ে রইলুম।

সকালে সভা হোল। রাধাকৃষ্ণণ্‌ বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন, আমি সে সময় একটা তেঁতুল গাছতলার ছায়ায় বসেছিলুম। তারপর দেবপ্রসাদ বাবু ও চৈতন্যদেবের সঙ্গে নাড়াজোল রাজার গোপ প্রাসাদ দেখে পুরোনো গোপ প্রাসাদে একটা প্রাচীন বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম। বেশ সুন্দর জায়গা এই গোপ, খুব উঁচু মালভূমির

মত স্থান, সেগুন ও কেলিকদম্বের বন, বেশ ভাল লাগলো। ওখান থেকে কাঁসাই নদীর এনিকাট্ দেখতে গিয়ে আমাদের ফটো নেওয়া হোল।

ধীরেন বাবুর বাড়ী দুপুরে ব্রজেনবাবু, সজনী সবারই নিমন্ত্রণ। বৈকালে আবার মিটিং—তারপর বার হয়ে ঝণু দাশগুপ্ত বলে একটী মেয়ের গান শুনতে যাওয়া গেল ওদের বাড়ীতে। ঝুনুর বাবা এখানকার D.S.P.

রাত্রি দুটোর ট্রেণে স্টেশনে এসে ট্রেণ ধরলুম, ধীরেনবাবু ট্রেণে তুলে দিয়ে গেলেন।

মহালয়ার আগের সোমবারে রেজেষ্ট্রি আপিসে বারাকপুরের বাড়ীটা রেজেষ্ট্রি করে নিলাম। রামপদ ও পুঁটিদিদি এসেছিল। মহালয়ার দিন খুকু ও খুড়ীমাকে কলিকাতায় আনলুম। অন্নপূর্ণার ঘাটে নেয়ে মদন-মোহন ঠাকুর দেখে Zoo, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল ও রূপবাণী দেখে রাত দশটার গাড়ীতে ওদের নিয়ে ফিরলুম। সেই শনিবারে আবার বাড়ী গেলুম—খুকুদের বাসায় রাত্রে খেয়ে সকালে চালকী। ইন্দু এল। তার সঙ্গে বারাকপুর যাই। এখনও বন্যার জল থৈ থৈ করচে। সমুদ্রের মত। এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি।

এক মাসে অনেক ঘটনা ঘট্‌লো। আমি গালুডি গেলুম পূজোর ছুটীতে, সেখান থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলুম। বারাকপুর গিয়ে আট নয় দিন ছিলুম। বড় নির্জ্জন, বিশেষ করে আমাদের পাড়াটা। সেখান থেকে রোজ মাছ ধরা দেখতে যেতুম নদীর ধারে। ইন্দু মাছ ধরতো—ওর একটা ভাঁড় আছে, সেটাতে রোজ মাছ পড়বেই পড়বেই। গুটকে

থাকতো। মাছ খুব সস্তা হয়েছিল। সম্প্রতি কালীপূজোর আগে কলকাতায় এসেচি।

চূড়ামণি যোগ গেল গত সপ্তাহে। রাত তিনটের সময় উঠে জগন্নাথ ঘাটে ও তারাসুন্দরী পার্কে গিয়ে ভলান্টিয়ারী করলুম। কত ছেলেমেয়ে হারিয়ে যেতে লাগলো, তাদের যথাস্থানে পাঠালুম। আমাদের স্কুলের রামচন্দ্র দত্ত তারা সেবা-সমিতির সেক্রেটারী সে-ই, আমায় যেতে বলেছিল।

সকালে ফিরে বনগাঁ গেলুম। খুকুদের বাসায় গিয়ে দেখি খুড়ীমা গঙ্গাস্নানে গিয়েচেন—খুকুর সঙ্গে গল্প-গুজব করলুম, প্রায় সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত, খাওয়া দাওয়া করলুম ওখানে।

সম্প্রতি নুটু চাকুরী পেয়ে কাল রাত্রে বেলডাঙ্গা চলে গেল। জাঙ্গিপাড়ায় বৃন্দাবন বাবু অনেক দিন পরে এসেছিলেন—কাল তাঁর সঙ্গে বসে অনেক কথা হোল, অনেক কাজ করা গেল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসে।

ঈদের ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিলুম, পরশু এসেছি। প্রথমে খুকুদের নতুন বাড়ীতে গিয়ে দেখি ওরা সেই দিনই এসেচে। ও ঘর ঝাঁট দিতে এল আমার ঘরে—কত গল্প হোল। রাত্রে অন্নদাশঙ্করের স্ত্রী লীলার গল্প ও চিরপ্রভা সেনের গল্প করলুম। ভোরে উঠে চাল্‌কী। সেখান থেকে বারাকপুর ইন্দুদের বাড়ী। হরিপদ দাদা সেখানে উপস্থিত, সে কাঠের ব্যবসা করচে। ইন্দু গল্প-গুজব করলে, সে কচুগাছ পুঁতছিল। আমার বাড়ী গিয়ে চাবী খুলে জিনিষপত্র রেখে স্নান করতে গেলুম। অনেকদিন পরে কুঠীর মাঠে ভূষণের ক্ষেতে বেড়াতে গিয়ে ভারী

আনন্দ হোল। তবে বন্যার জলে ছোট এড়াঞ্চির গাছ সব মরে গিয়েচে দেখলুম। স্নান করে বাড়ী গিয়ে রোয়াকে বসে লিখলুম হোটেলের গল্পটা। গুটকে এল—সে ভারি খুসী আমি যাওয়াতে। তাকে নিয়ে বিকেলে হাটে যাই। বিজনের ডাক্তারখানায় গল্প করলুম, ন্টুর চাক্‌রীর কথা বলি। তারপর মাছ কিনে সন্ধ্যার অন্ধকারে চাল্‌কী এলুম। পথে লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিলুম একজন লোককে দিয়ে। বনের মধ্যে সাঁইকাটাতে কতক্ষণ বসে। চাল্‌কী এসে তারাপদর সঙ্গে গল্প—দিদির বাড়ী গিয়ে কতক্ষণ কথা বলি। সকালে উঠে লিখি। দুপুরের পরে বনগাঁ খুকুদের বাসায় এলুম। খুকু একটু পরে এসে বল্লে—একেবারে গা ধুয়ে এলুম—আপনার পাল্লায় পড়লে আর তো যেতে পারবো না। তারপর কমলের চিঠি, সুপ্রভার কবিতা পড়লে। বেলা পড়ে এল। বল্লে—চলুন, ছাদে যাই, দেখিয়ে আনি। ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বললুম। মেরী এণ্টয়নেট ছবির গল্প করি। নিস্তব্ধ বৈকাল, ছায়া পড়ে আসচে খয়রামারির দিকে। বেশ লাগলো। চোদ্দ বছর বয়সে কি দেখেছিল সে সম্বন্ধে কথা। তারপর চা খেয়ে ওখান থেকে বার হয়ে লিচুতলায় এলুম। আগের দিন যখন রাত্রে থাকি, বেরুবার সময় ও বল্লে—সকাল করে আসবেন, দেরী করবেন না যেন। লিচুতলায় বিশ্বনাথের সঙ্গে সাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা, রাত আটটার ট্রেণে কলকাতা।

আজ নীরদ বাবুর বাড়ীতে সোমনাথ বাবুর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা হোল। তারপর পার্ক ষ্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গি পর্য্যন্ত হেঁটে এলুম। বেশ লাগছিল শহরের এই জনস্রোত। মেট্রোর সামনে খুব ভিড়, Marie Antoinete ছবি দেখানো হচ্চে, নর্ম্মাশিয়ারার নেমেচে প্রধান

ভূমিকায়। রাস্তায় রাস্তায় সাধনা বোস, কাননবালার ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন।

পঞ্চাশ বছর পরের কলকাতা কল্পনা করলুম। কেউ নেই এরা। কেউ নেই আমরা। সাধনা বোস প্রাচীনা বৃদ্ধা হয়ে হয় তো বেঁচে আছে। তখন নতুন একদল উঠেচে, তাদের নাম কেউ জানে না। জীবনের চিত্র নাট্য-পটে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। গিরিশ ঘোষের স্কুলের প্রবীণা অভিনেত্রী বিনোদিনী আজও আছে। গঙ্গার ধারে বসে মালা জপ করে।

এই তো জীবন—এই যাওয়া, এই আসা এই পরিবর্ত্তন। দেখতে বেশ লাগে।

আমি সবটা মিলিয়ে দেখি—একটি চমৎকার সিনেমার ছবি।

এই খুকু, এই সুপ্রভা, বনসিমতলার ঘাট, আমি—কে কোথায় মিলিয়ে যাব।

টুটুর বিয়ে হয়ে গেল গত বুধবারে ১৬ই অগ্রহায়ণ। জাহ্নবীকে আনতে গিয়েছিলুম—খুকুদের বাড়ীতে গেলুম, কতক্ষণ গল্প করার পর বাইরে জ্যোৎস্না উঠেচে দেখে বাইরে এলুম—ও বল্লে, ছাদে চলুন। ছাদে গেলুম, খুড়ীমা এলোনা দেখে ও বল্লে—মা এলো না। দুজনে কত গল্প করলুম, নতুন ব্লাউজের গল্প, কি করে সেটা ছিঁড়ে গেল তাই নিয়ে হাসাহাসি। পরদিন দুপুরে গিয়েচি, কত গল্প, কেবল বলে, 'বসুন, বসুন'। তারপর গাড়ী এসেচে জাহ্নবীকে নিয়ে যাচ্চি, ও দেখি ছাদের ওপরে উঠেচে। আমি ওদের বাড়ী যাচ্চি দেখে নেমে এল। বাইরের দোর খুলে দিয়ে চলে গেল। তারপরেই পান হাতে করে এল। চায়ের কাপ যে

আলমারিতে থাকে, সেখান থেকে টাকা দিলে। ও খুঁজে পায় না—আমি খুঁজে বার করলুম।

সারাপথ ট্রেণে কি আনন্দেই গেলুম! আনন্দেই ভোর! সে আনন্দের ভাবনা আর শেষ হয় না। জ্যোৎস্না-ভরা গত রাত্রির ছাদের কথা, ইছামতীর দৃশ্য, ওর সেই নতুন ব্লাউজের গল্প কেবলই মনে হয়।

মামার বাড়ী যাবার আগে জাহ্নবীদের কলকাতা নিয়ে ঘোরালুম। মামার বাড়ী গেলুম সন্ধ্যার সময়। ভোর রাত্রে দধি-মঙ্গল হোল। তখনও ঘুম ভেঙে উঠেই কি সুন্দর ভাবনা! আনন্দের চিন্তাতেই ভোর। সারাদিন ওই একই চিন্তা। অন্য চিন্তাই নেই। সেই রাত্রি, সেই জ্যোৎস্না-ভরা ছাদ, সেই ব্লাউজের গল্পের স্মৃতি। বিয়ে হয়ে গেল। তার পরদিন এক রকম কাটলো। শুক্রবারে বৌ-ভাত। খুব জাঁক-জমকেই বৌ-ভাত হোল। বিভূতির মা এলেন, বিন্নু এল বারাকপুর থেকে। শনিবার ওদের নিয়ে আবার বনগাঁ। আবার কত কথা, কত গল্প। ও বল্লে, যা কিছু শিখেছি, আপনারই জন্যে, আপনি কত বিদ্বান, আমি তো—কিছুই জানিনে কি ক'রে যে আপনার সঙ্গে এমন হোল! দেখুন, সংসারের কোনো কাজে মন বসাতে পারিনে—মন হু হু করে, কেবল ওই সব কথা ভাবি।

আমি দেখলুম—আমারও তো ওই রোগ। অদ্ভুত! অদ্ভুত! বল্লে, কোথাও তার আগে নিয়ে চলুন। জীবনে অনেক বেড়াবো কিন্তু আপনার সাহচর্য্য তো আর পাবো না?...

ভগবানের অতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ল্লভ দান এই জীবনের অমৃত-ধারা। পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে তা অনুভব করচি—আজ সাত বছর ধরে, ১৯৩৪ সাল থেকে। এর তুলনা নেই। এ আনন্দের বর্ণনা করতে পারি এমন ভাষা

নেই। কতকাল চলে যাবে—তখন খুকুও থাকবে না, আমিও থাকবো না—কে জানবে ইছামতী তীরের এক ক্ষুদ্র গ্রামে শেফালি-বকুল গাছের নিবিড় ছায়ায় ছায়ায়, কত হেমন্তের দিনের সন্ধ্যায়, কত শীতের দিনের জ্যোৎস্নায় দুটী প্রাণীর মধ্যে কি নিবিড় প্রীতির বন্ধন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল?

আকাশে তার বার্ত্তা লেখা থাকবে, সে গ্রামের বাতাসে তার গানের ছন্দ অশ্রুত সুরে ধ্বনিত হবে, সেখানকার মাটীর বুকে তাদের চরণচিহ্ন অদৃশ্য রেখায় আঁকা থাকবে চিরকাল অনাগত যুগের প্রণয়ীদের উৎসাহ ও আনন্দ যোগাতে।

কাল বৈকালে বিশ্বনাথ ও আমি বৈকালের ট্রেণে এলাম। এসেই সারারাত মিউজিক কনফারেন্সে গান শুনেচি। এসেচি রাত চারটার সময় বিখ্যাত কেশরী বাই ও বরোদার লক্ষ্মী বাইয়ের গান শুনে। বেনারসের পুরন্দর মিশ্র ও বিলায়তুর সানাই বাজনা সত্যিকার উপভোগ করবার জিনিস। কেশরী বাই যখন বসন্ত-বাহার আলাপ আরম্ভ করলে তখন আমাতে যেন আমি নেই মনে হোল—যেন শৈশবে আমাদের গ্রামে শত-মধুর বাল্য-স্মৃতির মধ্যে ফিরে গেলুম এক মুহূর্ত্তে। কত মধুর অপরাহ্ণের ছায়ায় অতীত দিনের জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে আমার অতি প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান যেন অস্পষ্ট হয়ে এল—বুঝলুম না কোনটা অতীত আর কোনটা বর্ত্তমান। কেবল এইটুকু বুঝলুম, গান শুনতে শুনতে আমার মন আরও একজনের জন্যে খুব খারাপ হয়ে উঠলো—আজই তাকে ছেড়ে এসেচি, কেবলই মনে হচ্ছিল এত মেয়ের মধ্যে কন্‌ফারেন্সের সভায়, আমার যেন কেবল তার কথাই মনে পড়চে, অবশ্য সেই বয়সের মেয়ে দেখলে। এবার

বড় দিনের ছুটী কি আনন্দেই কেটেচে—ওকে নানা রকম গল্প করে ও কত রকম কথা বলে। সে সব এমন চমৎকার যে সারা বড় দিনের ছুটী কেমন যেন নেশার মত আনন্দের ঘোরে কেটেচে। সকালে দেখা করতে যেতুম —একদিন 'বাজার করবো' বলে তাড়াতাড়ি করচি, বল্লে—কেন এখুনি যাবেন? বল্লুম—বাজার না করলে বাড়ীতে বকবে জাহ্নবী। ও বল্লে—আপনি একটু বকুনি সহ্য করতে পারেন না? আর আমি যে আপনার জন্যে কত বকুনি সহ্য করেচি মার কাছে? আপনার তো ছোট বোনের বকুনি!

খুড়ীমা দুদিন ভাগবত শুনতে গেলেন—আমি ওর সঙ্গে বসে গল্প করলুম কত ধরনের। বেশ কাটলো ছুটীটা। কোনো ছুটী এত আনন্দে কেটেচে কিনা এর আগে বলতে পারি নে। ভালবাসার প্রকৃত রূপ কি তার কতটা যে বুঝলুম!

হাওড়া টাউন হলে ওরা আমার এক সম্বর্দ্ধনা করে মানপত্র দিয়েছিল ছুটির আগেই, তাতে রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছিলেন।

একদিন আশীষ গুপ্তের মোটরে রাজপুরে ফুলিদের ওখানে গিয়েছিলুম, সেও বড় দিনের আগে। ১৯৩৮ সালটা সবদিক দিয়ে বড় অদ্ভুত বছর আমার জীবনে।

এবারকারের আর একটী চমৎকার ঘটনা, ভাগলপুরে সুরেন গাঙ্গুলী মশায়ের সেই চেকভের Cook's Wedding বইখানা—যা পড়ে মুঙ্গেরে কোম্পানীর বাগানে, বড় বাসায় গঙ্গার ধারে আজ চোদ্দ বছর আগে কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েছিলুম—তা পড়লাম বসে—সেই বই খানাই (সুরেন গাঙ্গুলীর কাছ থেকে এনেছি, বইখানা শরৎচন্দ্রের) বারাকপুরের বাড়ীর রোয়াকে বসে পড়লুম। আশ্চর্য্য—না!

উৎকর্ণ

সুপ্রভা এবার একটা ভাল ক্যালেণ্ডার পাঠিয়েচে।

মনে আছে এই শীতকালে পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট জজের বাড়ী গঙ্গার ধারে বেঠোফেনের মিউজিক শুনতে গিয়েছিলুম গ্রামোফোন রেকর্ডে, নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে সকাল বেলা। ওপারে ধূ ধূ গঙ্গার চর শীতের নদী, বড় বটগাছটা—আমাকে কেবলই মনে এনে দিয়েছিল একটী মেয়ের কথা। সে যেন. কোথায় দূরে আছে, শিউলি বকুলের ছায়ায় ছায়ায় তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় দুপুরে, সকালে, বৈকালে, সন্ধ্যায় ছায়া ঘন হয়ে যখন নামে। যখন চা পার্টি বসলো পাটনায় গবর্ণমেণ্ট উকীলের বাড়ী সন্ধ্যা-বেলা—তখনও রাঙা। রোদ মাখানো বাইরের গাছপালার দিকে চেয়ে ওর কথাই ভেবেচি। আর কি আনন্দেই মন ভরে উঠতো!

বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন শেষ হোল পরশু, সরস্বতী পূজোর দিন। সজনীবাবু, ব্রজেন দা, তারাশঙ্কর সবাই গিয়েছিল আমার বাসায়। সজনী বাবুর সঙ্গে খুকুর দেখা করিয়ে দিলাম। তুলুর মা, মাধব ঘোষাল, রমা-প্রসন্ন, গৌরবাবু সব সকালে গিয়েছিল মোটরে। ওদের নিয়ে গেলুম বারাকপুরে। খুকুদের বাসায় চা খেয়ে গেল সবাই। বারাকপুরে আমার ঘরের মধ্যে বসলো। ইন্দুদের বাড়ী সব গেল চা খেতে। আমাদের পুরোনো ভিটে দেখলে। মায়ের কড়াখানা দেখলে—তারপর বরোজ-পোতার বাঁশবাগানে গিয়ে সবাই পড়লো শুয়ে। কিছুক্ষণ পরে মোটর মেয়েদের নিয়ে এসে পৌছোলো। তুলুর মা আর খুকু দেখি বাঁশবাগান দিয়ে চলেচে নদীর ঘাটে। তুলুর মা বাঁশবাগানে এসে দাঁড়ালো। তার-পরে আমরা যখন নদীর ঘাটে যাচ্ছি, তখন দেখি খুকু আর তুলুর মা আর উমা আসচে। আমরা কুঠীর মাঠে গেলুম, ভাঙা কুঠীটা দেখলুম।

তারপর মেয়েদের রেখে প্রথম আমরা এলুম বনগাঁয়ে। মেয়েরা পরে এলেন। সজনী, ব্রজেন দাকে নিয়ে গেলুম খুকুদের বাড়ী। খুকুর সঙ্গে কথা হোল। তারপরে বিরাট সাহিত্য-সম্মেলন স্কুলের হলে। সত্যবাবুর পার্টির পরে সবাইকে রওনা করে দিয়ে খুকুদের বাড়ী এসে গল্প করলুম। খুকু কাছের চেয়ারে বসে কাদম্বরী পড়লে। ও আর আমি দুজনে গ্রামে কেমন বেড়ালুম।

বীরভূম সাহিত্য-সম্মেলনে তারাশঙ্করদের বাড়ী এসে ক'দিন বেশ কাটালুম। কাল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে বীরভূমের উদার, উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে এক জায়গায় বসলুম। জ্যোৎস্নালোকিত মাঠের মধ্যে বসে দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খুকুর কথা ভাবলুম। ওর দ্বারা আমার যে অভাব পূরণ হয়, তা আর কারো দ্বারা যে হয় না তা বলাই বাহুল্য। ওর স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, হাসি, চোখের চাহনি, ছাদে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা—এ সবই আমার জীবনের একটা মস্ত অভাব পূর্ণ করেচে। এই কথাটাই লাভপুরে এসে পর্য্যন্ত মনে হয়েচে—বিশেষ করে কাল ওই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে বসে দূর দিগন্তের জ্যোৎস্না-প্লাবিত তালীবনের দিকে চেয়ে চেয়ে—আজ শুষ্ক রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়ে—ওই কথাই মনে হয়েচে বা কাল নির্ম্মলশিব বাবুদের বাড়ীর পেছনে সান্ধ্য-ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্যে একা বসে ওর যে ছবিটী মনে এসেচে সেটী হচ্চে—এই শনিবার, ছাদে দাঁড়িয়ে ও প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়ীখানা সাগ্রহ-দৃষ্টিতে দেখচে।

মধ্যে এখানে সুপ্রভা এসেছিল—তার সঙ্গে একদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গেলুম। তারপর সে চলে গেল। একদিন আমার মেসে এল সকালে

প্রীতি সেন বলে একটী মেয়ের সঙ্গে। ওকে শেয়ালদ' স্টেশনে তুলে দিয়ে এলুম। তারপর বাড়ী গিয়ে খুকুর সঙ্গে এ সব গল্প করি। খুড়ীমার অসুখ হয়েচে। খুকু ও আমি বসে অনেক গল্প করি। মনোরমা ও তার বরের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে বারাকপুর গেলুম। প্রচুর আমের বউল হয়েচে দেশে, বউলের ঘন গন্ধ সর্ব্বত্র। ন'দিদির সঙ্গে গল্প করি। কিশোর বোষ্টম রোয়াকটা ঝাঁট দিয়ে দিলে। বরোজপোতার বাঁশবনে ডোবার ওপারে কি চমৎকার একটা চারা শিমুল গাছে শিমুল ফুল ফুটেচে। শ্যামাচরণদা'র সঙ্গে গল্প করি। খুকুদের বাড়ীর দিকে কেউ নাই যেন—শূন্য! খুকুর কাছে সে গল্প করি দুপুরে গিয়ে। খুকু বলে 'বসুন, জিরিয়ে যাবেন।' তারপর মাধব ঘোষাল একদিন তার বৌদিদি, মাসীমাকে নিয়ে বারাকপুর গিয়ে বাঁশবনে বসলো—মায়ের কড়াখানা দেখে এল। ক্ষেত্র বাবুর সঙ্গে একদিন Salt lake দেখতে গেলুম।

পরশু গিয়েছিলুম তুটুর কর্ম্মস্থল বেলডাঙা। আজ ফিরেচি। কাল এমুনি সময় মামীমা, বৌমাকে নিয়ে বহরমপুর গিয়েছিলুম। জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গার ধারে ঠিক যেন ইসমাইলপুরের মত মনে হোল। তারপর জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে ভাবলুম!

আজ ফিরেচি তিনটের ট্রেণে। দুপুরের রোদে সারাপথ ঘুমিয়েচি—তবে, বীরনগরের কাছে ঘেঁটুফুল দেখেচি খুব। দুরে এই ফাগুন দুপুরে একটী মাত্র গ্রাম এত গ্রামের মধ্যে, যেখানে একটী মাত্র মেয়ের কথা মনে হয়। শিউলিতলায় ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুল কমিটির মিটিং ছিল, মিটিংএর পরে স্কুলের ছাদ থেকে বড় অনুভূতি হোল অনেকদিন পরে। 'জনতার মাঝে জনগণপতি' গানটী বহুদিন পরে গাইলুম—সঙ্গে

সঙ্গে সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি আবার মনের মধ্যে ফিরে পেলুম। তখন খুকু ছিল না—যখন গাইতুম পঞ্চানন মামাকে পড়বার সময়ে।

ট্রামে আসতে আসতে ভাবছিলুম, সেই যে নাগপঞ্চমীর দিন শ্রাবণ মাসে বারাকপুরে গিয়েছিলুম, খুকুদের বাড়ী যেতুম, ওদের হাসাতুম 'ছোড়দি, ভাল কি মন্দ' বলে—তারপর যেন আর কখনো বারাকপুর যাইনি—ওকে আর দেখিওনি। ও চলে যেন কাছে দিয়ে, আমি হাত বাড়িয়ে চালের বাতা থেকে কাপড়ের ফালি পাড়তুম—ও বলতো, মা রেখেচে তুলে, হাত দেবেন না। তারপর যেন এই দীর্ঘ সাত-আট মাস ওর সঙ্গে দেখা হয় নি।

খুকু একরকম ঠেলেই বারাকপুরে পাঠালে এবার। মহরম ও দোলের ছুটি আর বছর কেটেছিল গালুডি, এবার বনগাঁ। খুব আনন্দে কাটিয়েচি। চারদিন খুকু ও আমি একবার সকালে একবার সন্ধ্যায় বসে গল্প করতুম। একদিন ওকে নক্ষত্র সম্বন্ধে আমার Radio talk-টা পড়ে শোনালুম।

ঝমঝম্ দুপুরে গেলুম বারাকপুর। সারাপথ ঘেঁটুফুলের কি সুগন্ধ! বিশেষ করে চাল্‌কী আর বনগাঁ থেকে বার হয়েই। চাল্‌কী মুসলমান পাড়ার মধ্যে, গাজিতলার রাস্তায় বাঁশবনে একা চুপ করে মায়ের বাড়ীখানার সামনে বসে রইলুম। বাঁশপাতায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। কোকিল ডাকচে অনবরত। সেদিন মাধব ঘোষালেরা মোটরে বেড়াতে এসে ওর বৌদিদি ও মামীমাকে নিয়ে এই বরোজপোতার বাঁশবনে বসেছিল।

কাল শনিবার বেলডাঙা গিয়েছিলুম খুটুর কাছে। সারাপথ ঘেঁটু-ফুলের শোভা যা দেখলুম, তাতে মন মুগ্ধ হয়ে গেছে। এই ফুলটা বেশী আছে মদনপুর ও শিমুরালি স্টেশনের কাছে এবং রাণাঘাট পর্যন্ত রেল লাইনের দু-ধারে, আর আছে বীরনগরে স্টেশনের সামনের মাঠে। কেমন একটা মিষ্টি অথচ ঈষৎ তেতো গন্ধ বার হয় ফুল থেকে! মুর্শিদাবাদের লাইনে ঘেঁটুফুল নেই, বেলডাঙা ছাড়িয়ে বহরমপুরের পথে কিছু আছে আর আছে 'পাগলাচণ্ডী' বলে স্টেশানের কাছে।

সন্ধ্যার আগেই বেলডাঙ্গা থেকে ফিরলুম মামীমাদের নিয়ে, সারাপথ দূরে একটী গ্রামের ঘেঁটুফুলের বনের কথা চিন্তা করেচি, তার বনসিমতলার ঘাট, তার শিউলিতলা, আমতলা এই বসন্তে কি মধুর হয়েচে! একটী মেয়ের কথা মনে হয় ঝমঝম্ দুপুরে তেতো ঘেঁটুফুলের গন্ধের মধ্যে সে শিউলিতলার পথ দিয়ে লেবুতলার পাশ দিয়ে আমতলার উঠানে আসচে চুপি চুপি!...এ একটা ছবি, যা এ সময় বড় মনে আসে...

গত শনিবারের আগের শনিবারে মাধব ঘোষাল একটা গ্রামোফোন দিলে তাই নিয়ে বনগাঁ গেলুম। খুকুকে খুব গান শোনালুম, 'খনা' ছবি দেখাতে নিয়ে গেলুম ওদের সকলকেই। খুকু একখানা পাপোষ বুনেছে দড়ির। সেখানা আমায় হাসিমুখে নিয়ে এসে দেখাতে লাগলে—দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

—দেখুন, কেমন বুনেছি, ভালো না?

—বেশ ভাল, চমৎকার।

—না সত্যি বলুন!

—না না বেশ।

তবুও যায় না। পাপোষখানা হাতে নিয়ে সাগ্রহ মুখে দাঁড়িয়েই রইল দরজার কাছে।

তার সেই হাসি হাসি মুখখানা বেশ মনে পড়ছে এখনও। সুন্দর, উজ্জ্বল মুখখানা।

গত কাল রামনবমীর হাফ্‌ছুটী পেয়ে রাজপুরে কুণিদের বাড়ী গেলুম। ওরা সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়ীতে আছে! অনেকদিন পরে সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়ীতে গেলুম। সেই পুকুরধারটীতে কতকাল পরে আবার দাঁড়ালুম। আমার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ হয় এই পুকুর পাড়ের ঐ দেবদারু গাছটা দেখে। কি অপূর্ব্ব ভাবই হোত মনে!

এই শনিবারে (২রা) বাড়ী গিয়ে মুখুজ্যেদের ওখানে খুব গ্রামোফোন বাজানো গেল। গত ইস্টারের ছুটীতে খুকুকে গ্রামোফোন শোনাবো বলে বনগাঁয়ের ডাক্তারবাবুকে কত বলে বারাকপুরে নিয়ে গিয়েছিলুম। এবার ও নিজেই একটা গ্রামোফোন পেয়েচে মাধব গোয়ালের কাছ থেকে। আমায় রেকর্ড চেয়ে আনতে বলেছিল। ওরাও দেখি, দিলীপ রায়ের আর বছরের ভাল ভাল গান 'এই পৃথিবীর পথের পরে' প্রভৃতি ভাল গানগুলো পেয়েচে। সেদিন রবিবারে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত আমায় উঠতে দেয় না—কেবল বলে—"এইটে শুনে যান না। লাইলি মজনুর পালাটা শুনে যান।" বহু লোক এসেচে, চা করচে খুব, আর বলচে—"রবিবার দিনটাই কি সব বড় ভিড়! অন্য দিনও তো আসলে পারতে গান শুনতে।" ওর জন্যে প্রাণপণে ঘুরে রেকর্ড সংগ্রহ করেচে ওর দাদা বনগাঁর সব জায়গা ঘুরেচে। আমায় বলেছিল—আমিও অপূর্ব্ব বাবুর বাড়ী থেকে, দেবাশীসের কাছ থেকে, গণপতি বাবুকে বলে নানা

জায়গা থেকে অনেক রেকর্ড যোগাড় করচি। বীণা চৌধুরীর গান, দিলীপের, জ্ঞান গোঁসাই-এর গান ইত্যাদি। ভারি উৎসাহ লেগেচে রেকর্ড সংগ্রহ নিয়ে ও গান বাজানো নিয়ে। সেদিন বল্লে—এবার টিপ আনবেন আমার জন্যে ?

বল্লুম—বেশ।

—আর কি আনবেন ?

—বল্ না।

—কলকাতায় আর একবার যেতে হবে।

—যেও, ভালই তো।

—টিপ আনবেন ঠিক।

মধ্যে গেলুম রাজসাহী নওগাঁ,। রাত্রে মোটর নিয়ে গেলুম মহাদেবপুর জমিদার বাড়ী। সেখান থেকে পাহাড়পুর। প্রায় সত্তর মাইল মোটরে বেড়ান গেল। এ শনিবারে বনগাঁ গিয়েচি—পান্নারা নিয়ে গেল বাসে। যখন যাচ্ছি, তখন খুকু দেখি জানলার কাছে বসে গ্রামোফোন বাজাচ্চে। সকালে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করেছিল—আমায় বল্লে, টিপ ফুরিয়ে গিয়েচে, টিপ আনবেন কিন্তু।

আজ একুশ বছর পরে বারাকপুরে কালীর সঙ্গে বেলডাঙা বেড়াতে গিয়ে মরগাঙের ধারে সেই উঁচু জায়গাটাতে বসলুম। ১৯১৮ সালের মে মাসে প্রথমে শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসে ওকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে বসে গল্প করেছিলুম। আজ আবার এত বৎসর পরে ওর সঙ্গে মরগাঙের ধারে বসেচি সেই মে মাসেই। জীবনের কত ঘটনা তারপর ঘটে গেল—গৌরী

এখানে এল, তাকে নিয়ে পানিতরে গেলুম—সে মারা গেল—তারপর জব্বলপুর, হরিনাভি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, আবার কলকাতা, ভাগলপুর—আবার কলকাতা—(১৯৩৩—৩৯) কত কি, কত কি। আবার এত-কাল পরে ও এসেচে, ওর সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে এসেচি বেলেডাঙায়। ওর সঙ্গে অনেক গল্প করে আইনদ্দির বাড়ী গিয়ে দুজনে বসি.। ওবেলা আমগাছে পরগাছা হয়েছিল তাই তুলে এনেছিলুম। খুকু তাই পরে এসে দেখালে কেমন দেখাচ্চে।

গ্রীষ্মের ছুটী আরম্ভ হয়ে গিয়েচে—এতদিন পরে বেশ লাগচে। আবার সুরু হয়েচে শিউলিতলার উঠোনে আসা, যাওয়া—নারকোল গাছের পাতায় লণ্ঠনের আলো পড়া—সেই সব প্রতি বছরের মত।

বিকেলে একটা সোঁদালি গাছে ঠেস্ দিয়ে কুটীর মাঠে অনেকক্ষণ বসে-ছিলুম। তারপর বনসিমতলার মাঠে এসে দেখি খুকু ঘাট থেকে পথে উঠেচে। খুড়ীমা তখনও জলে। ওরা ওঠে চলে গেল, আদাড়ি এসে নামলো জলে। আজ কি চমৎকার কালবৈশাখীর কালো মেঘ করে এল কাঁটিকাটার দিকে। জলে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। তারপরে শিমুলতলায় এসে দেখি উত্তর মাঠে কালবৈশাখী আরও নিবিড় হয়ে আসচে। কত কথা মনে করিয়ে দেয় এই বারাকপুরের কালবৈশাখী—এমন আর কোথাও যেন দেখিনি। জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে আসা সার্থক এই কালবৈশাখীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখতে পাওয়া যায় বলে। বারাক-পুরে আজকাল জীবনটা নানা সুখেদুঃখে হর্ষবেদনায় স্পন্দমান, পুরোণো দিনের স্মৃতির পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়—তাই হয়েছিল কিন্তু দিনকতক, ১৯২৩—১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত। অদ্ভুত ধরণের জীবন্ত দিন আজকাল—তবে

বোধহয় এইবার যেন আরও বেশী। পরশু সুপ্রভার পত্র পেয়েছি—রত্নাদেবীর চিঠিতে তিনি লিখচেন তাঁদের ওখানে যেতে। দেখি কতদূর কি হয়।

আজ সকালে যখন কুঠীর মাঠে গিয়েচি, তখনই দূরে কোথাও আকাশের কোলে মেঘ ডাকচে। কি সোঁদালি ফুলে-ভরা মাঠের শোভা! ওপাড়ার ঘাটে যখন নেমেচি জলে, তখন ঝড়ো মেঘের কি শোভা! ঘন কালো মেঘপুঞ্জ ঘুরে ঘুরে ওলট-পালট খেতে খেতে মাধবপুরের মাঠের দিকে উড়ে চলেচে—তারপরেই এল ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি। খানিক পরে উঠলো রোদ। খুকু ওই অত বেলায় উঠে যাচ্চে ন'দিদির বাড়ী থেকে—আমি বলতেই হেসে চলে গেল। তারপর সারাদিনের মধ্যে কতবার এল গেল—নানা ছুতোয়। আমতলায় চেয়ার পেতে বসে আছি—দুবার এসে খানিকক্ষণ করে রইল। বলে—এক পা এগিয়ে যাই তো দু' পা পিছুই। কেন তা কি জানি। সে কথাটা ওদের দাওয়া থেকে নেমে ছুটে এসে আমতলায় বলে চলে গেল। বিকেলে গোপালনগর থেকে এসেচি—ও অমনি এল শিউলিতলায়। খানিকটা পরে নাপিত বৌ আসাতে আমি চলে গেলুম গা ধুতে। ভুবন মাঝির জমির ওপারে সোঁদালি ফুল ফুটেচে—সে দিকে চেয়ে আমার কি আনন্দ—এমন অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি কোথাও হয় না কেন তাই ভাবি। [illegible] গা ধুতে নেমেও যেন আর উঠতে ইচ্ছে করে না। বনসিমতলার ঘাট, একফালি চাঁদ আকাশে, কুঁচ কাঁটার জঙ্গল—ঘাটে স্নানরত খুকুর দিদি—বিশেষতঃ ঘাটের পথে—এই সব মিলে কি আনন্দই এল মনে! অপূর্ব্ব আনন্দে কাটচে গ্রীষ্মের ছুটিটা। রোজ সকালে উঠে মনে হয় আজ না জানি

কি ঘটবে। খুকু থাকে বলেই আনন্দটা ঘনীভূত হচ্চে। আনন্দের উৎসমূল তো ওই-ই।

আজ ভারি চমৎকার কালবৈশাখী হয়ে গেল বিকেলটাতে। কালবৈশাখীর সে অপূর্ব্ব প্রকাশ এখন সন্ধ্যার কিছু আগে। একটা চাপা রাঙা মেঘ হয়েচে এমন অপরূপ। কাল চাটগাঁ থেকে রেন্টুর পত্র পেয়েচি। সে লিখেচে—বাবা, আপনি একবার এখানে চলে আসুন। লিখতে লিখতে মেঘটা অতি অপরূপ রাঙা রং ধরেচে। বারাকপুরে এবার অতি সুন্দর কাটচে—তবে ঝড়-বৃষ্টি অতি কম—ক'দিন তো বেশ গরম গেল।

আমি আর কালী, কুঠীর গাছে ডুমুর পাড়লুম। তারপর বেলেডাঙ্গা যেতে যেতে ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় পেলুম। ঘোষেদের দোকানের মধ্যে আমি, কালী, আইনদ্দির নাতি আর দোকানদার মনু ঘোষ। ঝড়ের বেগে দোচালা জীর্ণ ঘর উড়ে যায় আর কি—সবাই মিলে বাঁশ ধরে থাকি—তবে রক্ষা হয়। তারপর দেখি বড় অশ্বত্থ গাছটা পড়ে গিয়েচে। আমার নারকোল গাছটাও পড়েচে। খুকুরা নারকোল কুড়িয়ে রেখেচে সব। খুকু সন্ধ্যার সময় আমার লণ্ঠন ধরে ওদের বাড়ী নিয়ে গেল। বল্লে, আজ খুব ভাল গল্পের দিন। যাবেন না আমাদের বাড়ী? ও রোজ সন্ধ্যার সময় আমায় নিতে আসে—ছুতো করে ন'দিদিদের বাড়ী আসে আমায় নিয়ে যেতে। যাবার সময় বলে—যাবেন কি?

আজ বিকেলের দিকে অপূর্ব্ব কাজল মেঘ করে এল—থমকে রইল বৃষ্টি হোল না। খুকু আজ সকাল থেকে কতবার যে এল! আমি বেলেডাঙ্গায়

বড়াতে গেলুম, পুলের এধারে ঘাসের ওপরে বসি। খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি খেজুর, শিমুল বাঁশ বনের মাথায় কালো কাজল মেঘ (খুকুকে দুপুরে বলছিলুম আমতলায় যখন সে দীলিপ রায়ের 'তরঙ্গ রোধিবে কে?' বইখানা দিতে এল—তুই বলতিস—কা-লো-কাজল মেঘ) সব সুদ্ধ মিলে বড় অপূর্ব্ব লাগালো।

এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম, এই বাঁশ শিমুল বনে অপরাজেয় শোভা এমনি ধারা দেখা যায়—ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে—কত বনসিমতলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি কান্না প্রেম বিরহ—এই রকম চলবে। এদের নিয়ে একটা বড় উপন্যাস লিখবো আজ মাথায় এসেছে। পৃথিবীর উর্দ্ধে এই শ্যামল মেঘ স্তূপ যেমন শান্ত, স্থির তেমনি নির্ব্বিকার। মহাকাল যেন এই উপন্যাসের পটভূমি—নায়ক নায়িকা গ্রাম্য নরনারী। Da Vinci-র শেষ জীবনের মত গম্ভীর তার আকৃতি। সন্ধ্যায় স্নান ক'রে ফিরে এলুম—খুকু মনোরমার মার সঙ্গে বাঁশতলার পথে ঘাটে যাচ্চে। তাকেও এই উপন্যাসের মধ্যে স্থান দেবো।

আজ দিনটি সব দিক দিয়ে ভারী চমৎকার। বেশ মেঘ করে এল, ঘন আমতলায় চেয়ার পেতে বসে দাওয়ার কোণে দণ্ডায়মানা খুকুর সঙ্গে কথা বলচি। দুপুরের পর ইন্দু, আমি, গুটকে কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে মোল্লাহাটি গেলুম। ইন্দু গেল আমডোবে। আমি ও গুটকে মোল্লাহাটি কুঠী ও নীলের হাউজঘর দেখি এতকাল পরে। কি সুন্দর শ্যাম শোভা, অনুন্নত খেজুর গাছ, জলি ধানের ক্ষেত পথের দু পাশে, একটা সমাধি দেখলুম বাঁওড়ের ধারে মোল্লাহাটিতে। ফিরবার পথে খুব জামরুল পাড়লুম দুধারের

গাছ থেকে। বেলা পাঁচ টার সময় ফিরে রোয়াকে এসে বসেচি, খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

আজ সকালে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েচি, অপরূপ নীল মেঘ ওপারের চরের ওপরে ঝুলে পড়েচে। তাড়াতাড়ি এসে খুকুকে ডাকলুম—খুকু, খুকু উঠে মেঘের অপূর্ব্ব রূপ দেখে যা—ও ঘুম ভেঙ্গে উঠে ঘুম চোখে মশারীর বাইরে মুখ বার করে বললো, আজ এত কাল পরে বর্ষা নামলো বোধ হয়। পথে ঘাটে কালও এত ধুলো—যে একখানা গরুর গাড়ী গেলে ধুলোয় সর্ব্বাঙ্গ ভরে যায়। শেষ জ্যৈষ্ঠে এমন শুকনো খট্‌খটে রাস্তা, এমন ধুলো কখনো দেখিনি। আজও ধুলো ভেজেনি পথের। এ বৃষ্টিতে দিনটা ঠাণ্ডা হোল মাত্র।

এবার গ্রীষ্মের ছুটীর প্রতিদিনটী যে আনন্দ বহন করে আনে, তা মনের আয়ুকে যেন বাড়িয়ে দিয়েচে। দেহের যৌবনের ন্যায় মনের একটা যৌবন আছে, মনের যৌবন চায় নব আনন্দ, নব নব ভাবরাজি, আশা, উৎসাহ, সৌন্দর্য্যময় চিন্তা, কল্পনা, ভক্তি, বিরাটত্বের স্বরূপ উপলব্ধি। এবারকার মত সোঁদালি ফুলের মেলা, তুঁত ফুলের ও বিল্বপুষ্পের সুগন্ধ অন্যবার দেখা যায় নি, কারণ এবার ঝড়-বৃষ্টি বাদলা নেই বল্লেই হয়—খুকু এখানেই আছে, সে সর্ব্বদাই আসচে, গল্প করচে, গোপালনগরে বারোয়ারীর যাত্রা হবে, আমার বাল্যবন্ধু কালী অনেকদিন পরে গ্রামে এসেছিল এই সব নানা কারণে গ্রীষ্মের ছুটীতে এমন আমোদ অনেক দিন হয় নি। খুকু এই সবে ন'দিদির ঘর খুলবার ছুতো করে এসে গল্প করে গেল উঠোনে দাঁড়িয়ে। এই সব বিরাট আকাশের তলে, বন-গাছের ছায়ায়

উৎকর্ণ

যেসব সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র প্রবাহ চলেচে—আর সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েচি যেন, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মের ছুটীতে প্রথম আসি বারাকপুরে, আজ এটী ১৯৩৯ সাল। এই এগারো বছর কি চমৎকার কাটলো! কত বর্ষার শ্যামল-মেদুর আকাশ, কত হেমন্ত-জ্যোৎস্না রাত্রি, কত শীতের অপূর্ব্ব সন্ধ্যা নানা অনুভূতিতে মধুর হয়ে উঠলো। আমার জীবনের ১৯২৯-১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই যে সময়টা—বড় চমৎকার সময়।

ছুটি ফুরিয়ে এল। আর দশ এগারো দিন। কিন্তু এবার তেমন বৃষ্টি একদিনও হয়নি—ব্যাঙ-ডাকানি বর্ষা, সারারাত ধরে বৃষ্টি-ঝড়, সে সব হয়নি বা নাইবার সময়ে ঘাটের পথে খাপরা কুচির ওপর দিয়ে জলের তোড় চলে যায়—কেঁচোর দল জলে বুকে হেঁটে যায়, এ-ও এবার হয়নি। মাস ফুরিয়েচে। হাজরী পাগলার মাকে সেদিন পর্য্যন্ত আম বাগানে আম কুড়ুতে দেখেচি—আজকাল আর দেখিনে।

ক'দিন বারোয়ারির আসরে গোপালনগরে গনেশ অপেরা পার্টির গান হোল। রোজ শুনতে যেতুম—একদিন তো বনগাঁ থেকে ন'টার ট্রেনে নেমে যাত্রা শুনে রাত দু'টোতে ফিরি। শেষদিন যাত্রা হোল হাজারি প্রামাণিকদের বাড়ী। সুধীর দা, জিতেন, আমি তাস খেলা হোল সন্ধ্যাবেলা। কারণ খুব মেঘ ছিল আকাশে, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছিল বলে যাত্রা আরম্ভ হতে পারেনি।

ছুটি শেষ হয়ে এল প্রায়। বাঁশবনে পিপুল লতার বন দেখা দিয়েচে। ভেদলা ঘাসের কুচো সাদা ফুল মাঠে অজস্র ফুটতে সুরু করেচে। কোকিলের ডাক অনেক কমে এসেচে—তবে বৌ-কথা-কও ডাকচে বেশী।

এই যে লিখচি, জানালার উপরে বসে—হরি রায়ের বড় খেজুর গাছটা থেকে ডাসা খেজুরের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আজ ও-বেলা খুকুকে একটা কবিতা লিখে শোনালুম সকালে।

আজও সকালে বাঁওড়ের ধারের বট-অশথ গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেলেডাঙ্গা পর্য্যন্ত গিয়েচি। ছুতোর ঘাটার কাছে দেখি রাখাল বাড়ুয্যের স্ত্রী স্নান করে আসচেন। বল্লুম, ও খুড়ীমা, আপনার ভাই চলে গিয়েচে? উনি বল্লেন, সে তো সেদিনই গিয়েচে। আমিও যাবো। এদেশে আবার মানুষে বাস করে? বল্লুম, কেন এদেশের ওপর হঠাৎ অত চটে গেলেন যে! কোথায় যাবেন? বল্লেন, ভাইয়েদের কাছে চলে যাবো। তারপর ওর ভাইদের গুণ-কাহিনী আমার কাছে সবিস্তারে বলতে লাগলেন। আমি তাঁর হাত এড়িয়ে খানিকটা এসে দেখি পথের ধারে পাতাল-কেঁড়ে হয়ে আছে। আদাড়ির নাতি মধুকে ডাকলুম, সেও বল্লে,—এগুলো পাতাল-কেঁড়ে। তারপর ভেদ্‌লা ঘাসের শয্যায় মাঠের মধ্যে গামছা পেতে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। বেশ লাগে! স্নান করে বড় আনন্দ পেলুম আজ—নদীর জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি যেন কাকের চোখের মত স্বচ্ছ! বাড়ী এসে শুনি ওগুলো নাকি পাতাল কেঁড়ে নয়।

সকালে ভাণ্ডারখোলা গেলুম, কাকার মেয়ে শৈলর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে গেল গুটকে। রাস্তা বেজায় খারাপ—যাবার সময় রোদ ছিল খুব—পাল্লা ছাড়িয়ে বড় মাঠ—গাছপালা কম—কেবল একটা বড় বটগাছ আছে—হরিশপুরের মধ্যেও গাছ নেই—ভাণ্ডারখোলা গিয়ে পৌঁছুলাম বেলা তখন দশটা। ওদের চণ্ডীমণ্ডপে আগে একবার গিয়েছিলুম দেবব্রতের কথা ভাবতুম তখন। শৈলর সঙ্গে দেখা হোল—অনেক

দুঃখ করলে সে। ভাইয়েরা দেখে না, নিয়ে যায় না। আসবার সময় বাড়ীর বাইরে তেঁতুলতলার পথে দাঁড়িয়ে রইল—প্রণাম করে বল্লে, আপনি এসেচেন বড় শান্তি হয়েচে আমার। আমি যদি মরেও যাই—আমার মেয়ে দুটোকে দেখবেন আপনারা। বড় কষ্ট হোল মেয়েটাকে দেখে—ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল—খুব অবস্থাপন্ন ঘরে। কিন্তু ওর কপাল-ক্রমে অল্প বয়সে বিধবা হোল—এখন ভাসুর দেওরেরা ওকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে আসবার সময় হরিশপুর ছাড়িয়েই কালো কাজল মেঘ বারাক-পুরের দিকে জুড়ে যাচ্ছে—মাদেলার বিলের ওপর দিয়ে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটা বটগাছতলায় আশ্রয় নিলুম—ততক্ষণ বসে 'War and Peace' পড়লুম গাছতলায়। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামলো।

রাস্তায় হয়ে গেল ভয়ানক কাদা। পথ হাঁটা যায় না—কেবল পা পিছ্‌লে যাচ্চে।

কাউকে পাড়ায় বলে যাইনি। এসে রোয়াকে বসেচি—খুকু ন'দিদিদের ঘরে কলের গান বাজিয়ে পাড়ার মেয়েদের শোনাচ্চিল—নন্দর মার মুখে শুনলে আমি এসেচি। বার হয়ে এসে চুপি চুপি বলচে—কোথায় গিয়েছিলেন?—

—ভাণ্ডারখোলা।

ও গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর খুড়িমা ঘাটে গেলে, ও এসে অনেকক্ষণ রইল। বল্লে,—মাকে পঞ্চাশ বার জিগ্যেস করেচি,—মা বিভূতিদা গেল কোথায়? একবার ভাবলুম বনগাঁ! কিন্তু বলে যেতেন তা হোলে।

এই দিনই খুকু রাত্রে প্রস্তাব করলে কোথাও বেড়ানো যায় কি না।

বল্লে, নৌকোয় করে বনগাঁ ওরা যাবে ৫ই আষাঢ়। তারপর সব ঠিক করা হবে। খুব উৎসাহ মনে।

এদিন সকালে পা মচ্‌কে গিয়ে ব্যথায় সারাদিন কষ্ট। কোথাও নড়তে চড়তে পারি নি। রাত্রে গোপাল এসে ভাত দিয় গেল আমার বাড়া।

এদিন নৌকো করে খুড়ীমা, আমি এবং খুকু বনগাঁ এলুম সন্ধ্যার সময়। বনসিমতলার ঘাট থেকে বিকেলে আমরা বিদায় নিলাম ও রেকর্ডের বাক্স বইচে, বল্লাম—রেকর্ডগুলো দে।

ও বল্লে—আচ্ছা, খোঁড়া পীর! থাক—আমিই বইচি।

গল্প করতে করতে আর কলের গান বাজাতে বাজাতে নদীর ওপর দিয়ে আসা গেল। এক একটা নৌকো আসে, আর বলি খুকু, ভদ্রলোকের নৌকো আসচে—একটা ভাল গান দে।

ও এমনি (এই পর্য্যন্ত লিখে রেখেছিলুম, তারপর তিনমাস ঝঞ্ঝাটে কাট্‌লো বলে লিখতে পারিনি, আজ আবার লিখচি পূজোর ছুটীর মধ্যে, আজ ১৪ই অক্টোবর) একখানা ভাল রেকর্ড দেয়। এমনি করে বনগাঁ এসে পৌছানো গেল। সেই রাত্রে লণ্ঠন ধরে আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকি—আর কুলিতে জিনিস বয়ে নিয়ে যায় খুকুদের বাসায়।

তার পরদিনের পরের দিন আমরা এলুম কলকাতায়—সেখান থেকে আসাম মেলে রওনা। পদ্মার পুল দেখে খুকু খুব খুসি। পার্ব্বতীপুর স্টেশনে আমরা প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে খেলুম। রাত্রিতে খুকু কেবল আমায় জাগায় আর বলে দেখুন দেখুন—কত বড় নদী চলে গেল!

সকালে নেমে গৌহাটী। তথনই মোটর বাসে বশিষ্ঠ আশ্রম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেখান থেকে দুপুরে পাহাড়ে উঠি। সেইদিনই আমরা রওনা হই। বিকালে পাণ্ডুঘাটে একটা খাবারের দোকানে খাওয়ার সময় খুকু বল্লে,—দাঁড়ান, দাঁড়ান ওরা বিল দেবে তো! কথাটা আমার বড় ভাল লাগলো। এরা আবার খাবার দোকানে বিল দেয় নাকি!

সকালে পার্ব্বতীপুরে আবার চা খেলুম সকলে। সেইদিনই বৈকালের ট্রেণে বনগাঁ।

খুকুর বিয়ে হোল এই দিনে। আমি বিকেলের গাড়ীতে বনগাঁ গেলুম। আমার হাতে ছিল একখানা 'লিপিকা', আমার কাগজ নতুন বার হয়েচে। সেখানা ওর হাতে নিয়ে গিয়ে দিলুম। ও এল বাইরের ঘরে। বল্লে—এত দেরিতে এলেন যে বড়? বিবাহ চুকে গেলে রাত তিনটের ট্রেনে কলকাতা এলুম।

এদিন পাবনা গেলুম সভাপতিত্ব করতে। আর বছর এই দিনে নাগপঞ্চমীর দিন বাড়ী গিয়েছিলুম—খুকুর বাড়ী খেয়েছিলুম সেকথা মনে পড়লো। সৎসঙ্গ আশ্রমে গিয়ে নতুন মেজ-বৌদিদির সঙ্গে আলাপ হোল। মেজ-বৌদিদির দুই বোন গান করলে বেশ।

খুকুর পত্র পেলুম মানকুণ্ডু থেকে। ও লিখেচে যেতে। বিকেলের গাড়ীতে মানকুণ্ডু গেলুম। আমি, দেবু ও খুকু বেড়াতে গেলুম খাঁ-দের বাগানে। খুব যত্ন করলে। অনেক কথা বল্লে। তারপর দিন চলে এলাম।

উৎকর্ণ

পূজোর ছুটী প্রায় শেষ হয়ে এল। বনগাঁতেই ছিলুম সারা ছুটী। খুকুও আছে বনগাঁয়ে। ওদের বাড়ী প্রায়ই দুবেলা বেড়াতে যাই। একদিন যাইনি, সেদিন সপ্তমী পূজোর দিন, হাজারীর বাড়ী গোলাপনগর গেলুম বেড়াতে। অল্পদিন হোল বর্ষা থেমেচে, শ্যাম্‌লি লতায় ফুল ধরেচে, আরও নানা বনফুলের সুগন্ধ সকালের বাতাসে। আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। হাজারি ওখানে খেতে বল্লে। সুধীর দা, জিতেন, আমি, বিজন—সবাই মিলে খুব আড্ডা দেওয়া গেল। গত গ্রীষ্মের ছুটীতে একদিন রাত্রে বারাকপুরের বাড়ীতে যে লোকটী আমায় কবিতা শুনিয়েছিল, সেই কুণ্ডু মশায় আমাকে নিভৃতে ডেকে তার নতুন লেখা কবিতা শোনালে। গৌর কলুর দোকানে বসে অল্পক্ষণ গল্প করি। এসব জায়গায় আসিনি আজ চার মাস—সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটির পর আর আসিনি। এসব জায়গায় যেন বারাকপুরের জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমের ছুটীর আবহাওয়া মাখানো, খুকু মাখানো, বকুলতলা মাখানো—আমার হাট করে নিয়ে যাওয়া, "ও খুকু, হাট নিয়ে যা খুড়ীমা কোথায়?" সেই সব দিনের শত স্মৃতি জড়ানো গৌর কলুর দোকানের সঙ্গে। ফিরবার পথে গাজিতলায় ভাঙনের ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। ওই দূরে বনসিমতলার ঘাট, কে একটি ছোট মেয়ে যেন এখনও স্নান করে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে সিমতলায় ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার চকিত নয়নে পিছন দিকে চাইলে। বনগাঁয়ে ফিরে সার্ব্বজনীন পূজার আরতি দেখতে গিয়েচি প্রফুল্লদের বাড়ী। আজ দুবেলাই খুকুদের বাড়ী যাইনি। একটু পরে ভিড়ের মধ্যে খুকু এসে দাঁড়ালো, চারিদিকে চেয়ে দেখলে—তারপর চৌকির ওপর উঠে ঠাকুর দেখতে লাগলো আর

মাছে মাঝে এদিকে চাইচে। বেজায় রাগ করেচে আজ সারাদিন যাইনি বলে। পরদিন সকালে ভয়ানক অনুযোগ ও অভিমানের পালা।

তারপর একদিন নকফুল হরিপদ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী নৌকা করে নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম—আমি, মন্মথ দা, বিভূতি। আমাদের ঘাটে নেমে গুটুকেকে ডাকতে গেলুম, আমি, বিভূতি ও মন্মথ দা। গুটুকে ইন্দুরা ছেলে, গরীব বাপ, ভাবলুম নিয়ে যাই, ভাল মন্দটা খেতে পাবে এখন। গিয়ে শুনি তার জ্বর।

সন্ধ্যার সময় নকফুল থেকে যখন ফিরচি, তখন দেখি দেবু একখানা নৌকা থেকে বলচে—ও বিভূতি দা!…দুজনে বেড়াতে বার হয়েচে মহাষ্টমীর দিনটা!

বনগাঁতেই ছিলুম। খয়রামারির মাঠে বেড়াতে যেতুম। একদিন গিয়েছিলুম চাল্‌কী। নরেন দা এসে নিমন্ত্রণ করেছিল। অজস্র বন-তারার ফুল ফুটেচে বনে ঝোপে, ছাতিম ফুল ফুটেচে—বৃষ্টি থেমে যাওয়ার দরুণ পথঘাট খট্‌খট্ করচে শুকনো, বেশ লাগলো। চাল্‌কীতে খেয়ে দেয়ে গেলুম বারাকপুর। আমার রোয়াকে চেয়ার পেতে বসলুম সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের পরে। মনে হোল এক্ষুনি খুকু যেন আঁচল উড়িয়ে আসচে পাশের বাড়ীর শিউলিতলা থেকে। আর তার সঙ্গে ওভাবে জীবনে কখনই হয়তো দেখা হবে না। আর কোনদিন সে আঁচল উড়িয়ে পাশের উঠোনের পথটী চেয়ে আসবে না আগের মত। মনে পড়ে ওদের উঠোনের ওই বড় শিউলি গাছটার ফুল ফুটতো এই পূজোর সময়—আমি বসে বসে এইখানে 'আইভ্যানহো'র অনুবাদ করতুম, আমার কাছে রোজ সন্দে বেলা আসাই চাই ওর—ভোটের গাড়ীতে নানা ছুতো করে আমার বনগাঁ থেকে আসা—সে সব দিনের কথা কোনোদিন ভোলা যাবে না।

তারপর ঘাটের ধারে গুটুকের সঙ্গে মাছ ধরা দেখতে গেলুম। সতুকাকা, ইন্দু, শ্যামাচরণ দা মাছ ধরচে। ইন্দু গল্প করতে করতে পাকা রাস্তায় এলো। বেলা তিনটে পর্য্যন্ত বাড়ীতে শুয়ে থেকে মন্মথদার বাড়ী এসে চা খেলুম। তারপর ক্রমে ক্রমে ওখানে খুব আড্ডা হোত। সন্ধ্যা বেলা খুকুদের বাড়ী যেতুম—ও গ্রামোফোন বাজালে একদিন। আমার জন্যে জরদার কৌটো এনে বল্লে—পারতি খাবেন? পারতি?

তারপর গত শনিবারে বনগাঁ থেকে চলে এলুম কলকাতা এবং সেইরাত্রেই ঘাটশীলা রওনা হই। ঘাটশীলার বাড়ীটা বেশ হয়েচে। কমল খুব যত্ন করলে। যেদিন সকালে গেলুম ঘাটশীলা—সেদিনই দুপুরের গাড়ীতে গালুডি গেলুন নীরদ বাবুদের বাড়ী। শ্যাম বাবুর সঙ্গে খেলুম আর বছর যে ঘরে জ্বর হয়ে পড়ে থাকতুম, সেই ঘরটা। চিত্ত বাবুর বাড়ীতে পার্টি হোল খুব। মেয়েরা যথেষ্ট যত্ন করে খাওয়ালেন, অটোগ্রাফ খাতায় সই করিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যার ছায়ায় কালাঝোর ও সিদ্ধেশ্বর ডুংরি গম্ভীর দেখাচ্ছে। পশুপতি বাবু ও কমল বেড়াতে এল আমার বাসায়। আমি রোজ সুবর্ণরেখার তীরের চারা শাল ও ভেঁদবনের মধ্যে রাঙামাটীর ওপর দুপুর রোদে চুপ করে বসে থাকতুম। এই বেড়ানোর আনন্দটা যেখানে নেই সেখানে আমার ভাল লাগে না। গালুডি আগে এমনি ছিল, আজ কাল সেখানে না আছে বন, না আছে নির্জ্জনতা

পশুপতি বাবু, তুটু ও আমি কমলদের বাড়ীর সামনের শালবনটাতে বসে অনেক গল্প করি। পেছনের শালবনেও গিয়েছিলুন—আমি একটা গাছে উঠে বসলুম—কমল হাসতে লাগলো। বৈকালে সুবর্ণরেখার তীরে একটা বড় শিলার ওপর সবাই মিলে গিয়ে বসলুম। দুটী মেয়ে বেড়াতে

গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে—একটি কোথাকার স্কুলের মাষ্টারনী, বেশ গান গাইলে।

পরদিন আবার গেলুম গালুডি। মহুলিয়ার হাট, সোমবার সেদিন। মহুলিয়ার হাট দেখতে গেলুম। নানা গ্রাম থেকে সাঁওতাল মেয়েরা সব জড় হয়েচে, মাথার চুলে ফুল গুঁজেচে, দিব্যি নিটোল কালো চেহারা, বেশ লাগে দেখতে। আমি মুক্ত শিলায় বসে বসে ভাবছিলুম অনেক দূরের একটি মেয়ের কথা। যখন শ্যাম বাবুর বাড়ীতে সেই কোণের ঘরটাতে বসে চা খাই, তখনও মনে হয়েচে অনেকদিন পরে কার্ত্তিক মাসে চূড়ামণি যোগের দিন ওদের বাড়ী গেলুম। যেখানে বন্যায় ছিল এক বুক জল—সেখানে এখন শুক্‌নো খটখটে। ও চা দিতে গিয়ে বলেছিল—এই কাপ্‌ না এই ভাঁড়?

অনেক রাত্রের গাড়ীতে নেমে ঘাটশিলা বাংলোতে একা আসচি। তারাভরা অন্ধকার আকাশ—শালবনের মাথায় বৃহস্পতি জ্বলচে। অনেক দূরে এক নদীর ধারের তেতলা বাড়ী ছিল একটা, বহুদিন আগের কথা। হয়তো এখন সেখানে কেউ থাকে না।···গৌরী! অনেকদিন পরে ওর কথা মনে এল।

ভাবলুম কাল আবার এই কাঁকর মাটী ছেড়ে বাড়ী যাবো। বনময় যে ফুলের সুগন্ধ ও শ্যামলীলতার ফুলের গন্ধ পাবো কল্‌কাতা এলুম—আমার সঙ্গে চন্দননগরের সেই মেয়ে দুটী। কাল যাব বনগাঁ। ভাবচি হাজারির বাড়ী যাবো। কালীপূজোর দিনটা। বেশ কাটলো পূজোর ছুটিটা। ওবেলা মাধব বলেচে রেকর্ড দেবে খুকুর জন্যে। ওর জন্যে কিছু টিপও নিতে হবে।

আবার এই ক'দিনের জন্যে দেশে গিয়েছিলুম। খুকু ওখানেই আছে। রোজই যেতুম ওর ওখানে। আসবার দিন অনেক কথা বল্লে। আজ মন্মথদের বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজোর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম প্রতি বৎসরের মত। সেখানে অরুণ বল্লে, এলাহাবাদে উষার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছিল—আমার নাম করেচে উষা। বনগাঁয়ে ভূপেনের সঙ্গে একদিন বিভূতি ও আমি রাজ-নগরের বটতলায় বেড়াতে গিয়েছিলুম।

ইতি মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেল—গত ডায়রী লেখবার পরে। বনগাঁর বাসা উঠিয়ে দিয়েচি—এখন ঘাটশীলাতেই আমার বাড়ী। সেখানে নুটু, বৌমা, খোকা, খুকী সকলেই রয়েচে। ষোড়শীবাবু বল্লে বনগাঁয়ে একজন আবগারী বিভাগের ইন্‌সপেক্টর এসেচেন—অতি ভদ্রলোক। ওঁর পরিবারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়ে গিয়েচে। কালু বলে সে বাড়ীর একটি ছেলে ঘাটশীলা যাবার সময় আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেচে।

সুপ্রভা এসেছিল। তার পত্র পেয়ে গত সপ্তাহে দেওঘর যাই। কি যত্নই করলে ও! জামার হাতাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল—কাছে বসে বসে সেলাই করলে, ওর সেবাযত্নের এ রকম কখনো পাওয়ার সুযোগ ঘটেনি জীবনে।

তারপর ওর কথা বড় মনে হচ্ছে। ক'দিনই মনে হচ্ছে। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওর কথা ভেবেচি। খুকুর সঙ্গে দেখা হয়নি সেই পূজোর ছুটীর পর থেকে—বোধ হয় আর দেখা হবেও না, কারণ বনগাঁর সঙ্গে আমার কোন যোগই তো আর রইল না!

এক মাসে আরও কি পরিবর্ত্তন। সুপ্রভাকে কি দুঃখই দিলুম। আজও

উৎকর্ণ

সে একখানা চিঠি পেয়েচে আমার। তার কথা সর্ব্বদাই মনে হচ্চে। শিলং একবার যেতে হবে গগির। গত সরস্বতী পূজোর দিন ঘাটশীলা গিয়ে তিনু, শান্তু, অমরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে উঠলুম সুবর্ণরেখা পার হয়ে।

ভোরে ডাকলে এসে হরবাবু। তারপর মোটরে আমরা অর্থাৎ বুদ্ধদেব, আমি, রমাপ্রসন্ন, তিনু, বাসু গেলুম বনগাঁ। অজিত বাবুর বাড়ী চা খাবার সময়ে S. D. O. ও মুন্সেফ এবং মনোজ বসু সেখানে। তারপর ঘেঁটুফুল ফোটার পথের মধ্যে দিয়ে আমরা বনগাঁ গেলুম। একবার মনে হোল যেন আমার বাসা আছে এখানে—জাহ্নবী রান্না করচে, স্নান করে গিয়েই খাবো।

বারাকপুর এলুম। পঞ্চবটীতলায় গাড়ী দাঁড়াইতেই ফণি কাকা, খাঁদু, হরিপদ দা এল। এদের দেখে কষ্ট হয়! কি সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই পড়ে রয়েচে। পূর্ণতর জীবন অনুভব করলে না। ফণি কাকা বল্লে—আজ গোপালনগরে বড় মারামারি হবে ভোট নিয়ে—দেখতে যাবে না? As if I care for votes! আমার বাড়ী গিয়ে ওরা বসলো—তারপর নদীর ধারে যেতে ওরা সব মায়ের কড়াখানা দেখলে। সত্য কি শুভক্ষণে কড়াখানা কেনা হয়েছিল! আজ কত বছর হয়ে গেল। কত লোক দেখে গেল ওখানা।

বনসিমতলায় ওরা বসলো, আমি ও রমাপ্রসন্ন বনের মধ্যে তুঁততলায় বসলুম। সুপ্রভার পত্রখানা পড়লুম—ইস্টারে শিলং যেতে লিখেচে যাতে। সত্যি, কি ভালো মেয়ে ও!

ভূষণ মাঝি ঘাটে নাইচে! স্নানের সময় সাঁতার দিয়ে ওপারে

গেলুম। তারপর এলুম বাড়ী, খুকুদের বাড়ীর মধ্যে গিয়ে একবার দাঁড়াই। কতবার এমনি ঘেঁটুফুল-ফোটা চৈত্র দিনে বনগাঁ থেকে দুপুর রোদে বারাকপুরে হেঁটে এসে ওকে ডেকেচি ওদের রান্নাঘরে গিয়ে—আজ কোথায় কে? সব শূন্য।

ইন্দু এসে গল্প করলে, আমাদের সঙ্গে নদীর ধার পর্য্যন্ত গেল। তারপর আমরা মোটরে গোপালনগরে এসে দুর্গা ময়রার দোকানে লুচি ভাজিয়ে খেলুম। আজ হাটবার, তবে ভোটের জন্যে অমৃত কাকা, চালকীর বিভূতি সবাই যাচ্ছে। হরিহর সিংহ তার দোকানে ডাকলে। মনে পড়লো গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাণ্ডারকোলা থেকে ফিরবার দিনে এর দোকানে বসেছিলাম। আর বসলুম এই।

তখনি বনগাঁ—সেখান থেকে বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ী। এই ছ'বছরের পথেও এই চৈত্র মাসে এই তিনটের সময় কত গিয়েচি! পাটবাড়ীতে কতক্ষণ বসে আবার বনগাঁ।

মন্মথ বাবুর বাড়ী সেই বিকেলে সেই রকম বসে সুপ্রভার গল্প বলি। সুপ্রভার প্রশংসা শতমুখে করেও আমি যেন ফুরোতে পারিনে।

পথে বীরেশ্বর বাবুর সঙ্গে দেখা রাণাঘাট গেটের কাছে—আমি ডাকলুম তিনি চাইলেন, কথা হোল না। মুন্সেফ সস্ত্রীক মোটরে ফিরে যাচ্চে—চেয়ে হাসলে।

সুপ্রভার পত্রখানা কাল রাত্রে লিখেছিলুম—বনগাঁ থেকে টিকিট কিনে সকালে পোস্ট করেচি ওবেলা।

কাল ইউনিভার্সিটি থেকে কাগজ আনবো। সেদিন ইউনিভার্সিটির মিটিং-এ অজয় ভটচার্য্যের সঙ্গে আলাপ হোল। প্রমথ, বিজয়, পরিমল,

গোপাল হালদার আমরা সব এক সঙ্গে বেরিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতে চা খাই। সেই দিনই রাত সাড়ে ন'টায় কমল-রাণীর নিমন্ত্রণে ওদের সঙ্গে 'বিশ বছর আগে' দেখে এলুম রঙ্‌মহলে। মন্মথ রায়ও একদিন 'কুম্‌কুম্' দেখবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েচে এই দেড় মাসের মধ্যে। সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে ইস্টারে শিলং গেলুম। সেখানে জর্জ্জিনা, সেবা প্রথমে এসে বল্লে সুপ্রভা ছুটিতে মিরালী চলে গিয়েচে। তারপর হাসতে হাসতে সুপ্রভা এল। ক'দিন খুব বেড়ানো গেল। ওখান থেকে চলে আসার কিছুদিন পরে ঘাটশীলা গেলুম—এবং সেখান থেকে এসে ঢাকা গেলুম রেডিওতে বক্তৃতা দিতে। রত্না দেবীর বাবার বাড়ী গিয়ে উঠলুম। বেশ কাটলো সেখানে। ইতিমধ্যে সুপ্রভার বিবাহ হয়ে গেল গত ১৫ই বৈশাখ। আমি গত শনিবারে সাহিত্য-বাসর উপলক্ষে মুন্সেফ বাবুর বাড়ীতে গেলুম। মায়া ও কল্যানী ছাড়লে না—ওদের বাড়ীতে রইলুম। রাত্রে ওদের ছাদে গল্প। পরদিন আমাদের পুরোনো বাসায় গেলুম। সেই জানালার ধারে দাঁড়াই। পাঁচী এসেচে, দেখা হোল।

আজ দেশ থেকে ফিরলুম। ঘাটশিলা যাবো, গ্রীষ্মের ছুটী প্রায় শেষ হয়ে গেল। খুকু বনগাঁয়ে এসেছিল অনেকদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা হোল দু'তিনদিনের জন্যে। কল্যাণী খুব সেবাযত্ন করেছিল। গ্রীষ্মের ছুটীটা এবার কি আনন্দেই কাটলো! রোজ নদীজলে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! বিশেষ করে একদিন অনেক রাত্রে বনগাঁ খুকুদের বাড়ী থেকে ফিরে। আর একদিন কুঠীর মাঠের আঘাটার পাশে নেমে।

সেই রকম আম কুড়ুচ্চে পাগলার মা, হাজারী আজও দেখে এসেচি। এখনও খুব আম। এবার আদৌ বৃষ্টি হয়নি। আজ আষাঢ় মাস দেশের পথে সর্ব্বত্র ধুলো, খানা-ডোবা সব শুকনো, ভীষণ গরম, এমন কখনো দেখিনি। সুপ্রভা লুকিয়ে পত্র লিখেছিল, বেলেডাঙ্গার আইনদ্দির বাড়ীর পিছনে বসে তা পড়েছিলুম—আর চিঠি লিখেছিল জর্জ্জিনা। কাল ন'দি চলে গেল গোপালনগর স্টেশনে কলকাতার গাড়ীতে, খুকুর সঙ্গে ওরা যাবে মানকুণ্ডু। কাল খুকুও চলে গেল বনগাঁ থেকে। পরশু সাব্‌ডেপুটি অজিত বসু, মুন্সেফ্‌ হরিবাবু, সবাই গিয়েছিলেন আমার বাড়ীতে। আমাদের ভিটেতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখলে। তেঁতুল গাছের ওপর আমায় বসিয়ে ফটো নিলে। বাবার স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল।

কাল সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকে বেলেডাঙ্গা থেকে বেড়িয়ে আসবার পর কুঠীর মাঠের আঘাটায় স্নান করে ফিরচি, আমাদের বাড়ীর পেছনের বাঁশবনে কোথাও জ্যোৎস্না, কোথাও জোনাকীর ঝাঁক জ্বলচে—থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। এক অদৃষ্ট অনুভূতি! আবার যেন আমি বালক হয়ে গিয়েচি, এইমাত্র ভরতদের সঙ্গে সলতেখালি আমতলাটার ময়না গাছের ধারে আম কুড়িয়ে ফিরচি—সারা গাঁ আমার শৈশবের পরিবেশ অনুযায়ী বদলেচে—জেঠাই মা, সই মা, হরি কাকা—সেই সময়ের মনোভাব—সংকীর্ণতা, দারিদ্র্য, অথচ কি মহার্ঘ আনন্দ···তা বর্ণনা করা যায় না—সে এক জগৎ—যেমন এবার আমি বিলবিলের ধারে বসে বসে কত মেয়েদের জলে ওঠা নামা করতে দেখতুম, ওরা কাপড় কাচচে, বাসন মাজচে, পরস্পরের সঙ্গে গল্প করচে—ওদের এই এক জগৎ···the little pool in the woods—বেশ নামটী দিয়েচি ওই বিলবিলের

উৎকর্ণ

ডোবাটার। ও নিয়ে একটা গল্প লিখবো। এরা এই ক্ষুদ্র জগতে সবাই কিন্তু যথেষ্ট সন্তুষ্ট আছে—এর বেশী এরা চায়ও না, বোঝেও না কিন্তু। পাগলার মা আম কুড়িয়ে সন্তুষ্ট, নেলির মা থালা থালা আমসত্ব দিয়ে সন্তুষ্ট, হরিপদ দা গাঁয়ের মোড়লী করে সন্তুষ্ট। এর বেশী এরা কিছু চায় না।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গেল। কাল ঘাটশিলা থেকে ফিরেচি। সঙ্গে ছিল হরিবোলার ছেলে মাদার। ও ফিরে গেল দেশে। ঘাটশিলায় বড় গরম পড়েছিল, দুদিন কেবল বৃষ্টি হয়েছিল। রোজ বিকেলে বেড়াতে যেতুম গালুডি রোডে সেই শাল বনটার মধ্যে, সেখান থেকে বনমাটির পথ যেখান দিয়ে পার হয়ে গেল সেই উঁচু জায়গায়। দূরের দিকচক্রবালে নীল শৈলশ্রেণী মুক্ত ভূপৃষ্ঠের আভাস এনে মনকে বন্ধনশূন্য করে দিত অপরাহ্ণের ছায়াভরা আকাশতলে, সেখানে বসে বসে সুপ্রভার চিঠি, খুকুর চিঠি পড়তুম। কোথায় রায়গড়, কোথায় মিরালী, সে এখন হয়তো এই বিকেলে বসে চুল বাঁধচে, এমনি সব কত ছবি মনে পড়তো। একদিন খুব ঝড়বৃষ্টি এল, রাস্তার ধারের ছোট্ট সাঁকোর মধ্যে ঢুকে অতি কষ্টে বৃষ্টির ধারা থেকে নিজেকে রক্ষা করি।

পরশু বসে ছিলুম কত রাত পর্য্যন্ত ফুলডুংরি পাহাড়ের নীচে। একে একে দুটী একটি করে কত তারা উঠলো অন্ধকার আকাশে—আমি যেন বিরহী তরুণ দেবতা, সুগাস্তের পর্ব্বত শিখরে বসে কত জন্মের প্রণয়িনীর কথা ভাবচি!

কোথায় এক ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরে বনসিমতলার ঘাট, সেখানে যে বালিকা ছিল, সে আর সেভাবে কখনো ও ঘাটে থাকবে না—কত বছর চলে যাবে, বালিকার দেহে নামবে জরা, কতকাল পরে বৃদ্ধা যখন

একাএকা ঘটি হাতে ঘাটের পাড় বেয়ে উঠবে, তখন সে কি ভাববে না তার অতীত কৈশোরের কথা—কত প্রণয় লীলার স্থান—বনসিমতলার ঘাটটার কথা ?

গৌরীর কথা মনে হোল। অনেক দূরে আর এক গ্রাম্য নদী, তার ধারে একটা দোতলা বাড়ী—কতকাল আগে সেখানে যে মেয়েটী ছিল, তার দেহের নশ্বর রেণু হয়তো ওই নদী তীরের মৃত্তিকাতেই মিশিয়ে আছে এই কুড়ি বছর। সে জীবনে কিছুই পায়নি—সে বঞ্চিতার কথা আজ এই সন্ধ্যায় বিশেষ করে মনে এল।

আর এক বঞ্চিতা হতভাগী—মিনতি। ওকে কখনো চোখে দেখেনি, কিন্তু ওর নাম শুনেচি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ওর দুঃখ দূর হোক।

কিন্তু সুপ্রভার দুঃখ কে দূর করবে? তার মন তো সাধারণ মেয়ের মন নয়—সে যে চিরজীবন কাঁদবে, তার কি উপায় করবো? ওর জন্যে মন যে কি ব্যাকুল হয়েচে আজ ক'দিনই। নির্জ্জনে বসলেই ওর কথা সারা মন জুড়ে থাকে। ওর সঙ্গে দেখা করাই চাই, মন বড় ব্যাকুল হয়েচে দেখবার জন্যে।

কাল বনগাঁ থেকে এলাম। অজিত বাবুর বদলি উপলক্ষ্যে সাহিত্য-সভা ছিল। অজিত বাবু লিখেছিলেন, য় পার সময়ে আসবেন। ক'দিন বেশ কাটলো। এবার ওদের পাড়াশুদ্ধ সকলে ডেকে ডেকে আনন্দ করলে, গল্প করলে। সুনীতি দিদি, শুকুর মা সবাই। বাস্তবিক মেয়েরা কি ভালো তাই ভাবি! ওদের মধ্যে খারাপও আছে জানি, নিজেই তার অনেক পরিচয় অনেক জায়গায় পাইনি কি আর? কিন্তু ভাল যখন

হয় ওরা তখন তার তুলনা পুরুষদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। গৌরী, সুপ্রভা, খুকু, কল্যাণী, অন্নপূর্ণা—এদের প্রত্যেককে আমি জেনেচি—এরা দেবীর মত।

কি যত্ন আদর করতো সুপ্রভা! তার কথা আজকাল সর্ব্বদা মনে আছে। ভোলা কি যায়? না তা সম্ভব! এই তো জীবন!

কল্যাণী ছোট মেয়ে অবিশ্যি। কিন্তু সে এরই মধ্যে মেয়েদের স্বাভাবিক সেবাপ্রবৃত্তি আয়ত্ত করে নিয়েছে। ক'দিন বড় যত্ন করলে। বাইরের ঘরটাতে টেবিল ঢাকা পেতে, পরিপাটি করে পান সেজে বিছানা করে কেমন করে রাখতো! কাছে বসে গল্প শুনতে চাইত। একদিন হঠাৎ 'চম্পক জাগো জাগো', গানটার এক কলি গাইতেই আমার শিলং-এর কথা মনে পড়লো। সেই ইস্টারের ছুটি, শিলং, কলেজের হোস্টেলে আমায় নিমন্ত্রণ করেচে—সুপ্রভার অসুখ, তবুও সে উঠে এল, আমি আমার রেডিওর নাটকটা পড়বো—জর্জ্জিনা ঘন বন ঘরে ঢুকচে, ব্লার হচ্চে—এমন সময় ওরা গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপালে, আমার মনের মধ্যে সত্যি কি যেন হয়ে গিয়েছিল গানের প্রথম কলিটা শুনেই—'চম্পক জাগো জাগো'। কল্যাণীকে বল্লুম—গানটা শোনাও না। গানটা সে গাইলে। আমি বসে বসে বহুদূরের কোন্ পাইনবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম। সুপ্রভা—পাইনবন, লুম্ শিলং-এর মেঘাবৃত শিখরদেশ।

কল্যাণী ছেলে মানুষ কিনা, বলচে—আপনি চলে গেলে আমি বিছানা বাইরের ঘর থেকে উঠিয়ে ফেলবো। মন কেমন করে, আপনার জায়গায় সেবার ছোট মামাকেও শুতে দিইনি—বলি, ছোট মামা ওঠ, অন্য জায়গায় গিয়ে শোও—এসব আমি ভুলবো। এই সময় গৌরীকে

উৎকর্ণ

এনেছিলুম বারাকপুরে ১৯১৮ সালে। কতকাল আগে? সেই বাঁশ-বাগানে নিভৃত সন্ধ্যা নামতো, বর্ষার দিনে দিনে টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়তো, বেশ মনে আছে। 'বানের জলে দেশ ভেসেচে রাখাল ছেলে তুই কোথা, গানটা করতুম ইছামতী থেকে স্নান করে উঠে সকালে।

সময়ের দীর্ঘ বীথিপথ বেয়ে কত এল কত গেল! গৌরী···১৯১৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষে তাকে নিয়ে এলুম বারাকপুর। রজনী মামার সঙ্গে বসে তাসখেলা হরিপদ দাসের চণ্ডীমণ্ডপে। "বানের জলে দেশ ভেসেচে রাখাল ছেলে তুই কোথা, রাঘব বোয়াল মাছের সাথে সুখ দুঃখের কই কথা"—এই গানটা ছিল দিনরাত আমার মুখে। আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে সকাল বেলা বর্ষা স্নান ঝোপ ঝাপের পাশ দিয়ে আসতে (যে ঝোপ থেকে এ বছর সুপ্রভার চিঠির জন্যে কত বন মল্লিকা তুলেছি এবং যে ঘাটটার নাম অনেক দিন পরে হয়েছিল বনসিমতলার ঘাট) ওই গানটা গাইতুম।

তারপর সে-সব দিন চলে গেল। অনেক মাস কেটে গেল। তারপর আবার বহু লোকের ভিড় গেল লেগে।

কত লোক এল। তাদের কথা মনে হয় আজ। এসেচে, কিন্তু ওদের মধ্যে চলে যায় নি কেউ—আছে সবাই। অন্নপূর্ণা আছে, সুপ্রভা আছে, খুকু আছে। অদ্ভুতভাবে এরা সব এসেছিল। যায়নি কেউই। মন থেকে নয়, বার থেকেও নয়।

১৯৩০ সালে তাই আজ ১৯১৮ সালের কথা ভাবচি। আজ সুপ্রভার পত্র পেলাম। কত ভাল মেয়ে সে, আজও মনে রেখেচে। আর বছরে এ সময়ে মনে বড় কষ্ট ছিল।

উৎকর্ণ

জীবনের মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি হর্ষোজ্জ্বল, হাসি অশ্রু ছলছল দিন আসে, যাদের কথা চিরকাল মনে তো থাকেই এমন কি একটু নির্জ্জনে একমনে ভাবলে সেদিনের অনুভূতিগুলো পর্য্যন্ত এখনি আবার মনে আসে—অতি সুস্পষ্টভাবে মনে আসে, যেমন সেদিনের বিস্মৃত গন্ধরাজি আবার আঘ্রাণ করি, আবার সে সব দিনের জীবনের কুশীলবদের চোখের সামনে দেখতে পাই।

এই রকম দিন আমার জীবনে যেগুলি এসেচে—তা চিন্তা করে দেখলুম কাল বসে। গোলমালে ওদের কথা মনে না থাকলেও দু'দশ বছর অন্তর মনে আসে হঠাৎ। সে সব দিনের আর একটা মজা আছে, তারা মস্ত বড় আশার বাণী, অজানার আনন্দ নিয়ে আসে—একটা কিছু যেন ঘটবে, দিনগুলি বৃথায় যাবে না—একটা এমন কিছু ঘটবে, যা জীবনে কখনো ঘটে নি—মনে হয়।

তারপর দেখা যায় কিছুই ঘটলো না—দিনগুলো চলে গেল, কিন্তু আনন্দ রেখে গেল, স্মৃতি রেখে গেল।

যেমন প্রথম যাত্রার দল আমাদের গাঁয়ে এসেছিল আমার বাল্যকালে, নলে নাপিতের বাড়ী সন্ধ্যাবেলায় আমায় বলেছিল 'তুমি যাবে খোকা?' সেই সন্ধ্যা, সেই সুশ্রী যাত্রাদলের নটের দল—সে কথা জীবনে আর কখনো ভুললাম না। ভুললাম না মানে ভুলেই তো থাকি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একমনে বসে ভাবলেই আবার মনে হয়।...

সুরেনের যখন পৈতে হয়, শুধু নামা থাকতো, আমি দণ্ডীঘরে গিয়ে সন্ধ্যাসেবা করাতুম—সেই একদিন। যুগল কাকাদের বাড়ীতে বাল্যে এমন ক'দিন কেটেচে বেশ মনে হয়—সুবাসিনীর সামনে যখন আমি অকারণে ছুটোছুটি করে বেড়াতুম বাল্যে, বকুলতলায়

খেলা করতুম নাগপঞ্চমীর দিন, ভরত ও আমি মনসাতলায় গিয়েছিলুম।

তারপর বহুকাল কেটে গেল। আর তেমন কোনো দিনের কথা আমার মনে হয় না। এল গৌরী, ওকে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে প্রথম যখন বারাকপুরে আনলুম, আষাঢ় ও প্রথম শ্রাবণের সেই দিনগুলির কথা···রজনীকাকার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে সেই অধীর ভাবে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে বাঁশবনে, মাটির প্রদীপের আলোয় আমি ও গৌরী, তখন সে মাত্র চোদ্দ বছরের বালিকা—এই ছবিটী, এই দিনের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি চিরদিন, চিরদিন মনে থাকবে।

সে গেল চলে। দিনগুলি নিরানন্দময় হয়ে গেল, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। প্রহরগুলি মৃত।

আনন্দ পেলাম চাটগাঁ মণিদের বাড়ী গিয়ে। মণির সঙ্গে বসে গল্প করতুম, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম, ওই দিনগুলি।

ওখান থেকে গিয়ে এসে বিভূতীদের বাড়ী এলাম। ও দিনগুলোর মধ্যে আমার মনে আছে, আমার জ্বর হোল, কামাই করলাম দিনকতক, গেলাম না—বিভূতিকে ফোন করলাম, ঐ একদিন।

ভাগলপুরে এমন অনেকদিন গিয়েচে ইসমাইলপুর দিয়ারায়। পুরোনো কথা ভাবতাম শ্রাবণ মাসে রাসের সময় বড় বাসায় বসে, রঘুনাথ বাবুর ঠাকুর বাড়ীতে হেমেন রায় এসে নিয়ে গেল, আমি Keith-এর প্রাচীন দিনের মানুষ সম্বন্ধে বইখানা পড়তুম—কিংবা আমি Astronomy পড়তুম ভাদ্রমাসে বাইরের ঘরে শুয়ে, বীরভূমের সেই পণ্ডিতটা এসে গল্প করতো—সেই সব দিন ভারি চমৎকার কেটেচে।

উৎকর্ণ

একখানা বই হয় এ সব দিনের আনন্দের কথা লিখলে—নতুন টেক্‌নিকে, নতুন ভাবে লিখতে হয়—একখানা ভাল উপন্যাস হয়।

তারপর এল খুকু। তার সাহচর্য্যে যে দিন কেটেচে—তার মধ্যে যখন আমি 'আইভ্যানহো' অনুবাদ করছিলুম, শিউলি গাছে ফুল ফুটতো—সেইদিনগুলি আর বনগাঁয়ে ছাদে বেড়ানোর দিনটী, আর গত বছর গ্রীষ্মের ছুটীতে বারাকপুরে গ্রামোফোন্ নিয়ে কাটানোর দিনগুলির কথা ভুললে চলবে না। চিরকাল মনে থাকবে এগুলিও।

সুপ্রভার সঙ্গেও এমন অনেকদিন আনন্দে কেটেচে। বিশেষ করে এবার দেওঘরে ও ইস্টারের ছুটিতে শিলংএ বেড়াতে যাওয়ার দিনগুলি। অনেক দিনের কথা হয়তো ভুলে যাবো—কিন্তু শিলংএ যাপিত গত ইস্টারের ছুটির দিনগুলোর কথা চিরদিন মনে থাকবে।

আর সর্ব্বশেষে এবার যে অজিতবাবু বনগাঁ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন—কল্যাণীদের বাড়ী রইলাম আমি—কল্যাণীর সেবাযত্ন আমার বড় ভাল লেগেছে, সুপ্রভা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের মধ্যে এ ধরণের সেবা করার প্রবৃত্তি দেখিনি আমি। কল্যাণী যখন শচীন বাবুদের বাড়ীর সামনে পুকুর ঘাটে বসে রইল—সে কথাই আমার মনে পড়ে এখনও।

এই তো সেদিন। আর এক সপ্তাহ পুরলো। এই দিনটী আবার কত কাল আগেকার বলে মনে হবে একদিন। তখন এইদিনের ডায়েরিটা পড়ে অবাক হয়ে ভাববো সেইদিনের সুপ্রভা, সেদিনের কল্যাণী, সেদিনের খুকু—কতকালের হয়ে গেছে!

বাসা বদলে বহুবছর পরে আবার ৪১, মৃজাপুর ষ্ট্রীটের এ দিকটাতে এলুম। অনেকদিন আগে এদিকটাতেই ছিলাম আবার—সেদিকেই এলুম।

উৎকর্ণ

মন কেমন বড় খারাপ হয়ে গেল বিকেলে, অনেকে পুরোণো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত পুরোণো কথা সব মনে পড়লো। বাবার জন্যে মন যেন কেমন করে উঠলো, আর করে উঠলো সুপ্রভার জন্যে। বারবেলা ক্লাবে যাবার আগে এই কথা কতবার মনে হোল, সুপ্রভা আজ এতক্ষণ আমার চিঠি পেয়েছে।

বনগাঁ থেকে আজই এলুম। এই শ্রাবণ মাস, আজ ১লা, মটরলতা দোলানো খয়রামারির মাঠের সেই ঝোপটায় অন্য অন্য বছরের মত কালও বেড়াতে গেলুম। এ বছর সব বদলে গিয়েচে। সুপ্রভা নেই, খুকু নেই, জাহ্নবী নেই, বনগাঁর বাসা নেই, ৪১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটের সে মেস নেই।

নাগপঞ্চমীর ছুটিতে সেই শ্রাবণ মাসে বারাকপুর যাওয়া, খুকুদের দাওয়ায় বসে নলে নাপিতের ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়া, খুকুর কত কথাবার্ত্তা—The apple tree, the singing and the gold!" —কোথায় কি চলে গিয়েচে!

এবারও কল্যাণী বড় আনন্দ দিয়েচে। দেখ, অদৃষ্টে কি অদ্ভুত যোগাযোগ, এ স্নেহশীলা মেয়েটী আবার কোথা থেকে এসে জুটলো বলতো? কোথায় ছিল ও আরবছর এমন সময়? অথচ এ বছর ওদের বাড়ীর সঙ্গে কেমন একটা আত্মীয়তা হয়ে গিয়েচে—যেন কত কালের আলাপ! আমি কলকাতায় আসি না আসি তাতে কল্যাণীর কি? অথচ সে আমায় আসতে দেবে না। এই মধুর শাসনটুকু করতো সুপ্রভা, করতো খুকু—আবার এ এল কোথা থেকে কে বলবে!

কাল (২৯শে জুলাই) আবার বনগাঁ থেকে এলুম। এবারও ওদের ওখানেই ছিলুম গিয়ে। কল্যাণীর যত্ন সমানই। কাল কিছুতেই আসতে

দেবে না কলকাতায়—সোমবার থাকবো, মঙ্গলবার থাকতে হবে। বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবার যো নেই—মন্মথ দা কিংবা মুন্সেফের বাড়ী গিয়ে যে একটু গল্প করবো, তাতে ঘোর আপত্তি ওঠাবে।

—গা ছুঁয়ে ব'লে যান ঠিক সাতটার সময় আসবেন? যদি না আসেন তবে আমি কিন্তু মরে যাবো—তাতেই বা কি! আমি মরে গেলে জগতের কার কি ক্ষতি?

মুন্সেফ্ বাবুর বাড়ী গিয়ে ত্ববেলা আড্ডা দিই। বাণিয়ার সম্বন্ধে অনেক রকম কথা হোল।

আবার ১১ই আগষ্ট বনগাঁ থেকে এলুম। বেলুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ ছিল তা ছাড়া ছিল মাসিক সাহিত্য-বাসর। মায়াও ছিল এবার, গল্পে গুজবে বেশ সময় কাটলো। নদীতে ঘোলা এসেচে, এদিন যখন স্নান করতে গেলুম, তখন জল খুব ঘোলা।

কল্যাণীর আসবার কথা বলে এলুম কলকাতায়।

কাল শনিবার বারাকপুরে গিয়েছিলুম। আর বছর তো সারা বর্ষাকাল ও শরৎকাল দেশে যাইনি। গোপালনগরের বাজারে প্রথমেই গুটকের সঙ্গে দেখা। শ্যামাচরণ দাদা দেখি বাজারে আসচে, তার মুখে শুনলুম কালী এসেচে। ভাদ্র মাসের বৈকাল, শুকনো পথ ঘাট, বৃষ্টি নেই এবার, আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। বাড়ী গিয়ে দেখি গো বোষ্টম আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েচে। আমি ইছামতীর ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলাম, ঘোলা জল ঘাসভরা মাঠ ছুঁয়েচে। ওপারের মাঠে ঘাঁড়া ঝোপে সন্ধ্যার ছায়া নামলো, আকাশে কত রকম রঙীণ রঙের খেলা দেখা গেল, আমি জলে নেমে স্নান করলাম।

উৎকর্ণ

আমাদের বাড়ীর পেছনে বাঁশবনে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে—পাকা তালের গন্ধ পাওয়া যাচ্চে শ্যামাচরণ দাদাদের বাগান থেকে। একটা তাল পড়ার শব্দ পেলুম। বাড়ী এসে খানিকটা বসে আছি, মনে হচ্ছে খুকু যেন এবার এল বিলবিলের ধারের পথটা দিয়ে। এবার ওদিকে বড় বন। সন্ধ্যার পরে খুব জ্যোৎস্না উঠলো। এমন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না শুধু কোজাগরী পূর্ণিমার কথা মনে এনে দেয়, আর মনে আনে খুকুর কথা, ন'দিদিদের বাড়ী থেকে এসে আমার উঠোনে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে গল্প করতো। কালী এসেচে, ওদের বাড়ী কতক্ষণ কালীর সঙ্গে, সুপ্রভার সঙ্গে গল্প করলুম। সুপ্রভার বিষয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করলো।

আজ রবিবার সকালে কালী ও আমি প্রথমে গিয়ে বসলুম বাঁওড়ের ধারে ছুতোর ঘাটার বটতলায়। কলকাতা থেকে অনেকদিন পরে গ্রামে গিয়ে বনঝোপ দেখে বাঁচলাম। এ সব না দেখে আমি থাকতে পারিনে—সকালের বাতাসে নাটাকাঁটা ফুলের সুগন্ধ, বনটিয়া ডাকচে, কলামোচা পাখী ঝোপের মাথায় খেলা করচে। সইমা যাচ্চেন নাইতে, আমায় বল্লেন—কবে এলে বিভূতি? তাঁর সঙ্গে গল্প হোল খানিকক্ষণ। তারপর আমি আর কালী বেলেডাঙা হয়ে মরগাঙের ধারে বাবলা তলায় কতক্ষণ বসলুম, কালী খোঙা কুড়লে, কুঠীর মাঠের জলার ধারে একটা নিবিড় ঝোপে দুজনে বসলুম। আর সব জায়গাতেই সুপ্রভার পত্রখানা পড়চি—একবার, দুবার কতবার যে পড়া হোল! দুজনে আবার আমাদের ঘাটে নাইতে এলুম, কালী সিট্‌কি জালে চিংড়ি মাছের বাচ্চা ধরলে। আমি যখন রোয়াকে বসে থাকি, তখন যেন আবার মনে হোল খুকু আসচে ...এখুনি তেলাকুচো ঝোপের আড়ালে গিয়ে শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে সে আসবে...

উৎকণ

ঘুমিয়ে উঠে বিকেলে কালীর বাড়ী গেলুম। ওরা হাটে গেল, আমি আমাদের ঘাটে এসে বসলুম—ওখান থেকে নৌকো করে কুঠীর মাঠে এসে ঘাসের ওপর বনসিম ঝোপের ছায়ায় বসে সুপ্রভার পত্রখানা আবার পড়ি। সুপ্রভা কোথায় কতদূরে আজ!

কল্যাণী···ওর কথাও মনে হয়। এরা সব চলে গেল, তাই ভগবান যেন এই স্নেহময়ী মেয়েটীকে পাঠিয়ে দিয়েচেন। আবার দু' শনিবার পরে তবে ওর সঙ্গে দেখা হবে। জন্মাষ্টমীর ছুটীতে ঘাটশিলা যাবো। সুপ্রভাকে লিখেচি সেদিন সেখানে পত্র দিতে।

সন্ধ্যার ট্রেণে চলে আসবো। হাট থেকে বৃদ্ধ মুসলমানেরা ফিরচে আমাদের গাঁয়ে। কারো মাথায় ধামা, কারো মাথায় ঝুড়ি। সবাই জিগ্যেস করে—বাবু কবে আলেন? আরামডাঙার আবদুল, হুটুর সয়া—সবাই। গোপালনগর স্টেশনে অনেকক্ষণ বসলুম। কত নক্ষত্র উঠেচে—আজ সারাদিন পরিপূর্ণ শরতের রৌদ্র। বনগাঁয়ের কাছে ট্রেণ আসতেই কল্যাণীর কথা মনে হোল। একবার মনে হোল নেমে ওর সঙ্গে দেখা করে কাল সকালের ট্রেণে যাবো। মেসে এসে সেবার পত্র পেলুম।

এবার ভাল লেগেচে বাঁওড়ের ধারের বটতলায় বসা, কুঠীর মাঠে ছায়াস্নিগ্ধ ঝোপটী, মরগাঙের পাঁতা, এবেলায় বনসিম ঝোপের ছায়ায় ঘাসের মাঠে বসা, সুপ্রভার চিঠি পড়া, কল্যাণী ও খুকুর চিন্তা। আর কালকার রাত্রের সেই ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কাল কত রাত পর্য্যন্ত চড়কতলার মাঠে ছিলাম, ফণি কাকা, গজন, কালো পাঁচু, ফকিরচাঁদ সবাই গল্প করলুম। কাল রাত্রে জেলে পাড়ায় কৃষ্ণ-যাত্রা হবার কথা ছিল, সকলে জিগ্যেস করচে—কখন বসবে যাত্রা? ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্র আমোদ

প্রমোদ। খুব রাত্রে নাকি যাত্রা হয়েছিল—দেখতে পেলে না বলে আজ সকালে পিসিমা ও ন'দিদির কি দুঃখু!

খুকুর স্মৃতি সারা বারাকপুরকে, তার মাঠ, ঘাট, নদীর তীর সব আচ্ছন্ন করে রেখেচে—এবার গিয়ে বুঝলুম। নদীর ধারে সুপ্রভার, কারণ চিরকাল নদীর ধারে বসে সুপ্রভার পত্র পড়া আমার অভ্যাস।

অনেকদিন পরে ভাদ্র মাসে বাড়ী গিয়েছিলুম। ভারি আনন্দ নিয়ে ফিরলুম। কালী এসেচে, তাই আরও আনন্দ। সুপ্রভার অমন সুন্দর পত্রখানা যে আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিলে। যে পৃথিবীতে সুপ্রভা আছে, সেখানে আমার ভাবনা কি? তারপর কল্যাণী যেখানে আছে, সেখানেই বা ভাবনা কি?

আমি যেটাকে মটরলতা বলতুম, কাল বেলেডাঙা যেতে বটতলার পথে কালী ওটাকে বল্লে—বড় গোয়ালে লতা। কিন্তু বড় গোয়ালের লতার ফল হয় সাদা, আর এক রকমের লতা আছে খাঁজকাটা আঙুরের পাতার মত দেখতে, আঙুরের মতই থোলো বাঁধে।

আমাদের বাড়ীর পেছনে বাঁশ বাগানটার পথে কাল বিকেলে ঘুম ভেঙে উঠে যাচ্চি, তখন মনে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি হোল। যেন কি সব শেষ হয়ে গেছে কি যাচ্চে, এই ধরণের একটা উদাস মনোভাব। প্রতিবারই এই স্থানটী আমাদের মনে অদ্ভুত ভাব জাগায়। বঙ্গবাসীর কথা, বাবার কথা, চীন ভ্রমণের কথা, কত কি মনে আনে। দরিদ্র সংসারে তালের বড়া খাওয়ার দিন সে কি উৎসব···সেও এই ভাদ্রমাসে। পিসিমা কাল তালের বড়া খাইয়েছিলেন কিন্তু।

১৯৩৭ সালেও ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীতে বাড়ী গিয়েছিলুম, তখনও খুকু গ্রামে ছিল না।

উৎকর্ণ

আমাদের গ্রামের ক্ষুদ্র জগৎটাতে ওরা বেশ আছে, কৃষ্ণ যাত্রা শুনচে, দলাদলি করচে, গোপালনগরের হাট করচে, নদীতে ছিপ নিয়ে মাছ ধরচে, চড়কতলায় বসে রাত্রে আড্ডা দিচ্চে—বেশ আছে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে ঘাটশিলার বাড়ীতে এসেচি। বাড়ী এসেই সুপ্রভার চিঠি পেলাম। কি ভাল মেয়ে ও, তাই ভাবি। Always a loyal friend—ভারি আনন্দ হয়েচে ওর চিঠি পেয়ে। পরদিন সকালে উঠে কমল-দের বাড়ী গেলুম—কমল মাছের সিঙাড়া ও চা খাওয়ালে। বৈকালে বাঁধের পেছনে শালবনে দিব্যি সবুজ ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ঘাসের ফুল ফুটেচে সাদা সাদা—রোদ রাঙা হয়ে আসচে, মিষ্টি শরতের রোদ—মনে পড়লো সুপ্রভার কথা···কতদূরে···আছে শিলংএ, কি করচে এখন তাই ভাবি। সুবর্ণরেখার ওপরকার পাহাড় শ্রেণী বড় চমৎকার দেখাচ্চে। আর মনে হোল খুকুর কথা, কল্যাণীর কথা। যাদের যাদের ভালবাসি, এ অপূর্ব্ব অপরাহ্নে সকলের কথাই মনে পড়ে।

রাত্রে ভট্চাজ সাহেবের বাড়ী সভা হোল—বৌমা, উমা ওরাও গেল। অনেক রাত্রে আবার মোটরেই ফিরে এলুম।

গত রবিবারে ঠিক এই বৈকাল বেলা বারাকপুরে—নদীর ধারে বন-সিমলতার ছোপের ছায়ায় বসে সুপ্রভার চিঠি পড়চি, কালীও এসেচে অনেকদিন পরে—ওর সঙ্গে গল্প করচি—সে কথা মনে পড়লো। পরদিন সকালে উঠে আমি বাসাডেরা ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানীর পথটা দিয়ে ফুল-ডুংরির পেছন দিয়ে দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে চললুম। মেঘান্ধকার সকাল, সজল হাওয়া বইচে, দু'ধারের বন সবুজ হয়ে উঠেচে বর্ষার, পাথর-গুলো কালো দেখাচ্চে গাছপালার তলায়। সেবার যেখানে ভিক্টোরিয়া

দত্ত, আমি, নীরদ বাবু, স্বর্ণ দেবী চা খেয়েছিলুম, সেই উঁচু পাহাড়ের কাটিংটা দিয়ে বড় বড় গাছের তলা দিয়ে সোজা চললুম—দুধারে কি নিবিড় বন, পাথরের স্তূপ ছড়ানো, বড় একটা বটগাছ। এটা যেখানে নীচু হয়ে গেল, তার বাঁ দিকে একটা নিবিড় কুঞ্জবন ও লতাবিতান—বসবার ইচ্ছে থাকলেও বসতে পারলুম না, বেলা হয়ে গেল। একটা পাহাড়ী ঝর্ণা পার হয়ে (দুধারে কি শোভা সেখানে!) ওপারে গেলুম। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা সুঁড়ি পথ ধরে কিছুদূর গিয়েই দেখি সেই ঝর্ণাটা রাস্তা আটকেচে। আর না গিয়ে সেই ঝর্ণার ধারে যেখান দিয়ে খুব তোড়ে জলটা বইচে কুলু কুলু শব্দে—সেখানে জলে পা ডুবিয়ে বসে রইলুম। সুপ্রভার ও কল্যাণীর চিঠি দুখানা সেই ঘন বনের মধ্যে ঝর্ণার ধারে জনহীন আরণ্য প্রকৃতির নীরবতার মধ্যে বসে কতবার পড়ি। হাতীর ভয় করছিল বড়। এ সময় বুনো হাতীর সময়।

বৃষ্টি এল। একটা পথিক লোক কাছে এসে বসলো। ও বল্লে—এখানে হাতীর ভয় নেই—তবে সকাল সকাল চলে যান বাবু।

কুরুডির পথ দিয়ে ঘুরে আবার সেই ঝর্ণাটা পার হয়ে চলে এলুম। একটা ছোট ফর্সা মেয়ে কপালে সিঁদুর দিয়েচে—আমি যেমন বললুম, "তোর নাম কি খুকি?" অমনি ছুটে পালালো।

আমি কত কি গাছপালার মধ্যে দিয়ে গ্রাম পার হয়ে এসে ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানীর পথটা ধরলুম। বড় বৃষ্টি পড়চে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ ঘুরে ঘুরে উড়চে পাহাড়ের চূড়ায় নীল বনরেখাকে বেষ্টন করে। বেলা দুটোর সময় ঘাটশিলায় পৌছলুম—বৌমা ভাত নিয়ে বসে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি বাঁধের জলে স্নান সেরে এসে খেয়ে সকলকে উদ্ধার করলুম।

দুপুরে খুব ঘুমুই। তুলসীবাবু মোটর নিয়ে এসে ফিরে গেল। রাত্রে

দ্বিজুবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ। অমরবাবু ও বাসার চাকর বিনোদ রাত ১২টায় ন্যাগপুর প্যাসেঞ্জারে উঠিয়ে দিয়ে গেল।

অনেককাল আগে এই সময় আমি আজমাবাদের কাছারীতে ছিলুম ভাগলপুরে।

জন্মাষ্টমীর ঠিক তেমনি মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অনেক বছর আগে বারাকপুরের বাড়ীতে যে রকম ছিল ১২ই ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন। মণি চালে প্রদীপ দেখাচ্ছিল, গৌরী আমায় বললে—এসো, এসো, ও কিছু না—কোথায় আজ ওরা সব?

আজ ১১ই ভাদ্র। কতকাল আগে এমনি বেলাটিতে আমি কত আগ্রহের সঙ্গে বাড়ী গিয়েছিলুম সে কথা মনে পড়লো। আবার এই সময়ে এমন বর্ষার দিনে আমি আজমাবাদ কাছারীতেও ছিলুম। এ সময় আমি এক পয়সার খড়িমাটি কিনে কত আগ্রহ নিয়ে ট্রেণে চলেচি।

পূজোর ছুটি এসে গেল। মধ্যে G. B. Association থেকে আমায় একটা অভিনন্দন দিলে—পশুপতিবাবু, জ্যোৎস্না বৌমা, শৈলদা, তারাশঙ্কর—আরও অনেকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটী আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। এবার বই লিখবার তাগিদ, কাল রাত্রে একটা গল্প লেখা শেষ হয়েচে—আজ থেকে লেখা বন্ধ। এবার রাঁচি হইতে সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করবার তাগিদ এসেচে। একবার চাটগাঁ যাবার ইচ্ছেও আছে।

আজকাল শরতের বৈকালে স্কুলের ছাদ থেকে কিংবা পথে যাবার সময়ে দূর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বহুদিন আগেকার বারাকপুরে যাপিত বাল্যদিনগুলির কথা—বিশেষতঃ পূজোর সময়কার কথা মনে পড়ে।

বাবার এই সময়ে প্রতি বৎসর জ্বর হোত—ঘরে ধুনোর গন্ধ বেরুতো সন্ধ্যার সময়, বাবা জ্বরের ঘোরে অস্ফুট কাতর শব্দ করতেন—আর আমরা ছেলেমানুষ তখন, ভাবতুম—এবার পূজোর সময়ে আমাদের কাপড় হোল না—(বালকবালিকারা বড় স্বার্থপর হয়) মায়ের হাতে একদম টাকা পয়সা থাকতো না—১৯১৩ সালের পূজোর সময় বাবা কলকাতা না কোথায় ছিলেন, এক পয়সাও পাঠান নি, আমাদের সে কি কষ্ট, মা আমাকে তক্তপোষখানার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় কি কথা বলে দিলেন সংসার ও বাবা সম্বন্ধে—সে-সব কথা মনে আসে কেবলই।

সুপ্রভার চিঠি আজও আসেনি, মন সেজন্যে ব্যস্ত আছে। এরকম তো কখনো হয় না?

খুকুর জন্যেও গত একমাস রোজই ভাবি—হয়তো পূজোর সময় দেখা হবে, নয়তো হবে না—কত ধরণে, কত ভাবে এর কথা যে মনে হয়। বারবেলা ক্লাবে অভিনন্দনের দিন গভীর রাত্রে জ্যোৎস্না-ভঙ্গ ছাদে ওর মুখখানি মনে হয়ে মন কি খারাপ হয়ে গিয়েছিল! তারপর মনে হোয়েছিল সুপ্রভার কথা—কল্যাণীর কথা।

কি জানি কারো সঙ্গে দেখা হবে কি না। রেণু লিখেচে অবিশ্যি করে যাবার জন্যে এবার। দেখি কি হয়।

৺পূজো ফুরিয়ে গেল। ঘাটশিলাতে ছিলুম সপ্তমী পর্য্যন্ত। সেখানে গিয়েই সুপ্রভার হাতের একখানা রুমাল পেলুম। ক'দিন বেশ আনন্দ উপভোগ করা গেল ঘাটশিলায়। তুলসী বাবুর বাড়ীতে সপ্তমীর দিন বৌমা, নীরদবাবু, রেখা, সুবর্ণ দেবী সবাই মিলে মৌভাণ্ডার আরতি দেখতে যাওয়া গেল। বেশ শীত পড়েছিল, সেখানে বাঁধের পাশে শালবনে বেড়াতে যেতুম

—কি চমৎকার লাগতো! মহাষ্টমীর দিন দুপুরের গাড়ীতে আমি আর কমল কলকাতায় এলুম। গত পূজার কত কথা মনে হয়! জাহ্নবী নেই এ বছর। আর বছর কত প্রসাদ খাওয়া বনগাঁয়ে, ভেবে কি কষ্ট হয়! খুকুর কথাও মনে হয়েছিল সপ্তমীর আরতির সময়—সেদিন দুপুরে গালুডিতে নীরদ বাবুর বাড়ীর বটতলায় পাথার ঠেস্ দিয়ে বসে কেবল সুপ্রভা, সুপ্রভা—ও, কি ভাবেই ওর কষ্ট! মনে হয়েছিল সেদিন। সেই দুপুরের রোদে কালাঝোর পাহাড়ের দিকে থেকে সুপ্রভা—খুকু—এদের কখন ভেবেচি।

বনগাঁয়ে এসে খুব আমোদ করা গেল। আর বছরের মত এবারও প্রফুল্লদের বাড়ীতে সার্ব্বজনীন পুজো দেখলুম। একদিন বারাকপুরে গেলুম কল্যাণী ও নবু—ওদের নিয়ে। বনসিমতলার ঘাটে ওরা সবাই বনসিমের ফুল তুললে—গান করলে আমার বাড়ী বসে ন'দিদি, মেজখুড়ীমার সামনে। তারপর ওরা হরিপদ দার বাড়ী গেল। ফিরে এসেই সেদিন আবার বিজয়া সম্মেলন গেল প্রফুল্লর বাড়ী। আজ বনগাঁ থেকে এলুম—রাত্রে চাটগাঁ থেকে ময়মনসিং হয়ে। কতকাল ধরে পশ্চিমে যাইনি—বারো-তেরো বছর আগে। কেবলই যাচ্চি, অথচ পূব দিকে।

খুকু আসে নি, যদিও আসবার কথা ছিল।

•

এইমাত্র সকালের ট্রেণে চাটগাঁ থেকে এলাম। ১৯৩৭ সালের পরে আর যাই নি। রত্না দেবীর স্বামী সমরবাবু ওখানে মুন্সেফ। রেণুরা হয়তো সহরের বাড়ীতে নেই ভেবে ওঁর ওখানে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড সাত তলা বাড়ী—অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় সাত তলার ওপর থেকে—কর্ণফুলির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। পরদিন সকালে রেণুদের বাড়ী গিয়ে দেখা

করলুম। রেণু বল্লে—এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল। আমার হাতের নখ কেটে দিলে বসে বসে। কতক্ষণ ধরে কত গল্প হোল। সুপ্রভার কথা উঠলো—খুকুর কথা উঠলো। আসবার দিন ভৈরববাজারে মেঘনা নদী পার হবার সময়ে ট্রেণে সুপ্রভার কথা আমার কি ভীষণভাবেই মনে এসেছিল। যাবার দিন সব গ্রামের ছায়ায় সুপুরি বনের ছায়ায় কল্যাণীকে কতবার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ কতকাল থেকে—সুপ্রভা, সেবা, রেণু, কল্যাণী, মায়া—সবই পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে। ওদের টানেই কতবার এখানে এলুম। সারাদিন কল্যাণী আর কল্যাণী···কত গ্রামে ওকে কল্পনা করলুম—বিদ্যাময়ী কলেজের হোষ্টেল দেখে মনে হোল এখানে ওরা ছিল। রত্না দেবীদের সাত তলায় একদিন গানের আসর হোল—কোজাগরী পূর্ণিমা সেদিন। গোপালবাবু গান গাইলে—কবিরের ও মীরার ভজন। আমার মনে হোল তাদের কথা, যারা আনন্দ চেয়েও পায়নি—কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ পেয়ে তাতেই খুসি হয়ে জীবন কাটিয়ে গেল। জাহ্নবী নবদ্বীপে গিয়েছিল গঙ্গাস্নান করতে, সেকথা—খুকু ডাক-বাংলোর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল—কল্যাণীরা সেদিন ঘোড়ার গাড়ী করে বারাকপুরে বেড়াতে গিয়েছিল—সে সব কথা। চোখে যেন জল এসে পড়ে। আমি ছোটবেলা থেকে কত আনন্দই পেলুম—কিন্তু আমার পরিবারের আর কেউ অত আনন্দ কোনোদিন কল্পনাও করলে না। কক্সবাজারের ডাক্তারের তরুণী বধূ গাড়ীতে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। আমি তাঁকে 'মা' বলে ডাকলুম। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে ভিন্ন এভাবে কেউ আলাপ করতো না।

রেণু, কল্যাণী ও খুকুর সঙ্গে একদিন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম।

ওদের সীতাকুণ্ড গ্রামে যে বাড়ী আছে, সেখানে গ্রামে গিয়ে উঠলুম। মধুর মা বলে একজন ব্রাহ্মণ বিধবা আমাদের আদর-যত্ন করলেন। সুপুরির গুঁড়ির সাঁকো দিয়ে পার হয়ে রেণু ও আমি অতি কষ্টে মধুর মার বাড়ী গিয়ে পৌঁছুই। আমি তামাক খাচ্চি হুঁকোয় (মধুর মা সেজে দিল) দেখে রেণু তো হেসেই অস্থির। বুদ্ধু তার ক্যামেরাতে সেই অবস্থায় আমার ফটো নিলে। আরও অনেক ফটো নেওয়া হোল পাহাড়ে উঠবার পথে। রেণু কেবল বলে—আপনার জন্যে আমার ভয়। আমি বলি—তোর কোন ভয় নেই—চল উঠে। কি সুন্দর দৃশ্য, কি শ্যামল বনানী, বিরাট বনস্পতিদের ভিড়। শম্ভুনাথের মন্দিরের কাছে রেণু, কল্যাণী ওরফে চঞ্চু জল খেয়ে নিলে। যেমন আমি বলি চঞ্চু, রেণু অমনি বলে 'বাহির হইল! চঞ্চলা বাহির হইল!' অর্থাৎ আমার গ্রাম্য-জীবনের লেখক হবার সেই আশ্চর্য্য ঘটনাটীর কথা। একটা গাছের ফটো নিতে গিয়ে ওদের জোঁকে ধরলে। জোঁক অবশ্যি আমাকেও ধরেছিলো। আসবার পথে ওরা তেঁতুল পাড়লে একটা গাছ থেকে—তারপর ওদের বাড়ী এসে সবাই ভাত খাওয়া গেল সন্ধ্যা বেলা। রেণু বল্লে—আপনার সঙ্গে এ সম্পর্ক আর কখনো জীবনে পাবো না! কত গল্প করতে করতে রাত্রি ন'টার সময় চাটগাঁ এলুম। রত্নাদেবী খাবার করে নিয়ে বসে আছেন—ভাগ্যে আজ সীতাকুণ্ডে থাকিনি!

তারপর দিন সকালে উঠে কেশব জিনিষ নিয়ে স্টেশনে এল। রেণুর বই কেশবের হাতে দিয়ে দিলুম। চন্দ্রনাথের পাহাড় ... স্টেশন থেকে বেঁকে উত্তর পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচে একেবারে হিমালয় পর্য্যন্ত। কি নিবিড় ঘন বনানী পাহাড়ের মাথায়। ওই একটা বিভিন্ন জগৎ যেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া স্টেশনে আসবার সময় মনে হোল অনেকবার আগে একবার

এ পথে গিয়েছিলুম তখন আমার কি ছিল ? এখন কত কে আছে—সুপ্রভা আছে, কল্যানী আছে, খুকু আছে । ময়মনসিং স্টেশনে আসবার আগে এল বৃষ্টি । আজ কিন্তু ময়মনসিং স্টেশন ছাড়িতেই গারো পাহাড় বেশ দেখা গেল—বিদ্যাগঞ্জ বলে একটা স্টেশন থেকে চমৎকার দেখা গেল ! স্টীমারে যখন পার হচ্ছি, ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার পিংনা বলে একটা স্টেশনে এসে স্টীমার দাঁড়ালো । আমি কল্পনা করলুম সন্ধ্যায় নেমে আমি অনেকদিন পরে যেন কল্যাণীদের বাড়ী ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি ।

হরেন ঘোষ আমার সঙ্গে ময়মনসিং স্টেশনে দেখা করলে । আবার বিদ্যাময়ী হোস্টেলটা ভাল করে দেখলুম । মায়া ও কল্যাণী এখানে পড়তো । হরেন ঘোষকে রমা দেবীর দেওয়া খাবার খাওয়ালুম । সিরাজগঞ্জে ট্রেণে উঠেই শুয়ে পড়লুম । ঘুম ভেঙ্গে একবার দেখি ঈশ্বরদি—তারপরই ঘুমিয়ে পড়লুম—দেখি রাণাঘাট । ভোর হবার দেরী নেই ! আবার ঘুমিয়ে পড়লুম—দেখি নৈহাটি । দেশে এসে গিয়েচি । স্টীমারের এঞ্জিনের কল প্রতিবারই দেখি—এবারও দেখলুম । পূজোতে খুব বেড়ানো গেল এবার । ঘাটশীলা, বনগাঁ, বারাকপুর চাটগাঁ, ময়মনসিং—বহু জায়গা । কলকাতায় নেমে দেখি শ্রাবণ মাসের মত মেঘাচ্ছন্ন দিনটা । বৃষ্টিও বেশ নামলো দুপুরে । আজই বনগাঁ হয়ে বারাকপুর যাবো ।

আনন্দের বিষয় এই যে, ১৯২২ সালে ব্রাহ্মণবেড়িয়া হয়ে চাটগাঁ থেকে যখন কলকাতায় ফিরি, তখন আমি ৪১নং, মৃজাপুরের যে দিকের মেসটায় থাকতুম—এবারেও সেইখানে এসে উঠেচি ।

আজ স্কুল খুলেচে। বনগাঁ থেকে এলুম। আগের লেখাটা লিখবার পরে বারাকপুরে দু'দিন ছিলুম। আমার উঠোনের গাছে খুব শিউলি-ফুল ফুটচে। খুকুর কথা কেবলই মনে হোল সেখানে গিয়ে। কুঠীর মাঠে যেখানে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, সেখানটাতে বসে কতক্ষণ কাটালুম। নৌকো করে বিকেলে খুকুর মার সঙ্গে বনগাঁ আসবার সময় মনে পড়লো ১৯৩৯ সালের আষাঢ় মাসে খুকুর মা, খুকু এবং আমি বনগাঁয়ে এসেছিলুম। কল্যাণীর সঙ্গে দুদিন কাটিয়ে গেলুম ঘাটশিলা। সেখানে এল বিভূতি মুখুজ্যে। তাকে নিয়ে ভট্‌চাজ সাহেবের মোটরে গালুডি। প্রোফেসার বিশ্বাসের বাড়ীতে মেয়েদের পার্টিতে আমাদের নিমন্ত্রণ হোল। সেই রাত্রেই রাঁচী রওনা হই বিভূতিকে নিয়ে। মুরী জংসন থেকে রাঁচী যাওয়ার রেলপথের দু'ধারের আরণ্য সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। পরদিন রাঁচি থেকে অনেকগুলি মেয়ে ও কলেজের ছেলেদের সঙ্গে হুড্‌রু ও জোনা জলপ্রপাত দেখতে গেলুম। জোনাতে সন্ধ্যার আগে একখানা পাথরে বসে কত কি ভাবলুম। হুড্‌রুর চেয়ে জোনা ভাল লাগলো। কি জনহীন নিস্তব্ধতা চারিদিকের! মেয়েদের আসতে দেরী হোতে লাগলো, আমি ও বিভূতি ঘাসের ওপর সতরঞ্চ পেতে শুয়ে রইলুম কতক্ষণ। সুপ্রভা, খুকু, কল্যাণী, গৌরী—সবার কথাই মনে হয়। ওদের সবাইকে আমার প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করি মনে মনে। সুপ্রভার চিঠি পেয়েছি রাঁচি এসেই। জোনাতে সে চিঠিখানা আমার পকেটে। জঙ্গলের মধ্যে বসে কতবার পড়ি। কল্যাণীর চিঠিখানাও। রাঁচি শহরটি বেশ সুন্দর। সুনির্ম্মল বসু ওখানে বেড়াতে গিয়েচে, তার সঙ্গে একদিন মাঠের ধারে বেড়াতে গেলুম। রাঁচি থেকে ফিরে ঘাটশীলা এসে দেখি ছোটমামা এবং কুটুর শ্বশুর সেখানে। কমল একদিন বেড়াতে এল। চলে এলুম কলকাতা।

সেইদিন ছিল সকালে হাওড়ার পুল খোলা। স্টীমারে গঙ্গা পার হই। ন'টার ট্রেণে মানকুণ্ডু। খুকু আমাকে দেখে কি খুসি! কত গল্প, কত কথা। বাইরের দরজায় খিল দিয়ে এসে বসলো। এতদিন পরে ও স্বীকার করলে ছাদ থেকে রাঙা গামছা ওই উড়িয়েছিল। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। দেখে কষ্ট হোল বড়। আসবার সময় বল্লে—চেয়ে দেখলে দেখতে পাবেন আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। সত্যি দাঁড়িয়েই রইলো। সুপ্রভার কথা কত হোল। কল্যাণীর কথাও বল্লুম। সেইদিনই রাত সাড়ে আটটার ট্রেণে বনগাঁ। 'বঙ্গশ্রী'র সুধাংশু যাচ্ছিল, তাকে ডেকে আমার গাড়ীতে তুলে নিয়ে গল্প করি আমার ভ্রমণের। বনগাঁ পৌঁছে সুন্দর জ্যোৎস্নার মধ্যে হেঁটে চললুম। বাড়ীর সব দরজা বন্ধ করে ওরা ঘুম দিচ্চে। সুনীতিদের বাড়ী এসে বসলুম। সুধীর বাবু গিয়ে ডেকে তুল্লে। পরে একদিন কল্যাণীদের সঙ্গে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুম পিক্‌নিক্ করতে। আমাদের পাড়ার ঘাটে বনসিমতলায় কল্যাণী রান্না করলে। গ্রামের ঝি-বৌয়েরা আলাপ করতে এল। ওরা আমার বাড়ীতে বসে গান করলে! সব এল শুনতে। ইন্দু রায়ের বাড়ী গেল সবাই মিলে। জ্যোৎস্না রাত্রি, বাঁশবনের মাথায় আমাদের বাড়ীর পিছনে বৃহস্পতি ও শনি জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও যেন জ্বল্‌জ্বল্ করচে। নৌকো ছাড়লুম। কল্যাণী আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে নৌকোর বাইরে বসে। নাটদাঁড়ের এপারে জ্যোৎস্নাভরা মাঠের মধ্যে কলাণী চা করলে। কি চমৎকার লাগছিল! একটা বড় উল্কা সে সময় বেগনি ও নীল রংয়ের আলো জ্বালিয়ে আকাশের জ্যোৎস্নাজাল চিরে প্রজ্বলন্ত হাউই বাজির মত জ্বলতে জ্বলতে মিলিয়ে গেল।

সুন্দর কাটলো এবার পূজোর ছুটী। গাড়ীতে গাড়ীতে কাটলো

সারা ছুটিটা। কোথায় চাটগাঁ, কোথায় রাঁচী! আজ ফিরেচি কলকাতায় বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ থেকে।

জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল ওপরের ওটা লিখবার পরে। গত অগ্রহায়ণ মাসে আমি বিবাহ করেচি। সম্প্রতি স্ত্রীকে নিয়ে ঘাটশীলা গিয়েছিলুম। একদিন সুবর্ণরেখা পার হয়ে পাহাড় জঙ্গলের পথে চললুম ওকে নিয়ে। বনের মধ্যে একটা ঝর্ণা আছে, তার ধারে বড় বড় পাথর পড়ে আছে—এক ধরণের কি ঘাস গজিয়েচে। গোলগোলি ফুল (Coclo sperma Govripium) ফুটেচে তামাপাহাড়ে! দুজনে একটা পাহাড় ডিঙিয়ে ছোট পাথরে বসলুম ছায়ায়। তারপর ঝর্ণার জল খেয়ে চললুম পাহাড়ের দিকে। ওপরে যখন উঠেচি, তখন বেলা দুটো। ও গোলগোলি ফুল নিয়ে খোঁপায় পরলে। আমরা নেমে এলুম, তখন বেলা তিনটে।

তারপর শিবরাত্রির ছুটীতে ওকে আনতে গিয়ে বৈকালে দুজনে গেলুম ফুলডুংরিতে। চারিধারের পাহাড়ের শোভা এই বৈকালে অপূর্ব্ব হয়েচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে থাকার পরে ফিরে এলুম।

গত মঙ্গলবারে ওকে নিয়ে বারাকপুর গিয়েছিলুম। ও মায়ের ভাঙা কড়াখানার ওপরে ফুল দিলে, বড় ভাল লাগলো আমার। বেশ মেয়ে কল্যাণী।

আমরা কুঠীর মাঠে গিয়ে কুল পাড়লুম সবাই মিলে। গুটুকে, ইন্দু রায়, সত্য সবাই ছিল। সন্ধ্যার সময় চলে এলুম।

কাল ছিল স্কুলের ছুটি। সকাল বেলা বনগাঁ থেকে বেরুলাম

আমি, কল্যাণী, বেণু ও বাদু। বসন্তে ঘেঁটুফুল দেখবো এই ছিল আশা, প্রথমে গেলুম চাঁপাবেড়ের রাস্তার ধারের পুকুর পাড়ে। সেখান থেকে শুকনো পুকুরটার মধ্যে দিয়ে আমরা গেলুম ওপারে। তারপর গ্রামের পথে একটা তিত্তিরাজ গাছের তলায় ঘেঁটুবনের ধারে চাদর পেতে বসলুম। তিত্তিরাজের ফল পেকে ফেটে আছে গাছে—কেমন গন্ধ।

যেতে যেতে চড়কতলার বনের একটা অংশের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বেতগাছ ও কয়েক প্রকার নতুন ধরণের গাছপালা দেখলুম। একটা কাঙ্গালীদের বাড়ী কুল পেড়ে খেলাম। তামাক সেজে দিলে!

তখন বেলা প্রায় ১১টা। ওখান থেকে সোজা হেঁটে এলুম চালকী। পথে কত ঘেঁটুবনের শোভা, উঁচু পুকুরের পাড়টাতে চালকীর। ছেলেবেলায় যেখানে বসে কলের গান শুনেছিলুম, সেই দালানটা ভাঙা অবস্থায় দেখলুম। মিতেদের বাড়ীর ওপর দিয়ে জাহ্নবীর বাড়ী এলুম। জাহ্নবীর ঘরে এসে কল্যাণীকে নিয়ে দাঁড়ালুম। কতদিন পরে আবার দাঁড়ালুম এসে জাহ্নবীর ঘরে।

ওরা ডাব খাওয়ালে, ভাত খাওয়ালে। দুপুরের পরে সকলে হেঁটে চলে এলুম বনগাঁ। চাঁপাবেড়ের পথে এল বৃষ্টি। একটা গাছের খোড়লে সবাই ঢুকে বসি। বৃষ্টি গেল কেটে খানিকটা পরে।

বেলা চারটেতে বনগাঁ ফিরি।

কাল জাহ্নবীর বনগাঁর বাসায় গিয়েচি, পাঁচী ডেকে নিয়ে গিয়ে চা করে দিলে, পায়েস খাওয়ালে। অনেকদিন পরে ওদের বাড়ীতে গেলুম।

তার আগে মানকুণ্ডু খুকুর সঙ্গে গিয়েছিলুম একদিন। খুকু পুকুরের ধার দিয়ে আমাকে আসতে দেখেই ছুটে এল। ছাড়তে চাইলে না—তখুনি চা করে, খাবার করে খাওয়ালে।

উৎকর্ণ

গত রবিবারে বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন হয়ে গেল। তার আগের দিন আমি, কল্যাণী, কানু, বেনু সব বেরিয়ে চাঁপাবেড়েতে, ঘেঁটুফুল দেখতে গেলুম—ওরা সব খাবার তৈরী করে নিয়ে গেল। কি সুন্দর ঘেঁটুফুল ফুটেচে চাঁপাবেড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যে মাঠের ধারে। বিকেল বেলা, আমরা বিলের মধ্যে দিয়ে মাঠে বনের ছায়ায় বসলুম—সবাই মিলে চা ও খাবার খেলুম। ওরা সব ছুটোছুটি করলে। কোকিল ডাকচে বনে, নীল আকাশ, ভারী আনন্দ পেলুম সেদিন। সাহিত্য-সম্মেলন হোল তার পর-দিন। গজেন, হরিপদ দা ও খুকু এল—ওদের চা ও খাবার খেতে দিলুম।

নববর্ষের আজ প্রথম দিন। গত বর্ষে অনেক নতুন ঘটনা ঘটে গেল। সুপ্রভার বিবাহ ও আমার বিবাহ তাদের মধ্যে দুটী প্রধান ঘটনা। পূর্ব্বের জীবন একেবারে বদলে গিয়েচে।

আজ বনগাঁ থেকে এলুম রাত ন'টার ট্রেণে। কাল বারাকপুরে চড়ক দেখতে গিয়েছিলুম অনেক দিন পরে। আমি, গুট্‌কে ও নন্টু—তিন জনে যাই। অনেকদিন আগের মত চড়কতলায় কাদামাটি দেখলুম। শিবের জন্যে ধান ছড়ানো। বাড়ীর পেছনে বাঁশতলায় বেড়াতে গিয়ে তেমনি শুকনো ফলের বীজের গন্ধ, পাখীর ডাক। তেমনি কোকিল ডাকচে—যেন গোটা জীবনটা সামনে পড়ে আছে মনে হোল! বাবা ও মাও যেন আছেন!

বার্ণপুরে সাহিত্য-সম্মেলনে ও-সপ্তাহে কল্যাণীকে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে একদিন ওরা মোটর নিয়ে রতিবাটি কয়লার খাদ দেখাতে নিয়ে গেল আমাদের। জীবনে এই প্রথম কয়লার খাদ দেখা হোল। বিভূতি মুখুয্যেও সঙ্গে ছিল।

উৎকর্ণ

১লা বৈশাখ খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল আজ বনগাঁয়ে। দু'টী লোক হাটে গাছ চাপা পড়ে মারা গেল।

কচা মারা গিয়েচে, বারাকপুরে গিয়ে সকলের মুখে সে বিবরণ শুনলাম। বড়ই শোচনীয় মৃত্যু!

কতদিন পরে আবার দেখলুম চড়ক—সেই কথাই বার বার মনে হচ্চে—এমন ধরণের লাঠি খেলা সেই দেখতুম বাল্যকালে, আবার কতকাল পরে যেন মনে হোল দেশের আমাদের ঘরবাড়ী ঠিক তেমনি আছে, তেমনি পক্ষী-কাকলী মুখরিত, শুকনো ফলের বীজের গন্ধামোদিত আমার বাল্য-দিনগুলি। বাবা যেন এখনও বসে গান গাইচেন আমাদের ঘরের দাওয়ায়—আবার কবে যাত্রা বসবে—সেই আনন্দে দিনরাত চোখে নেই ঘুম।

তার অনেকদিন পরে, মনে আছে যেবার আমি ম্যাট্রিক দিই সেই—শেষ বার কাদামাটির সময় চড়কতলার রৌদ্রে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, পরের বছর আসিনি—থার্ড ইয়ারে এসেছিলুম, কিন্তু সে কথা মনে নেই। আজ কত বছর পরে আবার এলুম সেই কাদামাটি দেখতে।

গ্রীষ্মের ছুটীর পরে স্কুল খুলেচে। অনেক কিছু ঘটে গেল গ্রীষ্মের ছুটীতে। দার্জ্জিলিং গিয়েছিলুম কল্যাণীকে নিয়ে—সেখানে অবজার-ভেটরি হিল থেকে নামচি—সুপ্রভা ও সেবার সঙ্গে দেখা। সুপ্রভার বাবাও ছিলেন। একদিন ওদের হোটেলে গিয়ে চা খাওয়া গেল। তার-পর সেদিনই ঘুম থেকে আমি হেঁটে আসচি জলাপাহাড় রোড হয়ে—দেখি নীচে থেকে কে ডাকাডাকি করচে। চেয়ে দেখি সেবা ও বিপুল দাঁড়িয়ে। নেমে এলুম। কালিম্পং রোডের মোড়ে গাড়ীর মধ্যে সুপ্রভা বসে আছে।

পান দিলে খেতে। গল্প করে তখনি জলাপাহাড় রোড ধরে চলে এলুম দার্জিলিং-এ। পথের দৃশ্য অপূর্ব্ব। কি হিমারণ্যের শোভা! কত কি ফুল ফুটে রয়েচে। অনেক ফুল তুলে আনলুম কল্যাণীর জন্যে। M. S. M. আপিসে একটী ছেলের সঙ্গে দেখা করলুম, সেদিন ট্রেণে যে সন্দেশ দিয়েছিল কড়াপাকের। কল্যাণী ধর্ম্মশালায় শুয়ে আছে—তাকে নিয়ে গিয়ে উঠলুম অকল্যাণ্ড রোডে। সেখান থেকে দার্জ্জিলিং-এর দৃশ্য কি সুন্দর দেখা যায়—বিশেষ করে আলো জ্বালবার দৃশ্য। নামবার দিন তরাইএর ঘন অন্ধকার অরণ্য ও অসংখ্য জলপ্রপাত আমার মনে পূর্ব্ব দৃষ্ট কত দৃশ্যকে তুচ্ছ করে দিলে। বনগাঁ এসে একদিন বারাকপুর গিয়েছিলুম। ইন্দুর সঙ্গে নদীর ধারে বসে গল্প করলুম, হাজারি সিংয়ের দোকানে বসে রেজিনা গুহের গল্প হোল। হাজারি সিং বল্লে—সে দেখোনি তোমরা, সাক্ষাৎ সরস্বতী! অথচ ও কখনো নিজেই দেখেনি। হাডাক্ জিন্সের গল্পও হোল—যেমনি আজ গত ১৫।১৬ বছর কি তারও বেশি হয়ে আসচে। গাড়ী পাঠিয়ে ওঁরা জামাই ষষ্ঠীতে নিয়ে গেলেন। তাঁরপর ষষ্ঠীর দিন হঠাৎ প্রশান্ত মহলানবীশ, কানন বালা ও মিসেস্ মহলানবীশ গেলেন বনগাঁয়ে। সেখান থেকে গেলেন বারাকপুরে। আমার রোয়াকে গিয়ে বসলেন। শ্যামাচরণ দা চা ও খাবারের ব্যবস্থা করলে।

আমি আষাঢ় মাসে একদিন গেলুম পাটশিমূলে। পথে ভীষণ কাদা—বলদে-ঘোঁড়ামারি এক গ্রাম্য পাঠশালায় বসে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে গল্প করি। সেখানে জল খেয়ে আবার রওনা হই। একটা বটগাছের তলায় বসি। তারপর আসসিংড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে জামদা বিলের আগাড়ের সেই শেকড় তোলা বটগাছটার তলায় গিয়ে বসলুম। পাটশিমলে পৌছে পিসিমার মুখে কত পুরোণো কথা শুনি। পেছনের বাঁওড়ে বর্ষার দিনে

হিজল গাছের ঘাটে কত তৃপ্তি! সন্ধ্যা বেলা ডাঙা-উঁচু বনের মধ্যে দিয়ে প্যাটাডিঙির দিকে হাজরাতলার ধারে বেড়াতে গেলুম। সেই জামগাছের শেকড়টাতে বসলুম। তারপরদিন আবার সেই পথেই ফিরি।

ঘাটশিলাতেও গিয়েছিলুম দ্বিজুবাবুর ওখানে সন্ধ্যায় বসে রোজ গল্প হোত। একদিন খুব বর্ষা। সন্ধ্যার আগে আমি সুনীলদের নতুন বাড়ীতে এক স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। ফিরবার সময়ে নদীর ধারের পথ হয়েই ফিরলুম। একজায়গায় নাবাল জমিতে অনেকখানি জল বেধেছিল। বৌমা ও উমাকে নিয়ে একদিন ফুলডুংরির পেছনকার শালবনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কি সুন্দর কুরচি ফুল ফুটেচে বনে। একটা ঝর্ণা বর্ষার জলে ভরপুর, এঁকে বেঁকে চলেচে বনের মধ্যে দিয়ে। ফুলডুংরি পাহাড়ে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতুম। একদিন ঘন বর্ষায় সন্ধ্যার সময় একা কতক্ষণ পাহাড়ের ওপর বসে বসে ভাবলুম এ ফুলডুংরি কতদিনের। পলাশীর যুদ্ধের দিনেও এমনি ছিল, আকবর যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখনও এমনি ছিল, বুদ্ধদেব যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন তখনও এমনি ছিল, যখন মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার সভ্যতার বর্ত্তমান, যেদিন সম্রাট টুটেন খামেনের মৃতদেহ সাড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হয়েছিল—সেদিনও এই ফুলডুংরি এমনই ছিল, আজ যার ওপর ধলভূম রাজার পার্ক তৈরী হচ্চে।

বনগাঁয়ে এবার খুকু ছিল অনেকদিন। সেই ১৯৩৯ সালের খুকু আর নেই। প্রায়ই সন্ধ্যায় কল্যাণীকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম। ও গেল ৪ঠা আষাঢ়, সেদিন কল্যাণীকে সঙ্গে করে ওদের ছাদে বসে গল্প গুজব করা গেল। সন্তুও ছিল, রামদাসের মেয়ে।

খয়রামারি শ্মশানের পাশে মাঠে মন্মথ দা, যতীন দা বিভূতিকে নিয়ে

বিকেলে বেড়াতে যেতুম। ওটা নতুন আবিষ্কার। ইছামতীর জলে স্নান করে কি তৃপ্তিই পেতুম। এবার কি ভীষণ গরম গেল। নেয়ে তৃপ্তি নেই ঘাটশিলায়। ইছামতীতে সন্ধ্যার সময়েও নাইতুম। শরীর যেন জুড়িয়ে যেতো ঘাটশিলার পরে দেশে এসে। ঘাটশিলাতে নাইবার কি কষ্টই গেল ক'দিন। একে গরম, তাতে ভাল করে স্নান করবার মত পুকুর নেই। দ্বিজু বাবুর পুকুরের ঘোলা জলে একদিন নেয়েছিলুম।

যতীন দাকে গ্রহ নক্ষত্রের কথা খুব বলতাম। Jean's ও Eddigton-এর Astronomy-টা এ ছুটীতে খুব পড়া গিয়েচে ও আলোচনা করাও গিয়েচে। রোজ তিনটের সময় কল্যাণীকে লুকিয়ে ও তার বকুনি সহ্য করেও ওদের আড্ডায় চলে যেতুম। যতীন দা দেখতুম বসে আছে। দুজনে আরম্ভ করতুম গ্রহ নক্ষত্রের গল্প। কল্যাণী সন্ধ্যার সময় পারত-পক্ষে বেরুতে দিত না। অন্ধকারে পালালে ছুটে গিয়ে ধরে আনতো। ছাদে শুতাম প্রায়ই গরমে। মাঝ রাত্রিতে দু'জনে নেমে আসতাম। সকালে খুকুর বাড়ী যেতামই।

ভাল কথা, রেণুর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল এই ছুটিতে। যেদিন ঘাট-শিলা যাই, তার আগের রাত্রে। বিভূতি মুখুয্যে, মনোজ এবং আমি বনগাঁ এলুম। গোপাল নিয়োগীর বাসায় যেতে ফুলির ছেলের সঙ্গে দেখা, সে নিয়ে গেল ওঁদের বাসায়। সেখানে ফুলির মার কাছে রেণুর ঠিকানা নিয়ে চলে গেলুম ক্যাম্বেলের সামনে দেখা করতে। রেণুই এসে দোর খুলে দিলে। খুব খুসি আমায় দেখে। সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে গেল। একখানা চিঠিও দিয়েছিল পুরী থেকে—হুটু নিয়ে গিয়েছিল ঘাটশিলাতে—বৌমা ছিলেন।

চমৎকার গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হোল।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বাড়ী আড্ডা দিতে গেলুম সজনী, মোহিতদা, বিভূতি মুখুয্যে ও আমি। কলকাতার রাস্তা-ঘাট অন্ধকার। অনেক রাত পর্য্যন্ত খাওয়া দাওয়া করে ফিরলুম। ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট হিউজেস্ সাহেবও সেদিন সেখানে ছিল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন। বহুকাল পরে আজ আমার বহুকালের পরিচিত আবাস ৪১, মৃজাপুর ষ্ট্রীটের মেস্ ছেড়েচি। সেই হরিনাভি স্কুলের থেকে আজ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯২৩ সাল থেকে ওই মেসটাতে ছিলাম। এতকাল পরে আজ ছেড়ে অন্যত্র আসতে হোল, কারণ মেসটা গেল উঠে। বিভূতি, দেবব্রত, খুকু, সুপ্রভা, রেণু—কত লোকের সঙ্গে ও মেসের স্মৃতি সুখে দুঃখে ছিল জড়ানো।

গত রবিবার ৬ই জুলাই নড়াইল সাহিত্য-সম্মেলনে আমি ছিলুম সভাপতি—বনগাঁ থেকে যতীনদা, মন্মথদা, মিতে এদের নিয়ে গিয়েছিলুম। সিঙ্গে স্টেশনে নেমে একটা দোকানে খাবার তৈরী করতে বলে আমরা ভৈরবের ওপরে কাঠের পুলে গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাঞ্ছানিধি বলে জনৈক উড়িয়া ওপারে জঙ্গলবাধাল গ্রামে থাকে—সে তার মনিবের কত নিন্দে করলে। তারপর ময়রার দোকানে এসে লুচি সন্দেশ খেয়ে একখানা এক ঘোড়ার গাড়ীতে এলুম তাক্রার ঘাটে। সেখান থেকে নৌকো করে ক’বন্ধুতে বসে গল্প করতে করতে জ্যোৎস্না রাত্রি ভাল করেই উপভোগ করা গেল। মিতে ও আমি নৌকোর ছই-এর ওপর গিয়ে বসে যতীনদাকে বার বার ডেকে ও ছইয়ে ঘা মেরে তার ঘুমের ব্যাঘাত

করছিলাম। ভোরে পিয়েরের খালের ধারে নৌকো লাগলো। সেখান থেকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলুম রতনগঞ্জ। একটা দোকানে খেলুম খাবার। তারপর টাকুরে নৌকোতে উঠে নড়াইল গিয়ে অজিত বাবুর বাসায় গিয়ে হাজির হই বেলা সাড়ে আটটার মধ্যে। বৈকালে সভা সেরে চা পার্টিতে স্থানীয় S. D. O., মুন্সেফ্ প্রভৃতির সঙ্গে গল্প। একটা নাটকাভিনয় দেখতে গেলুম টাউন হলে—তারপর অনেক রাত্রে খেয়ে গরুর গাড়ীতে রওনা। বেশ জ্যোৎস্না রাত্রি। খুব ঘন বন, বেত ঝোপ পথের ধারে। আবার পিয়েরের খালে নৌকোয় উঠলুম। যতীনদাকে সবাই মিলে উত্যক্ত করে তোলা গেল, কেন অজিত বাবুর সামনে ভাড়া চেয়েছিল, এই কথা বলে। রাত্রে নৌকো থেকে পড়ে যাবার মত হয়েছিল যতীন দা। ভোরে আফ্রার ঘাট থেকে হেঁটে সিঙ্গে স্টেশন। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র রেখে স্নান করে নিয়ে চা ও সন্দেশ খাওয়া গেল। বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ এসে নামলাম। কল্যাণী খুব খুসি। আহা, আসবার সময় রসমুণ্ডি নিয়ে আমার হয়ে ঝগড়া করে বকুনি খেল রেণু খুকুর কাছে। আমায় বল্লে—আমার মড়া মুখ দেখবেন, আজ যদি যাবেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব'র মত চলেই তো আসতে হোল!

সামনের রবিবারে নীরদ বাবু, সুবর্ণ দেবী, পশুপতি বাবু যাবে মোটরে বনগাঁ picnic করতে—সম্ভবতঃ চালকী বিভূতিদের বাড়ী হবে রান্নাবান্না।

জীবন আবার কি ভাবে কোনদিক থেকে পরিবর্ত্তন হয়ে গেল তাই ভাবি। ৪১, মৃজাপুর ষ্ট্রীটের মেসে সেই পুরোনো ঘর আমার জন্যে রেখে

দিয়ে ওরা আমায় সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে ডাকলে—কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে হোল না। মেসের মায়া এবার কাটাতে হবে—কল্যাণী খুব ধরেচে এবার ওকে নিয়ে বাসা করতে হবেই। ভেবেচি কলকাতা ছেড়ে বারাক-পুরে থাকবো। গ্রামের জীবন, ইছামতীর ঘোলা জল, মটরলতার দুলুনি —কতকাল ভোগ করিনি। জীবনে কোনদিনই গৃহস্থ হয়ে বারাকপুরে থাকি নি। এবার গার্হস্থ্য জীবন যাপন করবার বড় আগ্রহ হয়েচে। জীবনে যা কখনো হয়নি—এবার তা করেই দেখি না কেন। মুক্ত ও স্বাধীন জীবন দুদিন দেখি কাটিয়ে।

কাল রবিবারে নীরদবাবু ও সুবর্ণ দেবীরা এলেন বনগাঁ। আমি, কল্যাণী, মায়া দি, বেণু সবাই মোটরে চালকী। বিভূতির বাড়ী গিয়ে বসা গেল। ডাব খেলাম। তারপর সুধাংশুদের বাড়ীর রান্নাঘরে খিচুড়ি রান্না হোল। ইতিমধ্যে যূথিকা দেবী ও পশুপতিবাবু গিয়ে হাজির। সবাই মিলে আনন্দ করে খাওয়া ও গল্প করা গেল। জাহ্নবীর ঘরে ওদের নিয়ে গেলাম—বেচারী জাহ্নবী যদি আজ থাকতো! ওর অদৃষ্ট নিয়ে ও এসেছিল—চলে গেল নিজের অদৃষ্ট নিয়েই।

গোপালনগরের হাটে সবার সঙ্গে দেখা। কল্যাণী, মায়া দি সুবর্ণ দেবী সবাই হাট করচে। গজেন, ফণি কাকা, নলে নাপিত, গুটকে, শ্যামাচরণ দা—সবাই দেখলে। শ্যামাচরণ দা সুবর্ণ দেবীদের হাট করে দিলে। আমরা আবার ফিরে এলুম বনগাঁ। সেখান থেকে চা খেয়ে ওরা চলে এল। কল্যাণীকে আজকাল বেশ ভাল লাগচে। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ছাড়ে না—যেমন এসেচি কলকাতায় অমনি এক চিঠি এ শনিবারে না এলে মরে যাবো। বড় ভালবাসে।

আজ একটী মহা স্মরণীয় দিন বাঙালীর। সকালে উঠে লেখাপড়া করচি, বিশ্ব বিশ্বাস এসে বল্লে, রবীন্দ্রনাথ আর নেই। শুনেই তখনি রবীন্দ্রনাথের বাড়ী চলে গেলুম। বেজায় ভিড়—ঢোকা যায় না—সেখানে গিয়ে শোনা গেল রবীন্দ্রনাথ মারা যান নি—তবে অবস্থা খারাপ। ওখান থেকে এসে স্কুলে গেলুম। স্কুলে শুনলাম তিনি মারা গিয়েছেন ১২টা ১৩ মিনিটের সময়। স্কুল তখুনি বন্ধ হোল। আমি ও অবনী বাবু, ক্ষেত্র বাবু স্কুলের ছেলের দল কলেজ স্কোয়ার দিয়ে হেঁটে গিরিশ পার্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে বিরাট শব যাত্রার জনতা আমাদের ঠেলে নিয়ে চললো চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বেয়ে। রমেশ সেনের ভাই সুরেশের সঙ্গে আগের দিন প্রমোদ বাবুর বাড়ী দেখা হয়েছিল—আমরা হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে যাই নীরদ বাবুকে। সে আর আমি কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের মধ্যে দিয়ে সেনেটের সামনে এসে আবার পুষ্পমাল্য শোভিত শবাধারের দর্শন পেলুম। পরলোক গত মহামানবের মুখখানি একবার মাত্র দেখবার সুযোগ পেলুম সেনেটের সামনে। তারপর ট্রেণে চলে এলুম বনগাঁ। শ্রাবণের মেঘনির্মুক্ত নীল আকাশ ও ঘন সবুজ দিগন্ত বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল—

গগণে গগণে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নবীন জনম লভি—

অনেকদিন আগে ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন পত্র' পড়তে পড়তে বারাকপুরে ফিরেছিলুম—মায়ের হাতের তালের বড়া খেয়েছিলুম, সে কথা মনে পড়লো।

কল্যাণীকে শবাধারের শ্বেত-পদ্ম দিলুম, সে শুনে খুব দুঃখিত হোল। তারপর হরিদা'র মেয়ের বিয়েতে গেলুম—তাঁর বাড়ী। খেতে বসে খুব বৃষ্টি এল।

তারপর ক'দিন ছিলুম বনগাঁ। খুকু এল অসুস্থ অবস্থায়। রাত্রে কল্যাণীকে নিয়ে দেখা করতে গেলুম ওর সঙ্গে। আবার পরদিন নিশিদার বাড়ীতে বৌভাত তাঁর ছেলের। সেখানেও গেলুম—যাবার আগে খুকু-দের বাড়ী গিয়ে গল্প করলুম।

কিন্তু মনে কেমন যেন একটা শূন্যতা—রবীন্দ্রনাথের নেই! একথা যেন ভাবতেও পারা যাচ্চে না।

গত জন্মাষ্টমীর দিন বিকেলে এখানে এল বিভূতি, মন্মথ দা। ওদের নিয়ে প্রথমে গেলাম শিবপুর লাইব্রেরীতে—তারপর রাত ন'টার ট্রেণে রওনা হয়ে নামলাম গালুডিতে। ভোরের দিকে সুবর্ণরেখার পুল পার হয়ে শাল জঙ্গলের পথে উঠলুম এসে কারখানার চিমনিটার কাছে। কত-কালের পরিত্যক্ত তামার কারখানা—লোকও নেই, জনও নেই। গুররা নদীতে স্নান সেরে সবাই মিলে পিয়ালতলার শিলাখণ্ডে বসে জলযোগ সম্পন্ন করলুম—তারপর তামাপাহাড় পার হয়ে নীলঝর্ণায় নামলুম। সেখান দিয়ে আসবার পথে একটা ঝরণার জল পান করে আমরা একটা ছোট্ট দোকানে কিছু চিঁড়ে ও চা কিনি। একটী ছোট্ট মেয়ে দোকানে ছিল, সে চা'র জল গরম করে দিলে। তারপর ঘন বনের পথে হেঁটে পাটকিটা গ্রামে পৌঁছে গেলুম। গ্রামের বাইরে যে ছোট্ট ঝর্ণাটি, সেখানে বসে আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর আবার হেঁটে রাণীঝর্ণার পাহাড় পার হয়ে ওপরে উঠলুম—দূরে সুবর্ণরেখা আবার দেখা যাচ্চে—বেলা তখন তিনটে। মুশবনী রোডে নেমে কেঁদাডি গ্রামে পল্লীকবি বিষ্ণুদাসের বাড়ী এলুম। তারপর চা খেয়ে তিরুঝর্ণা পার হয়ে আমরা সুবর্ণরেখার খেয়া ঘাটে ডোঙায় নদী পার হলাম। ভট্টাচার্য্য সাহেবের বাংলোয় বসে

গল্প করে ঘাটশিলার বাড়ী এলুম। রাত্রে সেখানে বিধায়ক, কমল, অমর প্রভৃতির সঙ্গে বসে খাওয়া গেল।

পরদিন সকালের ট্রেণে চলে আসি কলকাতায় ও রাত সাড়ে আট-টার ট্রেণে বনগাঁ। কল্যাণীর সঙ্গে ভ্রমণের গল্প করি। খুকু এখানে এসেচে, তার সঙ্গে গিয়ে গল্প করি একদিন কল্যাণীকে নিয়ে ছাদে বসে।

এবার পূজোর ছুটি কাছে এসেচে। কি ভীষণ পরিশ্রম গিয়েচে—গ্রীষ্মের ছুটির পরে এই ক'টা মাস—বিশেষ করে গত এক মাস। সর্ব্বদা লেখা আর লেখা!···খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই! রোজ ভোরে উঠে কল ঘরে যাই স্নান করতে, তখন ভাল করে অন্ধকার কাটে না, পাশের বাড়ীর রান্নাঘরে আলো জ্বলে—এসে সেই যে লিখতে বসি—একবারে বেলা দশটা। আর তিনটী দিন পরে ছুটি—কাল দুপুরের পর থেকে খাটুনির অবসান হয়েচে। সব লেখা দিয়ে দিয়েচি—হাতে আর কোনো কাজ নেই। আজ তো একেবারেই ছুটি। ওবেলা বিদ্যাসাগর কলেজে Study circle-এ এক বক্তৃতা আছে—তাহলেই হয়ে গেল।

পূজোর পরে ছেড়েই দেবো স্কুল। অবকাশ ও অবসরে ভাল ভাবে লেখা যাবে। জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই। ঘড়ি-ধরা সময় অনন্তকে কি করেই আটকেচে। বিশ্বের ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ বৎসরের সময় অতি তুচ্ছ—কিছুই না—আমার মেসের ছোট্ট ঘরটীতে সাড়ে ন'টা যেই বাজলো আমার হাত ঘড়িতে—অমনি সময় গেল ফুরিয়ে। আমি জীবনে অবকাশ ভোগ করতে চাই এবার—আর চাই বারাকপুরে ছেলেবেলার মত বাস করতে দুদিন। দেখি এসব সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা।

বনগাঁ যাইনি অনেকদিন। ও শুক্রবারে যশোহরে পূর্ণিমা-সম্মেলনে

উৎকর্ণ

রবীন্দ্রনাথের শোকসভা ছিল। মনোজ, মহীতোষ দা, আমি ও নীরদ বাবু গিয়েছিলুম। আমি ও সুরেন ডাক্তার উঠেছিলুম অবিশ্যি বনগাঁ থেকে। সভাতে কল্যাণীর যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার জ্বর হয়েছিল বলে নিয়ে যেতে পারিনি। সভার ঘরে মণি মজুমদারের বাড়ী আমরা আহারাদি করলুম ও গিরিন দার সঙ্গে দেখা করে রাত্রের মেলে কলকাতা ফিরি— তারপর আর বনগাঁ যাওয়া ঘটে নি।

পূজো এসে গিয়েচে। কলকাতা থেকে শুক্রবার বনগাঁ থাকি মহালয়ার ছুটীতে—পরের সোমবারে স্কুল হয়ে পূজোর ছুটী হয়ে যাবে। কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলা যাবার ইচ্ছে আছে।

মনে আজ কেমন আনন্দ, এমন ধরণের অপূর্ব্ব আনন্দের দিন জীবনে ক'টাই বা আসে? আজ পূজোর আগে মহালয়ার ছুটী। সোমবার একেবারে ছুটী হচ্চে পূজোর। অনেকদিন বনগাঁ যাই নি—আজ ও-বেলা যেতে পারবো ভেবে অত্যন্ত আনন্দ হচ্চে। গত কাল সকালে যশোর থেকে এসেচি সাহিত্য-সম্মেলন করে—বনগাঁ যখনই ট্রেণখানা গেল—তখনই যেন মনে হোল নেমে পড়ি। অনেকদিন পরে ইছামতী দেখলুম সেদিন। এমন আনন্দের দিনে পেছনে যদি বহু নিরানন্দপূর্ণ দিন না থাকে, তবে এমন দিন কখনই হোতে পারে না। নিরানন্দের কঠিন, ধূসর মরুভূমি পার না হয়ে এলে আনন্দের মরুদ্বীপে পৌঁছুনো যায় না—দস্যুবৃত্তি করে যে আনন্দ লুটতে আসবে—রোজ যারা আনন্দ খুঁজে বেড়ায়—আনন্দ খুঁজে বেড়ানোই যাদের পেশা—তারা সত্যকার আনন্দ কি বস্তু—তার সন্ধান রাখে না। আনন্দের পেছনে আছে সংযম, ভোগের অভাব, আনন্দের দৈন্য—এসব অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে এসে তবে প্রকৃত আনন্দ রসের সন্ধান

মেলে। আমি জীবনে অনেকবার এ ধরণের আনন্দভরা দিনের আস্বাদ করেচি—যেমন একদিন জাঙ্গিপাড়ায়—যখন বিজয় জ্যোৎস্নারাত্রে একটা হেনাফুলের ডাল হাতে নিয়ে দেখা করলে—তারপর ইসমাইলপুরে সেই অপূর্ব্ব আনন্দের দিন—অনেককাল পরে যখন কলকাতায় আসবো সদরের হুকুম পেলুম—সেই বাঁকে সিং, সেই দিগন্ত বিস্তীর্ণ কাশবনের প্রান্তে আমাদের খড়ের কাছারীঘর!—এখনও চোখের সামনে দেখচি।

অবকাশ পেলে ইসমাইলপুর অঞ্চলে একবার যেতে হবে—এ বছরই যাবো ভেবেচি।

৺পূজার ছুটী হোল আজ—আজই বনগাঁ থেকে এসেচি—কল্যাণীর মনে দুঃখ হয়েচে হয় তো। কাল সে বলেছিল যাবেন না খয়রামারি বেড়াতে বিকেলে, কিছুতেই যাবেন না। 'যেতে নাহি দিব'—কিন্তু ও বলে ছোট মেয়ের মত জোর করে, আমি ওর কোনো কথাই রাখি নে, ওর কথা ঠেলে জোর করে চলে যাই—ও আবার বলে তবুও, বোঝে না যে ওর কথা রাখচি নে—অন্য মেয়ে হোলে অভিমান করে আর বলে না—কিন্তু রোজই বলে, রোজই কথা অবহেলা করি—অথচ ও বলতে ছাড়ে না একদিনও—সেই পুরোনো সুরে 'যেতে নাহি দিব'—ও বড় সরলা। অমন সরলা মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি।

আজ ছুটী হোলে শুনলুম স্কুলে শারদীয় উৎসব হবে—কিন্তু সে উৎসবে আমি থাকতে পারিনি বড় দেরি হোয়ে গেল বলে যোগ দিতে পারলুম না।

এলুম এম্, সি, সরকার, মিত্র ও ঘোষ, 'দেশ' আপিস, ফুনুর মায়ের বাড়ী, ক্ষিতীশ ভট্টচাজের 'মাসপয়লা' আপিস ও তারপর বাসা।

কল্যাণীর কথা কিন্তু বড় মনে হচ্চে আজ সারাদিন। তার চোখে জল দেখে এসেচি ভোর বেলা।

বারাকপুরে গ্রাম্যজীবন কিছুদিনের জন্যে যাপন করবার বড় ইচ্ছে—কত দিন যে এ ধরণের জীবন কাটাই নি—মাটির সঙ্গে যোগ থেকে... গ্রাম্য গৃহস্থ সেজে। আবার সেই শৈশবের জগৎটা আবিষ্কার করবো—এই মনে আকাঙ্ক্ষা। আমাদের বাড়ীর পেছনে বাঁশবনে এই শরৎকালের দুপুরে গাছপালার, ঘুঘুর ডাকে কি যেন মায়া মেশানো ছিল—বনভূমি যেন স্বপ্নমাখা, ১৯৩৫ সালের দোলের সময়েও আমি তেমনি স্বপ্নমাখা দেখেছি বনভূমিকে—মাত্র সাত বছর আগে। কিন্তু সহরের কলকোলাহলময় ব্যস্ত-সমস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে যে স্মৃতি আমার মনে ক্ষীণ হয়ে আসচে, যে জীবনকে ভুলে যাচ্চি, আবার সে জীবনকে আস্বাদ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েচি—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও আমায় তা করতে হবে। অন্য লোকে সে কথা কি বুঝবে?

কল্যাণী কাল বলছিল আর বছরের মত—আমার গা ছুঁয়ে বলে যান আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবেন?

তা এলুম না। ওর মনে দুঃখ হোল। গা ছুঁয়ে বল্লে তাই যদি না করা যায়, তবে মানুষ মরে যায় জানেন? এও আপুনি করলেন! লোকের জীবন মরণটাও দেখলেন না? এই সন্ধ্যায় সেকথা ভেবে মনে কষ্ট হচ্চে—ওর কথাটা শুনলেই হোত ছাই। মিথ্যে ওর মনে কেন কষ্ট দেওয়া?

ওর তরুণ মনের স্নেহ ও আগ্রহকে বার বার করে ঠেলে গেলাম অবহেলায়—তবুও ও বোঝে না, মনে কিছু ভাবে না—আবার সেই রকমই বলে।

কাছের মসজিদে আজান দিচ্চে। ক'দিন খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে

উৎকর্ণ

আজানের শব্দ শুনে ভাবলুম—এবার রাত ভোর হয়ে এসেচে। আর সে কি আনন্দ! সেই নীচের কলতলায় গিয়ে স্নান করে আসব।

৺পূজোর ছুটি আজ শেষ হয়ে স্কুল খুলেচে। আজ এসেচি বনগাঁ থেকে। পরশু ঘাটশীলা থেকে যাই বারাকপুরে। মহাষ্টমীর দিন কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশীলা যাবো পূর্ব্ব থেকেই ঠিক ছিল—সপ্তমীর দিন নকফুলে জয়গোপাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে পরদিন সকালেই রওনা। শেষরাত্রে ঘাটশিলা পৌঁছুবো। মেসে ওকে নিয়ে এসে দেখি দার্জ্জিলিং-এ দেখা সেই ছেলেটি ও স্কুলের দুটি ছাত্র উপস্থিত। ওদের সাথে গল্পগুজব করে কেটে গেল সময়টা। তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ী নিয়ে গেলুম। তারা জলটল খাওয়ালে। ফিরেই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে খানিকটা অপেক্ষা করার পরে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরলুম। মিতে আছে ওখানে—শেষরাত্রে আমাকে ঘাটশিলা পৌছুতেই সে তামাক সেজে নিয়ে এল। তারপর ভোর হতেই বেড়াতে বেরুই আমরা।

গালুডিতে দ্বিজ বাবুর সঙ্গে হেঁটে যাবার দিন যথেষ্ট আমোদ পেয়েছিলাম—আর আমোদ পেয়েছিলাম নোয়ামুণ্ডি লাইনে বেড়াতে যাবার দিন। গালুডিতে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন নীরদ বাবু, মিস্ দাস, প্রোফেসর বিশ্বাস সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' অভিনয় হোল। তারপর ঘাটশিলার ভট্চাজ সাহেবের বাড়ীতে একদিন পার্টি উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম—সেদিনও খুব আনন্দ করা গেল।

নোয়ামুণ্ডি যাবার দিন ভোর রাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরে মিতে ও আমি ঘাটশিলা থেকে প্রথমে যাই টাটা। সেখান থেকে একখানা Special train ধরে চাঁইবাসা। চাঁইবাসা বেশ সুন্দর জায়গা—অনেক

এ্যাকোসিয়া গাছ রাস্তার দু'ধারে। বাজারে বড় বড় আতা বিক্রি হচ্চে, আমরা দু' তিন পয়সার আতা কিনে রাস্তার সাঁকোতে বসে পেট ভরে খেলুম—তারপর রেল লাইন ধরে স্টেশনে হাজির। ঝিনকিপানি স্টেশনে থৈ থৈ করচে মুক্ত দিগন্ত—অমন মুক্তরূপা ভূমিশ্রী আমি বড় ভালবাসি—বেশী দেখিনি অমন দৃশ্য—এটা নিশ্চয়ই। কেন্দপোসি ছাড়িয়ে দুধারে বিজন অরণ্যভূমি, বনে সহস্র টগর (micalia champak) ফুলের গাছ—আর শেফালী—কি একটা ফুলের ঘন সুগন্ধে ত্রিশ মাইল দীর্ঘ রাস্তার প্রতি মুহূর্ত্তটী রেলের কামরা আমোদ করে রেখেচে। নোয়ামুণ্ডি ছাড়িয়ে বন আরও বেশী—সত্যিই সে বনের শোভা ও গাম্ভীর্য্য মনে অনুভাব জাগায়—তা শুধু কমনীয় সৌন্দর্য্যের ভাব নয়—যা জাগায় বাংলাদেশের বনঝোপ—সে যেন চৌতালের ধ্রুপদ—মনে গম্ভীর ভাব জাগায়। ফিল্মের অভিনেত্রীর হাল্কা প্রেমের মিষ্টি সুরের গান নয়—ফৈয়াজ খাঁর মালকোষ কিংবা পুরিয়া। গাম্ভীর্য্য আছে, উদাত্ত ভাব জাগায়—অথচ মিষ্টত্ব বলতে সাধারণতঃ লোকে যা বোঝে তা কম।

যখন ফিরি তখন চারিধারে লৌহ প্রস্তরের ছড়াছড়ি দেখে ভগবান সম্বন্ধে বড় একটা অদ্ভুত ভাব মনে এসেছিল। পদার্থ, নক্ষত্র জগৎ—বিশ্বের বিরাটত্ব প্রভৃতি নিয়ে। জঙ্গলের মাথায় পশ্চিম আকাশে শুকতারা, মাঝ-আকাশে বৃহস্পতি। রাত ১২টার ট্রেণে ঘাটশিলা এসে নামলুম।

তারপর আর একদিন গালুডি যেতে হোল নীরদ বাবুর গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্যে। সেদিন মিত্তে, মিত্তের স্ত্রী, বৌমা, কল্যাণী সবাই গিয়েছিল। পশুপতি বাবুর স্ত্রীকে সেখানে দেখলাম। খুব খাওয়া দাওয়া হোল।

আসবার আগের দিন সৌরীন মুখুয্যের ভাইপো এসে বল্লে—ধারাগিরি আমরা যাবো কি না। আমি ফুলডুংরি পাহাড়ের কোলে গালুডি রোডের

ধারে যে আম গাছ, ওখানে বসে রইলুম—ছেলেটী এসে আমায় খবর দিলে। গাড়ী ঠিক হয়ে গেল। পরদিন সকালে আমরা তিনখানা গাড়ী করে সবাই মিলে (বৌমা ও খুটু তখন ওখানে নয়) রওনা হই। ধারাগিরির পথের শোভা, বিশেষতঃ পাশটার শোভা দেখে আমার দার্জিলিং অকল্যাণ্ড রোডের কথা মনে পড়লো। তবে অকল্যাণ্ড রোড সহরের মধ্যে—আর এর চারিধারে শ্বাপদ অধুষিত বিজন আরণ্যভূমি—এই যা পার্থক্য। সেখানে ঝর্ণার ধারে বসে কল্যাণী যখন রান্না করচে—তখন আমি 'পথের দাবী' পড়চি। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগলো যে গত ১৯২৬ সালে ভাগলপুরে থাকতে সুরেন গাঙ্গুলীর পল্লী-ভবনে বসে আমি প্রথম 'পথের দাবী' পড়ি। সেও বিহারে, এবারও পড়লাম বিহারে। তখন এও জানতুম না আমায় আবার বিয়ে করতে হবে। জীবনের জটিল রহস্যের সন্ধান কে কবে দিতে পেরেচে ?

খাওয়া দাওয়ার পরে কল্যাণী, উমা, আমি ও সৌরীনবাবুর ভাইপো পাহাড়ে উঠে ধারাগিরি ঝর্ণার ওপরের অংশে গিয়ে কতক্ষণ বসলুম। ফিরবার পথে শালবনে কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠলো !

গত সোমবারে ওখান থেকে দুপুরের ট্রেণে রওনা হয়ে মেসে এলুম সন্ধ্যার সময়। নাকি জগদ্ধাত্রী পুজার দু'দিন বন্ধ। সময় নষ্ট করি কেন ? তখুনি ট্রেণের খোঁজে শেয়ালদ' গিয়ে দেখি সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ছাড়চে। তাতে উঠে চলে গেলুম রাণাঘাট—খিনুদের বাড়ী গিয়ে উঠিণু তারা চা খাওয়ালে। খিনু অনেকক্ষণ গল্প করলে। পরদিন ভোরের ট্রেণে গোপালনগরে এসে নামলুম—নিজের দেশের মাটিতে পা দিতেই যেন শরীর শিউরে উঠলো। সেই আবাল্য পরিচিত প্রথম কার্ত্তিকের বন-ঝোপের সুগন্ধ, বনমরচে লতায় থোকা থোকা ফুল-ফোটা, সেই স্নিগ্ধ

হেমন্তের ছায়া। গোপালনগর বাজারে রায় সাহেব হাজারি প্রথমে ডাক দিলে, তারপর পাঁচু পরামাণিকের দোকানের সেই কুণ্ডু মশায়—যুগল ময়রার দোকানে বসে টাট্‌কা ভাজা তেলা কচুরী কিনে খেলুম—বিষ্ণু জল দিলে খেতে। বাড়ী আসতে আটটা বেজে গেল। বুড়ী পিসিমার বাড়ী ন'দি বসে গল্প করচে—ওদের দাওয়ায় গিয়ে বসি—ঘাটশিলা ও কল্যাণীর পাহাড়ে ওঠার গল্প হয়। নদীতে স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধ নদীজলের স্নেহ স্পর্শে যেন সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। নদীর তীরে বন-ঝোপের কি মায়া, বনসিমলতার ঝোপের কি ঘন ছায়া, থোকা থোকা বেগুনি রংয়ের বনসিমলতার ফুল ফুটেচে—বনমরচে ফুলের সুবাস সর্ব্বত্র। মন ভরে গেল আনন্দে, এমন আনন্দ আর কোথাও পাইনি মুক্ত কণ্ঠে তা স্বীকার করি। বাল্যের কত স্মৃতি মিশিয়ে আছে এই সুবাসের সঙ্গে—তা কত গভীর, কত করুণ! জিতেন কামারের বাড়ীতে সুরপতি মিস্ত্রি রোয়াক গাঁথচে—সেখানে ইন্দু রায় নিয়ে গিয়ে বসালে পর দিন সকালে। মুচুকুন্দ চাঁপার তলায় পতিত, গজন, মনো রায়, ফণি কাকা মিটিং বসিয়েচে। সেখানে এল হাজারি ঘোষের জামাই লালমোহন। তার সঙ্গে ওরা স্কুলের মাষ্টার বরখাস্ত করা নিয়ে বাধালে ঝগড়া। আমি সরে পড়লুম বেগতিক দেখে। বৈকালে নৌকোয় গুট্‌কে ও আমি বনগাঁ এলুম—যেন জাহ্নবীর বাসা এখনো আছে—ছুটীর পরে সেখানে যাচ্ছি। লিচুতলায় এসে মনোজ, জয়কৃষ্ণ, যতীনদার সঙ্গে বসে ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করি। বিকেলে শুধু ছিলুম সরোজ ও আমি, মন্মথ দা'ও। সন্ধ্যাবেলায় গোপাল দা', যতীন দা', জয়কৃষ্ণ, মনোজ, মন্মথ দা' ও বিনয় দা'। খুব জ্যোৎস্না। কাল গেল ৺জগদ্ধাত্রী পূজা। আজ সকালে বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতা এসেচি। আজ বৃহস্পতিবার, এই মাত্র

ব্যারাকপুর থেকে এলুম—আর কেউ ছিল না, রাম, বুদ্ধদেব বাবু ও আমি।

এই মাত্র ঘাটশিলা থেকে এলুম ফিরে। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে বারাকপুর গিয়েছিলুম আবার। ফুটো স্টেশনে এসেছিল—ছ'টা ডিম নিয়ে রাঁধতে দিলুম মানুকে বাড়ী পৌঁছে। খুব জ্যোৎস্না। পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এসে ন'দির সঙ্গে একটু বসে গল্প করি। শিউলি ফুলের সুবাসের সঙ্গে বনমরচে ফুলের গন্ধ মিশিয়ে জ্যোৎস্না রাত্রি মধুর করে তুলেচে শত অতীত স্মৃতির পুনরুদ্বোধনে। ফণি রায়ের পরিবারবর্গ থাকে বন্ধুদের বাড়ী। কতদিন পরে ওদের বাড়ী বসে চা খেলুম। তারপর গদা কামারের বাড়ী গিয়ে ইন্দু, গজন, অমূল্য কামার প্রভৃতির সঙ্গে গান করি ও শুনি। পরদিন সকালে হয় তো বনগাঁ থেকে সবাই পিক্‌নিক্ করতে আসবে। ন'দি ও বুড়ী পিসিমার সঙ্গে গল্প করি মানুদের দাওয়ায়। পরদিন সকালে এল খোকা ও সুরেন। স্নান সেরে বনমরচে ফুলের সুগন্ধের মধ্যে রইলুম বসে কতক্ষণ। তারপর চলে আসি বনগাঁ।

শুক্রবার মন্মথদা'র আড্ডা।

আজ ফিরচি ঘাটশিলা থেকে এই মাত্র। গত রবিবারে আবার ধারাগিরি গিয়েছিলুম—মিতেরা ও আমরা। এবার pass-এর নীচে সেই খরস্রোতার খাদ থেকে কুলুকুলু নদীজলের সঙ্গীত আমাদের কানে মধু বর্ষণ করলে। বন্য পিটুলিয়া, শিউলি—আরও কত কি বন্য ফুল ফুটেচে বনে। ধারাগিরি যাওয়ার পথে গ্রাম ঝর্ণার কাছে আমরা চা

খাচ্চি বসে—এমন সময় হুটু আর সুরেশ সাইকেলে করে এসে যোগ দিলে আমাদের সঙ্গে। তারপর ধারাগিরি পৌছে কল্যাণী, মিতের বৌ ওরা চড়ালে খিচুড়ি—আমরা উঠলুম পাহাড়ে—মিতে ও আমি। ওপরের সেই দুরারোহ পথ ধরে আমরা গেলুম ধারাগিরির স্রোত ধরে আরও নিবিড় বনের মধ্যে। বড় বড় শাল, আম ও মোটা মোটা লতা—বন্য বিহঙ্গের কাকলি এখানে অপূর্ব্ব। মিতে একমনে শুনতে লাগলো। কত বন্য কুসুমের সৌরভ—আর সর্ব্বোপরি অসীম নিস্তব্ধতা। সোরুঝর্ণায় শিখী-নৃত্য—জ্যোৎস্না রাত্রে শিলাখণ্ডে ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বনদেবীরা বাস করেন—এ বনে। 'এসে খিচুড়ী খাওয়ার পূর্ব্বে ঝর্ণায় স্নান সমাপন করি। তারপর খাওয়া সেরে গরুর গাড়ীতে রওনা। আবার সেই ঘাটটা সন্ধ্যার ছায়ায় অতিক্রম করি। ঘন বন নীচে, হাতী তাড়াবার জন্যে স্থানে স্থানে গাছের ওপর মাচা। ভাত রেঁধে খাচ্চে বনের মধ্যে। আমরা আগে আগে—মিতেদের গাড়ী পেছনে। মিতে সকলের পেছনে হেঁটে আসচে। কল্যাণীর সঙ্গে আমি আসচি। হুটু ও সুরেশ সাইকেলে সবার পেছনে। দ্বিতীয় ঝর্ণা পার হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্রমে নক্ষত্র উঠলো—ছায়াপথ জন্ জন্ করতে লাগলো। এখানে ওখানে উল্কা খসে পড়তে লাগলো। রাত ন'টায় আমরা বাড়ী ফিরে ওবেলার রান্না খিচুড়ী খাই। উমা ও শান্তি এবার যাইনি।

মধ্যে আবার ঘাটশিলা গিয়েছিলুম। সাদা পাথরের স্তূপটার ওপর বসে কল্যাণীকে নিয়ে গল্প করেছিলুম জ্যোৎস্না রাত্রে। তবে এবার বিশেষ দূর কোথাও বেড়ানো হয়নি—মিতের সঙ্গে ফুলডুংরির নীচের বনটায় একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে বসেছিলাম। গত সপ্তাহে গিয়েছিলুম বনগাঁ,

বাড়ী বদল করে আমরা গিয়েচি বিনয়দার শ্বশুর হুটু মুন্সেফ যে বাসায় থাকতো—সেই বাসাটায়।

কাল রাত্রে শৈলজার 'নন্দিনী' বইখানা দেখে এলাম। বাঙালীর মনে যে কান্নার ফোয়ারা যোগাতে পারবে, সেই হাততালি পাবে। এ ছবিখানাতেও অনেকদিন পরে পুনর্মিলনের প্যাঁচ কসে দর্শকের চোখে জল আনার যথেষ্ট সুব্যবস্থা। তবে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েচে ছবিখানা, এটা বলতেই হবে। কথাবার্ত্তাও স্বাভাবিক। সুকৃতি ও আমি গিয়েছিলাম 'রূপবাণী'তে, শৈলজা আমাদের ফার্ষ্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলে, গল্প করলে অনেকক্ষণ কাছে বসে। ছবি ভাঙলে বাসে চলে এলুম। মিতে কাল বিকেলে এসেছিল, আজ ঘাটশিলা এতক্ষণ গিয়ে পৌঁছেচে।

আজ কোনো কাজ ছিল না, ওবেলা বসে বসে পরীক্ষার কাগজগুলো দেখলুম স্কুলের (Class) ছেলেদের—তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ী বসে খুব আড্ডা দেওয়া গেল গৌর পালের সঙ্গে। স্কুল ও কলকাতা দুইই ছাড়বো শিগগির। যেখানে যা আগে আগে করতাম—তা আর একবার ঝালিয়ে নিচ্চি। যেমন, আজ এবেলা গেলুম সাঁৎরাগাছি ননীর বাড়ী, জতু নেই, তার মার সঙ্গে বার হয়ে গিয়েচে। ননীর কাছে বসে বসে ঘাটশিলা ও কল্যাণীর গল্প করলুম, ধারাগিরির বর্ণনা করলুম—মাষ্টার মশাইও ছিলেন। তিনি আবার কোথায় যাত্রা হচ্চে বলে উঠে চলে গেলেন—আমরা বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করি, কল্যাণীর চিঠি ওকে পড়িয়ে শোনাতে হোল। ননী বড় প্রকৃতি-রসিক, বল্লে—আমি ঘাটশিলা যাবো বেড়াতে। আমি ওকে যেতে বলেচি।

একটা নতুন জীবনের সুরু। এখনও চাকুরীতে আছি, কিন্তু ১লা জানুয়ারী ১৯৪২ থেকে চাকুরী ছেড়ে দেবো। সেটা কাগজে কলমে অবিশ্যি, আসলে ছেড়েই দিয়েচি। বেশ স্বাধীন জীবনের আস্বাদ এখন থেকেই পাচ্চি। ঘাটশিলাতে এসেচি—কলকাতা থেকে আসবার সময় জাপানী বোমার ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নরত জনতার ভিড়ের মধ্যে অতি কষ্টে ইণ্টার ক্লাসে একটু জায়গা করে নিলাম। প্রথমটা মনে হয়েছিল জায়গা পাবো না—সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটবো।

অনেকদিন পরে মেস্ ছেড়ে দিলুম এবার। রাত্রে আমার এক ছাত্র এসে মেসেই শুয়ে রইল—শেষ রাত্রে উঠে ব্ল্যাক্ আউটের অন্ধকারের মধ্যেই দু'খানা রিক্সা করে ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছানো গেল। ১৯২৩ সালে কলকাতায় মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে ঢুকেছিলাম —সেই থেকে ওই একই মেসে, একই অঞ্চলে কাটিয়েচি। কতকাল পরে মেসের জীবন ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। বহুদিনের পুরোণো কাগজ-পত্র বিক্রি করে ফেললাম। বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি! পুরোণো কাগজ-পত্রের ওপর মায়াবশতঃই তাদের এতদিন ছাড়তে পারি নি—আজ জাপানী বোমার হিড়িকে যে সেগুলো ছেড়ে এলুম তা নয়—আনবার জায়গা নেই—এনে ঘাটশিলায় এই ছোট বাড়ীতে রাখি কোথায়?

রোজ সকালে শালবনে এসে বসে লেখাপড়া করি। মিতেরা এখানে ছিল, ভয় পেয়ে চলে গিয়েচে। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠচে, দিগন্ত নীল শৈল-শ্রেণী ও প্রান্তরে অপূর্ব্ব শোভা। এই সব পরিপূর্ণ অবকাশের মধ্যে দিয়ে চমৎকার ভাবে উপভোগ করি—অবশ্য অবকাশের সময় এখনও ঠিক আসে নি—কারণ এ সময় তো বড় দিনের ছুটি থাকেই—চাকুরী যে ছেড়ে দিয়েচি—সে জ্ঞানটা এখনও এসে পৌঁছায় নি মনে। তার ওপর জাপানী

গোমার ভয়। মৌভাঙার কারখানা কাছে—সবাই বলচে, এখানে কি বোমা না পড়ে যায়?

অনেকদিন পরে আমার রিপন কলেজের সহপাঠী বন্ধু কল্যাণীর সঙ্গে সেদিন দেখা হোল নদীর ধারে স্বামীজির আশ্রমে। তাকে বাড়ী নিয়ে এসে চা-খাইয়ে দিলাম। বিকেলে তার পরদিন ওকে নিয়ে বেড়িয়ে এলাম 'বিজয় কুটির' পর্য্যন্ত ও নুটুর ডাক্তার খানা।

দেশে এসে বহুদিন পরে বারাকপুরে বাড়ী সারিয়ে বাস করচি। বৈশাখ মাসের প্রথমে এখানে এলুম—এর আগে চালকীতে ছিলাম। বেশ লাগচে—গোপালনগরে স্কুলে মাষ্টারি করি। রোজ মর্ণিং স্কুলে থেকে ফিরে নদীতে স্নান করে আসি। বেশ লাগে।

আজ সকালে প্রায় দু'মাস পরে এই ডায়েরী লিখচি। ক'দিন খুব বর্ষা গেল—আজ পরিষ্কার আকাশে ঝল্‌মলে রোদ। আকাশের কি অপূর্ব্ব নীল রং! আমি রোয়াকের ঠেস্ বেঞ্চিটাতে বসে লিখচি। সবুজ গাছপালার ডালের ওপরে অয়স্কান্ত মণির মত উজ্জ্বল নীল আকাশ! আজ 'অনুবর্ত্তন' বইখানা লেখা শেষ করে কপি পাঠিয়ে দিলাম।

গত গ্রীষ্মের ছুটীতে ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম দিন দশ বারো। রোজ ফুলডুংরিতে বেড়াতে যেতুম। একদিন শালবনের মধ্যেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। সুবোধবাবু একদিন এসে রাজা মাইন্‌স্ পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। সুবর্ণরেখা পার হয়ে ধন্‌করি পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে বসলুম, কি অদ্ভুত শোভা! হেঁটে গালুডি এলুম, প্রোফেসর বিশ্বাসের বাড়ী খেয়ে চলে এলুম বাড়ী।

বারাকপুরে কল্যাণী ও আমি রোজ নদীর ঘাটে নাইতে যাই দু'বেলা। ওপারে মাধবপুরের চরের দৃশ্য বড় সুন্দর। অস্তদিগন্তের নানা রঙে রঙীন মেঘস্তূপ ভরা আকাশ যখন মাধবপুরের চরের ওপর ঝুঁকে থাকে, তখন সত্যই অদ্ভুত শোভা হয়।

এ সময় এখানে আর এক দৃশ্য। বিলবিলের জলে সকালে ন'দিদি কাপড় কাচচে, খয়েরখাগী গাছে কাঁটাল পাড়া হচ্চে খুড়ীমাদের, সাদা সাদা তেলাকুচো ফুল ফুটেচে খুকুদের লেবু গাছটায়, আমার ঠেস্ বেঞ্চির পাশে—বেশ পরিচিত দৃশ্য। তবে এ সময় আষাঢ় মাসের ২১শে পর্য্যন্ত কখনো বারাকপুরে আসিনি। ৭।৮ই আষাঢ় চলে যাই ফি বছর। ১৯২৮ সালে কেবল ছিলাম—তারপর আর থাকিনি। যে বছর বোর্ডিংয়ে যাই, তার আগের বছর ছিলাম। বারাকপুরে বর্ষা দিন যাপনের সৌভাগ্য এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো হয় নি।

গৌরীর কথা কাল রাত্রে মনে পড়লো। কল্যাণীর কাছে গৌরীর কথা বল্লুম। এই সময় আমরা কি করতাম, কাল ছিল সেই দিন, যেদিন বহুকাল আগে আমি মাঝের গাঁ থেকে হেঁটে এসেছিলুম, গৌরীকে প্রথম নিয়ে এসেছিলুম এই গাঁয়ে।

কল্যাণীকে কোলাঘাটে নিয়ে যাবো সামনের শনিবারে। ও এখন চার-পাঁচ মাস সেখানে থাকবে।

অনেকদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত বারাকপুরের জীবনকে আবার ফিরিয়ে পেয়েচি। বাল্যদিনের পরে এই আবার। এখানে সংসার করচি বহু দিন পরে। নতুন সংসার নতুন ঘর-কন্না। এই চেয়ে এসেছিলুম বহুদিন থেকে। এখন আমি জীবনে দর্শক মাত্র নই, জনৈক অভিনেতাও বটে।

উৎকর্ণ

ওগো সখি, ওগো মোর প্রিয়া, তব স্মৃতি খানি
মধুমাখা আঁকা রবে মম হৃদিতলে
চিরদিন। বহু প্রীতি ভালবাসা দিয়ে
এ জীবনে রাঙাইলে স্বপ্ন মাধুরিমা,
ভুলিবার নহে যাহা কভু। নিশীথের মর্ম্মর
বাতাসে, অবিশ্রান্ত বিহগ-কূজনসনে—
কত নিশা, কত জ্যোছনা-যামিনী,
শরতের শান্ত সন্ধ্যা—পউষের স্বর্ণরাঙা মধুর বৈকাল
আমারে হেরিয়া প্রীতিপূর্ণ হাসিমাখা ডাগর নয়নে
সিঞ্চিয়াছ স্বর্গের অমৃত। কত ঢিল
ফেলা অতর্কিতে মোর ঘরে, কিশোরীর
কত চঞ্চলতা মাঝে মন মম
ঘুরিয়া ফিরিবে। বকুলের তলে কত গল্প
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে। যবে ঘাট
থেকে সিক্তদেহে, আসিতে উঠিয়া—
আমি কত ছল করি লোভাতুর
দৃষ্টি মেলে রহিতাম চাহি—
বলিতাম—বড় ভাল দেখি তোরে স্নানার্দ্র বসনে।
তুমি হেসে শাসনের ছলে তর্জ্জনী
তুলিয়া চলে যেতে দ্রুতপদে। সিক্ত
চরণের দুটি চিহ্ন বহু যুগ ধরি
আঁকা রবে সে ঘাটের মৃত্তিকার পথে।

জলে নামি বালিকা বয়সে
করিতেছ খেলা। বলিতাম—আয় ওরে আমার উঠানে।
লীলাছলে ঘাড়টী দুলায়ে বলিতে
'নাহি যাবো নাহি যাবো এবে।' দুটী
হাত ঘুরায়ে ঘুরায়ে হাসিমুখে
বলিতে নকল করি—কপোত
কপোতী আয়—আয় ধান খাবি।
লেখনীর বিলাপনে তোরে আমি
করিব অমর। তোর হাসি তোর গান
দিয়ে চতুর্দ্দশী কিশোরীরে
আঁকি দিয়ে যাবো
বঙ্গবাণীদেউল-বেদীতে।
মৃত্যুর তিমির রাত্রি পারে, যদি
আগে চলে যাই—স্মরণে রাখিও সখি,
এই আম্রতল, এই বৃদ্ধ
বকুলের ছায়া—মনে রেখো
অতীতের কত মাধবী যামিনী—
অঙ্ক করিবার ছলে আসিতে হেথায়।
বলিয়াছি দোঁহে দোঁহাকারে কত কথা
হয়ত বা কটুকথা বলিয়াছি তার মাঝে
সে সব করিও ক্ষমা। রেখো মনে
শুধু এই বাণী, আমি বন্ধু তব—হৃদয়ের
মাঝে তব তরে কোনো গ্লানি রাখি নাই কোনদিন—

উৎকর্ণ

চেয়েছিনু শুধু তব প্রীতি ভালবাসা—ভাল বেসে যা
দিয়েছ তাই সুধা মোর। আজি তুমি যেতেছ
চলিয়া কঠোর সংসার পথে—সুখী হও সেথা
এই মোর আকিঞ্চন। যেথায় অনন্ত বহে মহাযুগ
চিরকাল প্রেমের দেবতা মহামৌন যাপিছেন দিবসশর্ব্বরী।
মনে হয় অতীতের কালে
ভারতের দূর ইতিহাসে কোন্
শান্ত তমসার কূলে বন্যতরু শ্যামছায়ে
তব সনে করিয়াছি খেলা—কুরঙ্গ-কুরঙ্গী সম
তুমি ছিলে আশ্রম বলিকা ঋষির
আশ্রমে—আমি ছিনু তব পিতৃ শিষ্য।
অধ্যয়নকালে গুরুকন্যা সনে প্রণয়ের
নম্রনেত্রপাতে হেরেছিনু তোমা—তারপর
কতবার ছাড়াছাড়ি হয়েছে দুজন।
বহুদূর ভবিষ্যত পানে চেয়ে
দেখি তুমি নাই, আমি নাই—
আছে শুধু ওই
কলস্বনা ইছামতী, আছে
বনসিমতলা ঘাট,
হয়তো বা আছে এই
আম্রতলা—ওই বৃদ্ধ বকুলের
জীর্ণ কাণ্ডখানি। আছে তব
পদরেখা আঁকা মৃত্তিকার পথ